ভারতের অর্থনীতি

উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি

শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম্, এ,
ফেলো, রয়াল ইকনমিক সোসাইটি (লণ্ডন),
অধ্যাপক, বর্ধমান রাজ কলেজ ;
পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রণীত

চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীসত্যকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত
চ্যাটার্জি পাব্‌লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আগষ্ট, ১৯৫৯

ভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

বি. এ ও বি. কম শ্রেণীর পাঠ্য 'ভারতের অর্থনীতি—উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি' প্রকাশিত হইল। সরল বাঙ্‌লা ভাষায়, যথাসম্ভব সহজ করিয়া পাঠ্য তালিকার বিষয়গুলি এই পুস্তকে আলোচনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি লেখকের 'আধুনিক ধনবিজ্ঞান'-এর ন্যায় এই পুস্তকটিও স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করিতে পারিবে এবং তাহাদের অপরিহার্য সঙ্গীরূপে গণ্য হইবে।

ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগমন আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর অচলায়তন ভাঙিয়া এক নূতন সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। আশা করা যাইতেছেএই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বহু কোটি জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইবে ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে। পুরাতন অর্থ নৈতিক কাঠামো রূপান্তরিত হইতেছে নূতনতর অর্থ নৈতিক সংগঠনে। এই পরিবর্তনের মুখে অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনার ধরণধারণ ও পঠন পাঠনের রীতিনীতি নূতনধারায় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের আর এক বিশেষ যুগে ক্লাসিকাল অর্থ নৈতিক তত্ত্বের আলোচনার উদ্ভব হয়। তৎকালীন ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছিল দীর্ঘকালীন উন্নয়নের ধারক ও বাহক শক্তিসমূহের পর্যালোচনা। আজ এক নবতর পরিবর্তনের যুগে উপস্থিত হইয়া উন্নয়নকামী দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কর্মযজ্ঞে সাফল্যের উদ্দেশ্যে সেই ক্লাসিকাল যুগের সমাজব্যবস্থার উৎপত্তিকালীন পরিবেশ ও গতিধর্মের কথা স্মরণ করা হইতেছে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতি কি ভাবে লক্ষীলাভ করিয়াছে? কেন তাহা ঘটিয়াছে? এই সকল প্রশ্ন আজিকার দিনের অর্থ নৈতিক তত্ত্ব আলোচনায়, বিশেষতঃ অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে, গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির তত্ত্ব ছাড়াও বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক ইতিহাস হইতে বিপুল পরিমাণ তথ্য আজ ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার

সাহায্যে অপুর্ণোন্নত রুশিয়া ও চীন দেশ অতি দারিদ্র অবস্থা হইতে নিজ নিজ দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলিতেছে। ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কাল শেষ হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার কাজ সুরু হইয়াছে। এই দুইটি পরিকল্পনা হইতেও ভারতীয় অর্থনীতির ছাত্রেরা প্রভুত তথ্য ও শিক্ষা পাইতেছেন। এই সকল নূতন তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন জাতির উন্নয়নের পদ্ধতি ও ধারার তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন দৃষ্টিতে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বিচার করার দিন আসিয়াছে। আংশিকভাবে হইলেও এই পুস্তকে সেই প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে কোন বিশেষ দৃষ্টিভংগী প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ অনেকেই বলিতে পারেন। এই বিষয়ে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট জানাইয়া রাখা আবশ্যক। কিছুদিন পুর্বেও যখন ভারতে অর্থনীতি সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা হইত, তখন, এত স্পষ্ট না হইলেও, এক ধরণের দৃষ্টিভংগী স্বীকৃত ছিল। তখন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে এত দ্রুত রূপান্তরণ ঘটে নাই; বৃটিশ বিরোধী সাধারণ জাতীয়বাদী দৃষ্টিভংগী সকল লেখার মধ্যেই পরিলক্ষিত হইত। আজ সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের অবস্থার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নুতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে উত্তরণের রূপ ও পন্থা বিশ্লেষণের কার্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের প্রায় সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন-পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য সত্বেও সকলেই আজ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন।

সুতরাং দৃষ্টিভংগীর অভাব বা মতবাদহীনতা কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। কথাটি ব্যাপকতর অর্থেও সত্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জাতিসংঘের রিপোর্টগুলিও কি বিশেষ দৃষ্টিভংগীর পরিচায়ক নহে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন বলেন যে অপুর্ণোন্নত দেশে মুনাফামুখিতা, বাজারের উঠানামার সহিত ব্যক্তিমানস আন্দোলিত হওয়া, অর্থভিত্তিক দ্রব্যের বাজার এবং অর্থের নিজের বাজার প্রসারিত হওয়া দরকার—তখন কি বিশেষ এক দৃষ্টিভংগী প্রকাশিত হয় না? যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায় নাই বা স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই,

একমাত্র সে-ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপিত হওয়া উচিত ; অথবা 'ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলি গড়িয়া দেওয়াই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য—এই সকল বক্তব্য এক ধরণের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ বা বিশেষ দৃষ্টিভংগী প্রচার করে তাহা কি অস্বীকার করা চলে ? সুতরাং ভারতের অর্থনীতি আলোচনায় কোনরূপ মতবাদ দেখা দিবে না, 'বিশুদ্ধ' বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা চলিবে, এইরূপ মতবাদহীনতার দৃষ্টিতে সমস্যাগুলি বিচার করা চলে বলিয়া মনে হয় না।

বি, এ ও বি, কম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য সূচীর সকল বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। উপরন্তু পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কতকগুলি অপরিহার্য বিষয়ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যাহারা প্রথমবার পুস্তকটি পাঠ করিবেন অথবা স্বল্প সময়ের মধ্যে পাঠ সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইবেন, তাহারা পুস্তকের প্রথম খণ্ডটি (অপূর্ণোন্নতি ও ক্রমোন্নতি) বাদ দিতে পারেন। অনুসান্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রী অবসর সময়ে ইহা পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

এই পুস্তকটি রচনা করিতে গিয়া নূতন-পুরাতন, দেশী-বিদেশী বহু গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি। পৃথকভাবে তাহাদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভব হয় নাই। প্রথম খণ্ড রচনায় সর্বাধিক উপকৃত হইয়াছি Paul. A. Baran বিরচিত 'The Political Economy of Growth' পুস্তকটির দ্বারা। এতদ্ব্যতীত সদ্য প্রকাশিত প্রায় সকল সরকারী রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক এবং সর্বাধুনিক পুস্তক ও পত্রিকাসমূহ হইতে প্রয়োজনমত তথ্যাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। আর পুস্তকটিকে কেবলমাত্র খুঁটিনাটি তথ্যে ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। শুধুমাত্র কতকগুলি তথ্যের সন্নিবেশ করিলে অর্থনীতির পুস্তক অনেকটা বর্ষপঞ্জীতে পর্যবসিত হয়। এই পুস্তকে তথ্যকে ব্যবহার করা হইয়াছে অর্থনৈতিক বিবর্তন ও গতিধারাকে সুষ্ঠুভাবে আলোচনার নিমিত্ত।

প্রকাশক শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীসত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এইরূপ কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে এত দ্রুত বইখানি প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রয়োজন-মত উপদেশ দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ আলোচনায় বহু উপকৃত হইয়াছি। বর্ধমান রাজকলেজের বাঙলা বিভাগের

প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীনির্মাল্য আচার্য, অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সিংহ, পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী—ইহারা সকলেই আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীজগবন্ধু রায় ও শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন। ইহাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

লেখকের আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ন্যায় এই পুস্তকটিও যদি বাঙ্‌লা দেশের ছাত্র-ছাত্রীগণ ও শিক্ষক সমাজ সাদরে গ্রহণ করেন তবে সুখী হইব। দোষ, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা কিছু থাকিবেই—এই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইতেছি। উহা দূরীকরণার্থে যে-কেহ, যে-কোন সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

বর্ধমান রাজ কলেজ
৭ই আগষ্ট, ১৯৫৯ } হরশংকর ভট্টাচার্য্য

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

অপূর্ণোন্নতি ও ক্রমোন্নতি

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তত্ত্ব ও প্রয়োগ

তৃতীয় খণ্ড

উপকরণ ও জাতীয় আয়

প্রথম খণ্ড

অপূর্ণোন্নতি ও ক্রমোন্নতি

Underdevelopment and Growth

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্ণোন্নতি ও ভারতবর্ষ

Underdevelopment and India

পৃথিবীর সকল দেশগুলির দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকাইলে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সকল দেশ অর্থনৈতিক দিক হইতে সমান স্তরে উন্নত নয়। কোনো দেশ বিশেষ উন্নত, আবার অনেক দেশ খুবই অনুন্নত। ভারতবর্ষ একটি অনুন্নত (Undeveloped) বা অপূর্ণোন্নত (Underdeveloped) দেশ, পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত ও অপূর্ণোন্নত দেশের মত তাহার এই বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সকল প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে কতকগুলি দিক আছে যাহারা সর্বত্র মোটামুটি সমান। নাইজিরিয়া ও গ্রীস, ব্রেজিল ও থাইল্যাণ্ড, মিশর ও স্পেন, ভারত ও পাকিস্তান প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথক হইলেও ইহাদের মধ্যে সকলের ক্ষেত্রে প্রকাশমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া বাহির করা যায়[১]। ইহাদের লইয়াই অপূর্ণোন্নতির তত্ত্বসমূহ (Theories of Underdevelopment) গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতীয় অপূর্ণোন্নতি আলোচনা করা সম্ভবপর।

বিভিন্ন দেশের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজিয়া তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে

অপূর্ণোন্নত দেশ কাহাদের বলে? (Who are the Underdeveloped Countries ?)

সাধারণ আলোচনার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে, জমির তুলনায় লোকসংখ্যার অনুপাত কম বলিয়া একটি দেশ অপূর্ণোন্নত। দেশে প্রচুর

---

১ "...While it may be true that no two countries face identical difficulties in the industrialization process, it is also true that countries at a similar developmental stage face difficulties of much the same kind, and, being subjected to much the same economic forces, often find themselves in very similar situations"—Processes and problems of Industrialization of underdeveloped countries.—*U. N. Report.*

জমি পতিত রহিয়াছে, লোকসংখ্যা কম বলিয়া উহাদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইতেছে না, এইরূপ অবস্থায় দেশটিকে অপূর্ণোন্নত বলা হইয়া থাকে। এই আলোচনার সময়ে বিচার করা দরকার যে জমি চাষের বা অন্য অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহারের যোগ্য কি না। লোকসংখ্যার তুলনায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত জমি বেশী থাকিলেই তাহাকে অপূর্ণোন্নত দেশ বলা চলে না।

কেহ বলেন জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা কম থাকিলে

কোনো দেশে সুদের হার বেশি থাকিলে অনেকে বলেন উহা অনুন্নত বা অপূর্ণোন্নত দেশ, কারণ ইহার দ্বারা বোঝা যায় সেই দেশের মূলধন কম। মূলধনের স্বল্পতা অপূর্ণোন্নতির লক্ষণ (এবং কারণ) তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বেশি সুদের হার থাকিলেই মূলধনের স্বল্পতা প্রকাশ পাইতেছে এমন কিছু বলা চলে না, মূলধনের স্বল্পতা ছাড়াও বহু বিভিন্ন কারণে দেশে সুদের হার বেশি থাকিতে পারে।

কেহ বলেন সুদের হার বেশি থাকাটাই অনুন্নতির লক্ষণ

কেহ কেহ বলেন, উন্নত ও অপূর্ণোন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করার মানদণ্ড হইল দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত উৎপাদনের অনুপাত অথবা মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত। দেশ যত বেশি উন্নত হইতে থাকে, ততই মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত উৎপাদনের অনুপাত বাড়িতে থাকে এবং মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষণের উপযুক্ততা অস্বীকার করা চলে না, এবং ইহার সাহায্যে সহজেই দেশে ক্রমোন্নতির বেগ (Speed of growth) ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার (rate of economic development) পরিমাপ করিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই। তবে অনেক সময় মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত উৎপাদনের অংশ কম হইলেও দেশটি উন্নত হইতে পারে, এবং অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত থাকিতে পারে, তাই এই মানদণ্ড ব্যবহার না করাই ভাল (যেমন,—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আওয়া, নাব্রাস্কা প্রভৃতি)।

কেহ বলেন মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত উৎপাদনের অনুপাত কম থাকা

আমরা তাই অপূর্ণোন্নত দেশের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে এবং দেশের উন্নতির স্তর পরিমাপ করার সময়ে প্রধানতঃ একটি মানদণ্ড গ্রহণ করিব; ইহা হইল জনসাধারণের মাথাপিছু আয় (Per Capita Income)। দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু

অধিবাসীদের গড় আয়

আয় যত কম হইবে, সেই দেশকে তত বেশি অপূর্ণোন্নত বলিয়া ধরা হইবে[২]। এই লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে আমাদের ভারতবর্ষকে নিশ্চয় অপূর্ণোন্নত দেশ বলিয়া মনে করা চলে।

নীচের তালিকার দিকে লক্ষ্য করিলে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় অপূর্ণোন্নত দেশগুলির অবস্থা স্পষ্ট বুঝা যাইবে[৩]:

১৯৪৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে আয়ের বণ্টন:

	পৃথিবীর মোট আয়ের %	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার %	মাথাপিছু আয়
উচ্চ আয়বিশিষ্ট দেশগুলি	৬৭	১৮	৯১৫ ডলার
মাঝারি আয়বিশিষ্ট দেশগুলি	১৮	১৫	৩১০ ,,
অল্প আয়বিশিষ্ট দেশগুলি	১৫	৬৭	৫৪ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যায়, মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশ লোকের মাথাপিছু গড় আয় বৎসরে ৫০ হইতে ৬০ ডলার। ইহা হইতেই ইহাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচুতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। মনে রাখা দরকার ইহা গড়ের হিসাব, আয় বৈষম্য থাকায় এই সকল দেশে প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার মান অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে আরও অনেক নীচুতে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই আয় বৈষম্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে[৪]।

---

২ অবশ্য গড় মাথাপিছু আয় বাড়িলেই দেশের সকল অধিবাসীর গড় জীবনযাত্রার মান বাড়িতেছে, এমন কথা বলা যায় না। যদি দেশের ক্রমবর্ধমান আয়ের অধিকাংশ ক্রমাগত কম-সংখ্যক ব্যক্তির হাতে জমিতে থাকে, তবে অঙ্কের হিসাবে মাথাপিছু আয় বা গড় আর্থিক আয় বাড়ে ঠিকই, কিন্তু গড় প্রকৃত আয় বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এমন অবস্থা অনেক দেশে নিশ্চয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নয়ন ঘটিতেছে না, এমন কথা বলা চলে না।

৩ **Problems of capital formation in underdeveloped Countries P. 63 —*Nurkse.***

৪ **"The distribution of per capita income among countries of the world has grown less, rather than more equal."**

E. S. Mason—**Promoting Economic development P. 15.**

মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ সাইমন কুজনেট্‌স্‌ সম্প্রতি এই বিষয়ে যে হিসাব করিয়াছেন, নীচে সেই তালিকা দেওয়া হইল :

	১৯৩৮			১৯৪৯		
অঞ্চল	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ	পৃথিবীর মোট আয়ের শতকরা কত ভাগ	আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় (পৃথিবী = ১০০)	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ	পৃথিবীর মোট আয়ের শতকরা কত ভাগ	আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় (পৃথিবী = ১০০)
১। অগ্রসর অঞ্চল	১৭·২	৫৭·৩	৩৩৫	১৭·৫	৬৫·৯	৩৭৫
২। রুশদেশ	৭·৯	৮·১	১০২	৮·৪	১১·২	১৩৩
৩। মাঝারি গরীব অঞ্চল	১৪·৪	১৫·০	১০৪	১৩·০	১০·৪	৭৯
৪। দরিদ্র অঞ্চল	৬০·৫	১৯·৬	৩২	৬১·০	১২·৫	২১

এই হিসাব হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে অগ্রসর অঞ্চল অধিকতর ধনী হইয়াছে এবং দরিদ্র অঞ্চল দরিদ্রতর হইয়াছে।

উভয় বৎসরের জন্য পৃথকভাবে সেই বৎসরের সমগ্র পৃথিবীর মাথাপিছু আয়কে ১০০ ধরিয়া তাহার তুলনায় আঞ্চলিক আয়গুলি নির্ধারিত করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ হইল অগ্রসর অঞ্চল, ইউরোপের অন্য অংশ ও লাতিন আমেরিকা হইল মাঝারি-গরীব অঞ্চল এবং এশিয়া ও আফ্রিকা হইল দরিদ্র অঞ্চল।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের স্থান কোথায় তাহা বিচার করিলে আমাদের অপূর্ণোন্নতির স্তর আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করিতে পারা যাইবে। নীচের তালিকাটিতে ইহা দেখান হইল।

বিভিন্ন দেশের জাত, আয় ও মাথাপিছু আয়[৫]

দেশ	বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি হিঃ)	জাতীয় আয় (কোটি টা. হিঃ)	মাথাপিছু আয় (টাকা হিঃ)
আমেরিকা	১৯৫৫	১৬·৫২	১৫৩,৯০০	৯,৩১২
কানাডা	১৯৫৫	১·৫৬	৯,৭৫৪	৬,২৫২
সুইডেন	১৯৫৫	·৭২	৩,৮২৯	৫,২৫৭
সুইজারল্যাণ্ড	১৯৫৫	·৪৯	২,৫৫৯	৫,১৩৯
অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৫	·৯২	৪,৬২৩	৫,০২৫
ইংলণ্ড	১৯৫৫	৫·০৯	২০,৩০১	৩,৯৮৩
ফ্রান্স	১৯৫৫	৪·৩২	১৬,৯২৫	৩,৯১১
নরওয়ে	১৯৫৫	·৩৩	১,৩০৯	৩,৮১৬
ডেনমার্ক	১৯৫৫	·৪৪	১,৬৩৯	৩,৬৯১
ইতালী	১৯৫৫	৪·৮০	৮,০৯২	১,৬৮৫
জাপান	১৯৫৫	৮·৯১	৮,৪৯৪	৯৫৩
সিংহল	১৯৫৫	·৮৩	৪৭৫	৫৬৭
ভারতবর্ষ	১৯৫৫-৫৬	৩৮·৩০	১০,৪২০	**২৭২**
পাকিস্তান	১৯৫৩-৫৪	৭·৯৩	১,৯২১	২৪৩
ব্রহ্মদেশ	১৯৫৫	১·৯৪	৪০৯	২১০

পৃথিবীতে কিরূপে অনুন্নত দেশের উদ্ভব হইয়াছে (How the underdeveloped Countries became as they are today)

পৃথিবীতে অপূর্ণোন্নত দেশগুলি কেন পূর্ণোন্নত হইতে পারে নাই, তাহা আলোচনা না করিলে উহাদের উন্নয়নের পথ নির্দেশ করিতে পারা যায় না।

উন্নয়নের বাধা কি জানিতে হইলে অনুন্নতির ইতিহাস জানা দরকার

কয়েকটি দেশে শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া অর্থনৈতিক অচলাবস্থা (Stagnation) দূর হইল, সেই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দ্রুত হারে অগ্রসর হইল। কিন্তু আফ্রিকা ও

---

৫ *United Nations Monthly Bulletin of statistics*, January, 1957.

এশিয়ার এই দেশগুলিতে কেন সামন্ততান্ত্রিক ও কৃষি-প্রধান অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইল না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করা দরকার। পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের বিসম অগ্রগতির (uneven development of capitalism) কারণ বিশ্লেষণ না করিলে অনুন্নতি বা অপূর্ণোন্নতির মূল কারণ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না।

সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়াই উন্নয়নের সুরু

এই বিশ্লেষণের জন্য আমাদের প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তাহার চরিত্র আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক কাঠামোর নাম হইল সামন্ততন্ত্র (Feudalism)। এই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সাধারণ রূপ সকল দেশেই সমান ছিল, কিন্তু বিশেষ বিশেষ দেশে ইহার রূপ ছিল বিশেষ রকমের। চীনের সমাজ, স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম-ভিত্তিক ভারতীয় সমাজ, দাস-প্রথার ভিত্তিতে গঠিত ইউরোপীয় সমাজ—এই সকল সমাজের সামন্ততন্ত্রের রূপ নিশ্চয় সমান হইতে পারে না। তবে সকল দেশেই প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক কোনো এক বিশেষ ধরণের সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়াই ধনতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিষয়ে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত[৬]। এই ভাঙনের গতিপথের তিনটি লক্ষণ বা ধারা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, কৃষকদের উপর শোষণ বৃদ্ধি, জমি হইতে চাষীদের বিতাড়ন বা অন্যান্য কারণে একদল ভূমিহীন চাষীর উদ্ভব যাহারাই দেশে সম্ভাব্য শ্রমিক শ্রেণী (rise of potential industrial labour); দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের প্রসার, বণিক্‌ (merchants) ও দক্ষ শিল্পীশ্রেণী (artisans) এবং নগরের প্রসার (urbanisation); তৃতীয়তঃ, বণিক ও ধনী সামন্ত প্রভুদের হাতে প্রভূত পরিমাণে মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়া। এইসকল ধারার মিলিত স্রোতই ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্বসর্ত। ইহারা অনুপস্থিত থাকিলে সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে না[৭]।

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে বণিকী সঞ্চয়ের (accumulation of merchant capital) পরিমাণ ছিল বেশি এবং কেন্দ্রীভূত। ইহার দুইটি প্রধান কারণ ছিল: (ক) ভৌগোলিক দিক হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রথম

---

৬ ভাঙনের সময়, পরিমাণ ও রূপ সকল দেশে সমান ছিল না।

৭ "What enables money wealth to become capital is on the one hand its meeting with free workers; is secondly its meeting with equally free and available for sale means of subsistence, materials etc."—*Marx.*—Critique of Political Economy.

হইতেই নৌবহরের উন্নতি, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও লুটপাটের প্রসার। (খ) পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হইতে দরিদ্রতর এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে নিম্নস্তরের। এই দুইটি কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল; প্রথমে প্রাচ্যের মশলাপাতি, ক্রমশঃ বিলাসসামগ্রী এবং সর্বশেষে মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর সংগ্রহ লইয়া কাড়াকাড়ি সুরু হইয়াছিল। এইরূপ দূরবাণিজ্য, সামুদ্রিক ডাকাতি ও লুটপাট, দাসব্যবসায় এবং স্বর্ণের আবিষ্কার—এই সকল মিলিয়া পশ্চিম ইউরোপীয় বণিকদের হাতে বিপুল অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

কেন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতেই শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল

সেই বিপুল কেন্দ্রীভূত অর্থ নিজের অগ্রগতির পথ নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো ভাঙিয়া ধনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। জাহাজ নির্মাণ, বাণিজ্যের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদন, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, এই সকলের উপযোগী কলকারখানা, নগর, পথঘাট সকল কিছুর অবশ্যম্ভাবী ফল হইল ক্রমবর্ধমান হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (accelerated rate of development)। রাষ্ট্রগুলির পরিচালন-ক্ষমতা ক্রমশঃ বণিক ও ধনিকশ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়িল, রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও ধনতন্ত্রের প্রসারের গতি আরও বাড়িয়া গেল। এইসকল দেশের নিজস্ব ক্রমবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

মূলধনের জয়যাত্রা

পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক বণিকেরা যে সকল দেশে প্রবেশ করিল সেই সকল দেশের অবস্থা সমান ছিল না, তাই সকল দেশে উহাদের ফলও একরূপ হয় নাই। প্রভূত জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদশালী উন্মুক্ত আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু যে সকল দেশে প্রাচীন সভ্যতা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বর্তমান ছিল সেখানে লুটপাট ও যুদ্ধবিগ্রহের সাহায্যে তাহারা সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ গড়িয়া তুলিল। লুণ্ঠিত সম্পদ ও অন্যায় বাণিজ্যের সাহায্যে প্রাপ্ত মুনাফা মূলধনে রূপান্তরিত হইল[৮]।

উপনিবেশ সৃষ্টি

পশ্চিমী বণিকদের এই লুঠ একদিকে ঔপনিবেশিক দেশগুলির উদ্বৃত্ত অপহরণ করিয়া সেইসকল দেশের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করিল এবং

---

৮ "The treasures captured outside Europe by undisguised looting, enslavement and murder flowed back to the mother-country and transformed themselves into capital."—*Marx*, capital vol I.

অপরদিকে লুণ্ঠনকারী দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়াইয়া দিল। বহু পুরাতন প্রাচীন ও জীর্ণ সমাজগুলিতে ভাঙন ধরাইল বটে, কিন্তু সমাজের যে উদ্বৃত্ত মূলধনরূপে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় তাহা না থাকায় সামন্ততন্ত্রের সেই ভাঙন নিজস্ব গতিতে নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িতে পারিল না। এই সকল দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি ভাঙিয়া গেল, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চাপিয়া বসিল, কিন্তু নিজস্ব গতিবেগে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হইল না। হস্তচালিত শিল্প, কৃষিক্ষেত্র সকল কিছুর অবনতির মধ্য দিয়া একদল ভূমিহীন মজুরের সৃষ্টি হইল, ধনতান্ত্রিক আইনকানুন ও সম্পত্তির সম্পর্ক দেখা দিল; উহার উপযোগী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপিত হইল। এই-রূপ কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজকর্মের দ্বারা বিদেশী মূলধনের অবাধ চলাচলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইল; কিন্তু তাহারা অপূর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল। পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের বিসম প্রসারের ইহাই অতি পরিচিত ইতিহাস, পৃথিবীতে একদল অপূর্ণোন্নত দেশ উদ্ভবের সকরুণ বিবরণ।

উদবৃত্তের অপহরণই অনুন্নতির কারণ

ভারত কিরূপে অপূর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল (How India became an underdeveloped country)

সুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো কখনই এক রকমের ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের কাঠামোকেই এক বিশেষ ধরণের সামন্ততন্ত্র বলা চলিত। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সহিত ইহার বহুক্ষেত্রে প্রভেদ ছিল, প্রধানতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র দাঁড়াইয়াছিল। গ্রামে বংশগত বৃত্তি-বিভাগ ছিল, আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মোটামুটি গ্রামের মধ্যেই ঘটিত, জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইত না, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়া উহা সমাজের মধ্যেই গৃহীত হইয়া যাইত, কোনরূপ গতিশীল শক্তি (dynamic force) হিসাবে ইহা পরবর্তী স্তরে সমাজের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিতে পারিত না। গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই বিনিময় হইত, স্থিতিশীল সমাজের ভোগ, বিনিয়োগ, মূলধন ও সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে উপচাইয়া মূলধন-গঠনের বিপুল গতিবেগ সৃষ্টি করিতে পারিত না। রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ার অন্তরালে বর্ণাশ্রম ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এইরূপ অর্থনৈতিক অচলাবস্থা

ইংরাজ আসিবার পূর্বে ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

(stagnation) ও স্থিতিশীলতা—ইহাই সামন্ততন্ত্রের এক বিশেষ ভারতীয় রূপ।[৯]

চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই ভারতের সমাজজীবনে গুরুতর পরিবর্তন আসিতেছিল। দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তদানীন্তন মুঘল সম্রাটগণও ব্যবসায়ীদের সাহায্যার্থে বহু উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে বণিকী পুঁজির কোনো অভাব ছিল না এবং মুঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগে প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিশৃংখলার দরুণই ভারতে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইল না। কিন্তু ভারতে প্রভূত বণিকী-পুঁজির সঞ্চয় ছিল, এবং নিজেদের শ্রেণীগত প্রয়োজনেই বণিকেরা নিশ্চয় এই শিল্প-বিপ্লব ও উপযুক্ত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইত। রাণী এলিজাবেথ এবং তাঁহার পরবর্তী রাজাদের মত ভারতের রাজারাও ব্যবসার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন,[১০] সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

মুঘল আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনা

পশ্চিম ইউরোপের মতই ভারতীয় সমাজও অগ্রসর হইতেছিল, বরং তাহাদের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক উন্নত স্তরেই ভারতের সমাজ-বিবর্তন সম্ভব হইত। নবজাগ্রত বণিকী পুঁজি রাজা ও নবাবদের আশ্রয়ে পুষ্ট হইতেছিল, স্থানীয় বাজার ছাপাইয়া দেশেবিদেশে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন বহুদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেশের রাজনৈতিক বিশৃংখলা, বণিকশ্রেণীর অসম্বদ্ধতা এবং কোনো নিজস্ব সামরিক জাহাজ না থাকা—এই সকল মিলিয়া ধনতন্ত্রে উত্তরণের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। এইরূপ অবস্থাতেই ব্রিটিশ

৯ "সরল উৎপাদন সংগঠন লইয়া গঠিত এই সব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলি—যাহারা অবিরত ঠিক সেই একই রূপে নিজেদের পুনরুৎপন্ন করিয়া চলিত, দৈবাৎ ধ্বংস হইলে ঠিক একই স্থানে একই নামে আবার মাথা তুলিত—উৎপাদন সংগঠনের সেই সারল্যই প্রাচ্যসমাজব্যবস্থার অপরি-বর্তনশীলতার রহস্যের চাবিকাঠি—এই অপরিবর্তনশীলতার বিরোধী চিত্র হিসাবে আমরা দেখিতে পাই প্রাচ্যরাষ্ট্রসমূহের অবিরাম ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন রাজবংশের বিরামহীন পরিবর্তন। রাজনৈতিক আকাশের ঝঞ্ঝাবাত্যা সমাজের অর্থনৈতিক উপাদানগুলির কাঠামো স্পর্শ করিতে পারিত না।"

—*Marx*, Capital vol I, ch XIV, Section 4.

১০ "The state was not only a great manufacturer, it was a great trader as well. It took part in the maritime trade of the country ; it participated in the foreign trades with Persia and Arabia. The manufacture of salt and saltpetre was a State Monopoly. From time to time other articles were also declared State Monopoly.—Rise and fall of East India Company P. 110. *R. K. Mukherjee.*

বণিকী পুঁজি ও বণিকী রাষ্ট্রের প্রতিভূ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল।

ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবেশের পর হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে ভারত লুণ্ঠিত হইয়াছে, সেই ইতিহাস আমাদের অতি সুপরিচিত। করুণা করিয়া অপূর্ণোন্নত দেশ বলিয়া মূলধন ঋণ দেওয়া উচিত কি উচিত নয়,—আজকালকার এইরূপ বিতর্কের দিনে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক বিবর্তন কিরূপে ইহারাই রুদ্ধ করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না।

ইতিমধ্যে সুরু হইল ব্রিটিশ লুণ্ঠন

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি এই ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়া আজ ইংলণ্ড পূর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী ভেরা আন্‌ষ্টে লিখিতেছেন,[১১] "অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নতই ছিল এবং ভারতের উৎপাদন-পদ্ধতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন পদ্ধতি পৃথিবীর যে কোন অংশের সহিত তুলনায় অগ্রসর ছিল···যখন ব্রিটিশ জাতির পূর্ব-পুরুষেরা নিতান্ত আদিম জীবনযাপন করিত তখন যে দেশ সূক্ষ্মতম মসলিন ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানি করিত,—সেই দেশ ওই আদিমবর্বরদের বংশধরদের দ্বারা আনীত অর্থনৈতিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল না।"

যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং যে নিষ্ঠুর উপায়ে ভারত হইতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ১৮৭৫ সালে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট, স্যালিস্‌বেরীর মার্কুইস্ বলিয়াছিলেন, "ভারতকে যখন রক্তশূন্য করিতেই হইবে তখন বিচক্ষণতার সহিতই তাহা করা ভাল" ("as India must be bled, the bleeding should be done judiciously")। পলাশীর যুদ্ধ এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ ভারত হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল[১২]।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতের বার্ষিক স্থূল জাতীয় আয়ের ১০% প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত[১৩]। গরীব ও অনুন্নত দেশের

---

১১ *Vera Anstey*—**The economic development of India. P 5,**

১২ *William Digby*, **"Prosperous" British India, P. XII.** সেই সময়ে টাকার মূল্য কত বেশি এবং লোকের জীবনযাত্রার মান কত নীচুতে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই এই অর্থের গুরুত্ব বিচার করিতে হইবে।

১৩ *R, Palme Dutt.*—**India To day, P. 82.**

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হইতে এই পরিমাণ অপহৃত হইলে অপূর্ণোন্নত না হইয়া উহার আর কোনো উপায় থাকিতে পারে না।

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ব্রিটেনের এইরূপ প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয়ের কি ফল হইয়াছিল তাহা আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের "ভারতের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে দেখিতে পাই[১৪]। "অর্থনীতির যে নিয়ম ভারতে কার্যকরী হয় তাহা পৃথিবীর অন্য সকল দেশের নিয়মের সমান; যে কারণে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের সম্পদবৃদ্ধি হয় সেই কারণে ভারতের সম্পদও বাড়ে; যে কারণে অন্যান্য দেশ গরীব হয় তাহাতে ভারতও গরীব হইয়া পড়ে......

লুণ্ঠনের অর্থনৈতিক ফল

"দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য ঘটনা যে, ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের উৎসগুলিকে নানা উপায়ে সংকুচিত করা হইয়াছে: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যেমন বিরাট কৃষি-প্রধান, তেমনই বিরাট শিল্প-প্রধান দেশ ছিল। ভারতীয় তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যাদি এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হইত। দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য যে, একশ' বছর আগেকার স্বার্থপর বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের উঠ্‌তি কারিগরদের উৎসাহ দিবার জন্য ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম দিকেই ভারতীয় কারিগরদের নিরুৎসাহ করিতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে তাঁহাদের অনুসৃত স্থির অনড় নীতিই ছিল ভারতবর্ষকে বৃটেনের শিল্পের অনুগত করিয়া তোলা, এবং বৃটেনের তাঁত ও কলকারখানায় যোগান দিবার জন্য ভারতীয় জনসাধারণকে কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপন্ন করিতে বাধ্য করা। অনড় অটল ভাবে এই নীতি অনুসরণ করা হইত এবং তাহার সাফল্যও মারাত্মক রকমের হইয়াছিল; কোম্পানীর কারখানায় ভারতীয় কারিগরদের কাজ করিতে বাধ্য করিবার নির্দেশ পাঠানো হইত; গ্রামবাসী ও তাঁতি-সম্প্রদায়ের উপরে প্রয়োগের জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধিদের হাতে ব্যাপক আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হইত; প্রতিরোধক শুল্ক দ্বারা ভারতীয় রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্যগুলি ইংলণ্ড হইতে দূরে রাখা হইত; বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে বৃটেনের শিল্পদ্রব্য ভারতবর্ষে আনা হইত ......ইউরোপে বাষ্প-চালিত তাঁত আবিষ্কারে ভারতীয়

১৪ *R. C. Dutt*—**The Economic History of India under Early British rule (Sixth Edition) P. VII**

শিল্পের অবনতি-পর্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে; আর, সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে যখন বাষ্প-চালিত তাঁত বসানো হইয়াছে, তখন ইংলণ্ড আর একবার ভারতবর্ষের প্রতি তাহার ঔচিত্যহীন ঈর্ষার পরিচয় দিয়াছে।' ভারতবর্ষের তুলা কারখানাগুলির উপরে যে এক শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের নূতন বাষ্পচালিত কারখানাগুলির শ্বাসরোধ করা হইতেছে। কৃষিই এখন ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের কার্যত একমাত্র অবশিষ্ট উৎস ......কিন্তু ইংরেজ সরকার ·....বর্তমানে ভূমি-কর হিসাবে যাহা আদায় করেন কোনো কোনো সময়ে তাহা পুরাপুরি বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার সমান হইয়া দাঁড়ায়......ইহাতে···কৃষি পঙ্গু হইয়া পড়ে, সঞ্চয়ে বাধা ঘটে, যাহারা জমি চাষ করে তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত করিয়া রাখে······ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রই কার্যত ভূমি-জাত সম্পদ-সঞ্চয়ে হস্তক্ষেপ করে, চাষীর আয় লাভে বাধা সৃষ্টি করে...ফলে চাষীরা চির-দরিদ্রই থাকিয়া যায়...ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কোনো নূতন শিল্পকে পোষণ করে নাই, জনসাধারণের জন্য পুরাতন শিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করে নাই ····যেভাবেই হউক অতিমাত্রায় ধার্য করের সাহায্যে ভারতবর্ষে যাহা কিছুই তোলা সম্ভব হইয়াছে, এক বুভুক্ষু-শাসনব্যবস্থার ক্ষুধা মিটাইবার পর, তাহাই ইউরোপে প্রবাহিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের বৃষ্টিপ্রসূ মৌসুমী মেঘই অন্য দেশগুলিকে আশীর্বাদপূত ও উর্বর করিয়া তুলিয়াছে।"

সমাজের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত এইরূপে অপহৃত হইবার পথে যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়া পার হইতে হয়, ভারতের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই[১৫]।

নিরন্ন, বস্ত্রহীন, আবাসহীন দরিদ্র নরনারীর প্রভূত পরিশ্রমজাত এই উদ্বৃত্ত যদি দেশের বাহিরে চলিয়া না গিয়া দেশেই বিনিয়োগ হইতে পারিত

ইহারই ফলে অনুন্নতি

তবে ভারতের অর্থনৈতিক অপূর্ণোন্নতি আজিকার স্তরে থাকিতে পারিত না, তাহার অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি দ্রুততর হইতে পারিত। পুরাণো ভারতীয় সমাজের ভিত্তি নাড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকারী বণিকনীতি নূতন সমাজের কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। মার্ক্স বলিয়াছেন,[১৬]

---

১৫ "There is no end of violence and plunder which is known as British rule in India—*Lenin* (1908).

১৬ *Marx*—British rule in India.

"সকল প্রকার গৃহযুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, আশ্চর্য জটিল যত দুর্ভিক্ষ একের পর এক দ্রুতগতিতে হিন্দুস্তানকে ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া যতই মনে হউক না কেন, ইহারা সমাজের নিছক বহিরঙ্গেই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, কোনরূপ গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামো ভাঙিয়া দিয়াছে, অথচ নূতন কিছু গড়িয়া উঠার লক্ষণ এখনও দেখা দেয় নাই। পুরাণো দুনিয়ার অপহরণ, অথচ নূতন পৃথিবী না পাওয়া—ইহাই হিন্দুদের বর্তমান দুঃখের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের বিষাদ আনিয়া দিয়াছে এবং ব্রিটিশ-শাসিত হিন্দুস্তানকে উহার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতের সমগ্র ইতিহাস হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে।"

ব্রিটিশের ভূমি ও করনীতি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পরভোজী জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্যনীতি ভারতীয় শিল্পীর অন্ন কাড়িয়া লক্ষ লক্ষ অনাহারী অর্ধাহারী নরনারী অধ্যুষিত ভারতীয় সহর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের অর্থনৈতিক নীতি ভারতের নিজস্ব স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া ফাট্‌কাবাজ দালালশ্রেণীর একদল মতলববাজ শোষণকারী ব্যবসাদার গজাইয়া তুলিয়াছে। শ্রীনেহরু ঠিকই বলিয়াছেন যে, আধুনিক ভারতের সকল সমস্যাই মূলতঃ ইংরাজ শাসনের ফল; আমাদের সকল অনুন্নতির মূল কারণই হইল ইংরাজ কর্তৃক ভারতের অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত অপহরণ।[১৭]

অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও গতিধারার বিশ্লেষণ, কেন অপূর্ণোন্নত থাকিয়া যাইতেছে ও উন্নতি হইতেছে না (Analysis of the economic structure and movement of an under-developed economy, why underdevelopment continues and obstacles to development.)

অপূর্ণোন্নত দেশগুলির উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হইল তাহাদের আধা-ধনতান্ত্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো। পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলিতে নিজস্ব গতিতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রকে জোরালোভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাই দেশগুলির অর্থনৈতিক রূপান্তরণ ও অগ্রগতির বেগ ছিল তীব্র। কিন্তু ভারতে বা অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে

১৭ "Nearly all our major problems of today have grown up during British rule and as a direct result of British policy; the princes; the minority problem; various vested interest, foreign and Indian; the lack of industry and the neglect of agriculture; the extreme backwardness in the social services; and above all, the tragic poverty of the people.

—*J. Nehru*, Discovery of India.

বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার আঁওতায় গঠিত আধা-ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রায় সর্বদাই দেশের সর্বাপেক্ষা অনুন্নতিকামী জরাজীর্ণ সামাজিক শক্তিগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। পুরাণো সামাজিক সম্বন্ধগুলি ভাঙে নাই, নূতন সামাজিক সম্বন্ধ গড়িয়া তোলে নাই; সামন্ততান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পূর্ণ দূর করে নাই, ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বেগ সৃষ্টি করে নাই। তাহার উপরে "সমাজতন্ত্রের" নামে এইরূপ মিশ্রিত কাঠামোর মধ্যে রাস্ট্রীয় ধনতন্ত্রের (State Capitalism) উদ্ভব হইতেছে। পূর্ণোন্নত দেশে ধনতন্ত্রের গতি রুদ্ধ হইলে যদি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ না ঘটে তবে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক সামরিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে, যাহাকে কেহ কেহ ফ্যাসিবাদ বলেন। সেইরূপ অপূর্ণোন্নত দেশ পূর্ণ সমাজতন্ত্র বা পূর্ণ ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর না হইলে এইরূপ রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠে। ইতিহাস কখনই একই স্থানে "স্থিতিশীল ভারসাম্য" রক্ষা করে না, মাটির তলা হইতে বাহির হইতেছে এইরূপ ফোয়ারার একটি ছিদ্রপথ আঙুল দিয়া চাপিয়া রাখিলে উহা অপর কোনো নিজস্ব কুটিল পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়।

অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রের ও সমাজের নূতন রূপ

নদী আপন স্রোত হারাইলে তাহাকে সহস্র শৈবাল দলে ঘিরিয়া ধরে

পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে ক্লাসিকাল রূপ ছিল, তাহার নিখুঁত ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই সকল দেশে আর কখনই দেখা যাইতে পারে না। যেমন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির অগ্রগতির পথের সহিত ভারতের বাস্তব অবস্থার মিল থাকিতে পারে, কারণ সকলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় সমান স্তরে রহিয়াছে (almost same stage of economic development); কিন্তু ভারতীয় সমাজের নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, উহা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান।

রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র দেখা দেয়

ক্লাসিকাল যুগ মন্থন করিলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি মৌলিক সর্ত দেখিতে পাই: (ক) উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হওয়া, (generation of surplus), (খ) সেই উদ্বৃত্ত ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে উপযুক্তভাবে ভাগ হইয়া যাওয়া (allocation of surplus); এবং (গ) সেই উদ্বৃত্তের

ক্লাসিকাল ক্রমবৃদ্ধির তিনটি মৌলিক সর্ত

উপযুক্ত পথে (অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার জন্য) ব্যবহার হওয়া (utilisation of the surplus)[১৮]।

উদ্বৃত্ত সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে মোট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম। মনে রাখা দরকার, ইহার মোট পরিমাণ কম হইলেও জাতীয় আয়ের অনুপাতে ইহার অংশ মোটেই কম নহে। দেশের সকল উপাদান ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না বলিয়া জাতীয় আয় কম, সুতরাং উদ্বৃত্তও কম, কিন্তু জাতীয় আয়ের তুলনায় বিচার করিলে এই উদ্বৃত্তকে কম বলা চলে না। জনসাধারণের ভোগের মাত্রা (scale of consumption) খুবই নীচু, কোনমতে কায়ক্লেশে জীবনধারণের পক্ষে যতটুকু দরকার সমাজের অধিকাংশ লোকেরা তাহার বেশি আয় করে না। উপকরণগুলির পূর্ণ ব্যবহার হইলে আরও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য বর্তমানের উদ্বৃত্তকে উপযুক্ত উপায়ে খাটান দরকার; এবং অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এই উদ্বৃত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া (utilised) দ্রুত মূলধনে রূপান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে পারে না।

উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হয়, ভোগের স্তর নীচুতেই থাকে, কিন্তু উদ্‌বৃত্তের ব্যবহার উন্নয়ন ঘটায় না

(ক) অপূর্ণোন্নত দেশের কৃষি-কাঠামো :

অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, শ্রমশক্তির অধিকাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে মোট জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ উৎপন্ন হয়। জীবনযাপনের জন্য কৃষিকার্য (subsistence farming) চলিতে থাকে, চাষীর হাতে জমির পরিমাণ খুব কম থাকে, শ্রমিক-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনীশক্তি (productivity per man or per acre) খুব কম। যে সকল দেশে জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার বেশি (absolute volume and rate of increase), সেখানে কৃষকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (marginal productivity of labour in the subsistence sector) নাই

জীবনযাপনের কৃষিকার্য, উৎপাদনক্ষমতা কম, প্রচ্ছন্ন বেকারি—তাই উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি কম

---

১৮ এই তিনটির পদ্ধতিতে পরিবর্তনই (changes in mode of generation, allocation and utilization of the economic surplus) একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনে।

বলিলেই চলে অর্থাৎ কিছু পরিমাণ লোককে উৎপাদন হইতে সরাইয়া আনিলেও মোট উৎপন্ন কমে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ (volume of disguised unemployment) খুবই বেশি থাকে।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে জীবনধারণের স্তরের কৃষিকার্য হইতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত যত কমই হউক না কেন, তাহা উৎপাদনকারী চাষীর হাতে থাকে না। খাজনা ও মহাজনী সুদে উৎপাদনের বৃহৎ অংশ অপরের হাতে চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্নত দেশে চাষীকে সর্বদাই অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় প্রতিকূল বাণিজ্যহারের (unfavourable terms of trade) মধ্য দিয়া উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। বিক্রয় ব্যবস্থা অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ, নিজের দ্রব্যের জন্য যৎসামান্য দাম পাইয়া বেশি দামে তাহাকে শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। এইরূপে কৃষিক্ষেত্রে চাষীদের হাত হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সরিয়া আসিয়া জমিদার, মহাজন, জোতদার (ধনী চাষী ও সুদখোর মহাজনের এক মিশ্রিত রূপ), অসাধু বণিক এবং কিছুটা পরিমাণে রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে।[১৯]

চাষীর হাতে সেই স্বল্প উদ্বৃত্তটুকুও থাকে না

এই উদ্বৃত্ত যাহাদের হাতে পৌঁছায়, তাহারা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করে, সেই পদ্ধতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। একথা সকলেই জানেন যে, এই অপহৃত উদ্বৃত্তের অধিকাংশ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াইবার কাজে নিযুক্ত হয় না। অপহৃত এই উদ্বৃত্তের অধিকাংশই ব্যয় হয় অতিভোগের (excess consumption) উদ্দেশ্যে। সুবৃহৎ প্রাসাদ ও অট্টালিকা, দাসদাসী, সামাজিক পদ-মর্যাদা ও সম্মান বাড়াইবার জন্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তরাদি, বিলাসব্যসন—এই সকল কাজেই সেই উদ্বৃত্ত নিযুক্ত হইতে থাকে। উৎপাদক বিনিয়োগে ইহা (productive investment) নিযুক্ত না হওয়ার প্রধানতঃ চারিটি কারণ থাকে: (ক) আমদানী করা যন্ত্রপাতির দাম বেশি, কিন্তু কম দামে প্রচুর

যাহারা সেই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে তাহারা কোথায় ব্যয় করে এবং কেন উহা বিনিয়োগ করে না!

---

১৯ দেশ যত অপূর্ণোন্নত থাকে, দেশে মোট উদ্বৃত্তের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্তের অংশ তত বেশি থাকে। অপূর্ণোন্নতি যত কমিতে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও অনুপাত তত বৃদ্ধি পায়।

পরিমাণে কৃষি-মজুর খাটান সম্ভবপর, (খ) জমিতে খাটাইলে উহা হইতে প্রতিদান (return) আসে অনেক দেরিতে, তাহার তুলনায় সুদে খাটাইলে বেশি ও দ্রুত প্রতিদান পাওয়া যায়। (গ) কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রীর দামে ঘন ঘন ও তীব্র উঠানামা হয় বলিয়া কৃষিতে বিনিয়োগের ঝুঁকি ইহারা বহন করিতে চাহে না। (ঘ) কৃষিক্ষেত্রগুলি চাষীদের হাতে ছোট ছোট ক্ষেতের আকারে ছড়াইয়া থাকে তাই উহাদের একত্র না করিলে বৃহদায়তন কৃষিকার্য (large scale farming) সম্ভবপর নয়। খাজনার হার এমন বেশি ও চাষীদের ভোগের স্তর এমন নীচু যে, জমি হইতে খাজনা আর বেশি বাড়ানো সম্ভব হইবে না—ইহাও উৎপাদক বিনিয়োগ না হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

উদ্বৃত্তের প্রবাহপথ : কাহারা সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের আধার

এই সকল কারণে অতিভোগে নিয়োগের পরে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত ব্যয় হয় মহাজনী কারবারে এবং ক্রম-নিঃস্ব চাষীদের হাত হইতে আরও বেশি জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এই সকল অনুৎপাদক ব্যয়ের মধ্যেই সমাজের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত (potential surplus) নিহিত আছে ; অতিভোগ ও সকল প্রকার অনুৎপাদক ব্যয় বন্ধ করিতে পারিলেই এই উদ্বৃত্তকে উৎপাদন বাড়াইবার কাজে খাটান সম্ভব হইতে পারে।[২০]

তথাকথিত কৃষি-সংস্কারের ফলাফল

ছোটখাট কৃষি-সংস্কারের সাহায্যে এই সকল দেশে কৃষির উন্নতি করার যে সকল প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধেও কোন আশাবাদী মোহ না রাখা উচিত। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া চাষীর হাতে জমি তুলিয়া দেওয়ার নামে যে ধরণের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে, তাহাতে ভূমিহীন চাষীর একাংশ কিছু পরিমাণ জমি পাইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ কিছুমাত্র প্রশস্ত হইতে পারে না। (ক) ছোট ছোট জমি-খণ্ড হইতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা ইহাতে নাই। উপরন্তু, খাজনার পরিমাণ বাদ দিলে চাষীর হাতে বিনিয়োগের উপযুক্ত উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না।[২১]

(খ) আয় অল্প কিছুটা বাড়িলেও তাহা খুবই ক্ষণস্থায়ী, জনসংখ্যার বৃদ্ধির

---

২০ মার্কসে প্রমুখ লেখকগণ কেবলমাত্র গরীব প্রচ্ছন্ন বেকারদের মধ্যেই সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত খুঁজিয়া বাহির করেন ; কিন্তু সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত টানিয়া বাহির করিবার জন্য পরিশ্রমজীবি এই শ্রেণীকে সম্পূর্ণ অপসারণ করার কথা বলেন না।

২১ ভারতে চিরস্থায়ী এলাকায় জমিদারী উচ্ছেদের পর খাজনার হার বাড়িয়াই গিয়াছে, অন্যান্য এলাকাতেও উন্নতি-কর (betterment-levy) বেশি পরিমাণে চাপানো হইতেছে, যেমন পাঞ্জাব।

ফলে চাষীর হাতে জমির পরিমাণ আবার কমিয়া যাইতে থাকে। (গ) জমি চাষীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় বৃহৎ মাত্রায় কৃষিকার্য অসম্ভব হইয়া উঠে। (ঘ) চাষীদের খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়, ফলে খাদ্যাভাব ও দামবৃদ্ধির দরুণ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এইরূপে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সাধারণ অনুন্নতির অবস্থায় ছোটখাট কৃষিসংস্কার অর্থনৈতিক অগ্রগমনের পথ সংকুচিত করে। ধনতান্ত্রিক দেশে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়াই কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতি হয়। (ক) ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় বড় কৃষি ফার্মে কম মজুর ও মূলধন-প্রধান যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন সুরু হয়, কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্র প্রবেশ করে। (খ) জমি জমা উৎসন্ন দিয়া নিঃস্ব চাষীর দল কারখানার মজুর হইবার উদ্দেশ্যে সহরে প্রবেশ করে, শিল্পে নিয়োগোপযোগী মজুত সৈন্যদল (Industrial reserve army) গড়িয়া উঠে। (গ) শিল্প ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সহরে কাঁচামাল ও খাদ্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়—উহা বিক্রয় করিয়া কারখানাজাত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষি-পুঁজিপতি তাহার জমির উৎপাদক ক্ষমতা বাড়াইতে পারে। দ্রুত শিল্পায়নই (ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবই যাহাই হউক না কেন) একমাত্র কৃষিতে রূপান্তর আনিতে পারে, এবং অপরপক্ষে কৃষিতে রূপান্তর না আনিলে শিল্প সম্প্রসারণ কোনমতেই সম্ভবপর নহে। এইরূপে অপূর্ণোন্নত দেশে কৃষির অনুন্নতি ও শিল্পের অনুন্নতি পরস্পরকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।[২২]

কৃষিতে ধনতন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না

(খ) অপূর্ণোন্নত দেশের শিল্পের কাঠামো—পূর্ণ ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের যুগে নিজস্ব গতিবেগেই শিল্প সম্প্রসারিত হইতে থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হয়।[২৩] সামন্ততান্ত্রিক সমাজেব অচলাবস্থা দূর

---

২২ এইসকল দেশে কৃষিসংস্কাবেব যল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার না করিয়া বলা চলে না, কি অবস্থায় এবং কোন্ শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষিসংস্কার ঘটিতেছে সেই ঐতিহাসিক স্তব ও পরিবেশেব উপরই তথাকথিত কৃষিসংস্বাবেব ফলাফল নির্ভর করে।

২৩ "Capital rapidly creates for itself an internal market by destroying all handicrafts, that is by spinning, weaving, making clothes etc. for all, in fine by transforming into exchange values commodities that were hitherto reproduced as direct use values—a process that results spontaneously from the severance of the worker (albeit a serf) from land and ownership of his means of production."—*Marx*, Critique of Political Economy.

করিয়া মূলধন নিজেই ক্রমে নিজের বাজার সৃষ্টি করে। ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতেও সামন্ততন্ত্র অনেকখানি ভাঙিয়া গিয়াছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিকার্যের পরিবর্তে বাজার-মুখী কৃষিকার্য সুরু হইয়াছে, গ্রাম্যশিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে কারখানাজাত দ্রব্যের বিনিময় কিয়দংশে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রসার হইতে পারে নাই, দেশগুলি শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে।

শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভর করে শ্রম-বিভাগের প্রসারের উপর

ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিকই, কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশগুলির নিজস্ব শিল্পোন্নয়নের পথ সংকুচিত হইয়াছে। অপূর্ণোন্নত দেশের অধিবাসীদের আয় কম, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা কম, শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী বাজার নাই বলিয়া এইরূপ বিনিয়োগ ঘটিতে পারে নাই। মূলধনের চাহিদা কম কারণ বাজার নাই, এবং বাজার নাই কারণ মূলধনের চাহিদা কম;

দুষ্টচক্রের আপন গতি

মূলধনের যোগান কম কারণ সঞ্চয় বা উদ্‌বৃত্ত নাই, এবং উদ্‌বৃত্ত নাই কারণ মূলধনের যোগান কম—চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই এইরূপ দুষ্টচক্র (Vicious circle) অপূর্ণোন্নতির কাঠামোকে একই সঞ্চারপথে আবর্তিত করাইতেছে।[২৪] বিনিয়োগ যেরূপ নিজেই নিজের চালকশক্তি, বিনিয়োগের অভাবও সেইরূপ নিজেই নিজের অবস্থার ধারক ও বাহক।

এই সকল দেশে অনেক সময় বিদেশীরা শিল্প স্থাপন করে এবং দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতে কাঁচামাল ও দক্ষশ্রমিক সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন সুরু করে। নিজদেশে উৎপাদন না করিয়া তাহারা উপনিবেশেই কলকারখানা

বিদেশী বিনিয়োগে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পোন্নয়নের গতি সৃষ্টি হয় না

স্থাপন করে। কিন্তু এইরূপ বিদেশী বিনিয়োগের কোনো স্বয়ং-চালিত গতি (self-propelling movement) সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ সেই বিনিয়োগের যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা তাহারা নিজ দেশ হইতে লইয়া আসে। শুধু তাহাই নহে। একবার বৃহৎমাত্রায় কোনো শিল্প স্থাপিত হইলে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকায় অপর কোনো ফার্ম সেই শিল্পে বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হয় না, সেই শিল্পে প্রভূত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকিও অপর

---

২৪ "The low level of real income, reflecting low productivity, is a point that is common in both the circles." *Nukrse*—**Problems of capital formation in underdeveloped countries P. 4-5.**

কেহ সহসা লইতে পারে না। সংরক্ষণী শুল্ক প্রভৃতির সাহায্যে অপর কোনো বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা সংকুচিত করে। অপূর্ণোন্নত দেশের সংকুচিত বাজারে একধরণের একচেটিয়া ধনতন্ত্র (Monopoly Capitalism) গড়িয়া উঠে এবং একচেটিয়া ধনতন্ত্রের নিজস্ব গতির নিয়ম অনুযায়ীই সে শিল্পোন্নয়নের পথে অধিকতর বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে।[২৫]

বরং অকালে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়

এই সকল কারণে অপূর্ণোন্নত দেশগুলির ধনতন্ত্রের প্রকৃতি এইরূপ অকালপক্ক এবং আকৃতি এত জটিল। জন্মক্ষণের বেদনা ও বাল্যের অভাব-বোধ পাইয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রাবল্য ও মত্ততা উপলব্ধি করে নাই, তৎক্ষণাৎ বার্ধক্যের জরা ও শক্তিহীনতা ইহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই সকল দেশের ধনতন্ত্র বণিকযুগ (merchant phase) হইতে শিল্পযুগে (industrial phase) পৌঁছায় নাই, শ্রম ও মূলধন জিনিস কেনাবেচার স্তর হইতে (from sphere of circulation) শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ হওয়ার স্তরে (to sphere of industrial production) পৌঁছাইতে পারে নাই। কৃষির জন্য বাজার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, "উদ্‌বৃত্ত"কৃষিশ্রমিকের শিল্পে নিযুক্ত হইবার পথ উন্মুক্ত হয় নাই, কৃষিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ অনড় ও অচল করিয়া রাখিয়াছে, কাঠামোগত বেকারি (structural unemployment) সৃষ্টি করিয়াছে, কুটিরশিল্প ও মহাজনী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল ক্ষুদ্র অথচ ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী তৈয়ারী করিয়াছে।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর

অপূর্ণোন্নত দেশের একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক শ্রেণী যে প্রভূত মুনাফা করে, সেই উদ্‌বৃত্ত কিন্তু মূলধনে রূপান্তরিত হয় না। সেই শিল্প বা অপর শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উহার বিনিয়োগ হয় না। কিছুটা বিদেশের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশরূপে বিদেশে চলিয়া যায়। বাকীটা ঠিক পুরানো জমিদারদের অনুৎপাদক ব্যয়েরই অনুরূপ কাজকর্মে ব্যয় হইয়া যায়। প্রাসাদোপম শীততাপনিয়ন্ত্রিত অট্টালিকা, গাড়ী, দাসদাসী, আমোদ প্রমোদে

একচেটিয়া ধনতন্ত্রজাত উদবৃত্ত কেন অপূর্ণোন্নতি ঘুচাইতে পারে না

[২৫] শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, সমাজদেহে প্রতিযোগিতার তাগিদে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারেই প্রতিযোগিতা লুপ্ত হইয়া একচেটিয়ার উদ্ভব হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে প্রথম হইতে একচেটিয়া স্থাপিত হওয়ায় ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল যুগের সুফলগুলি পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থারই স্বাভাবিক গতিতে বর্তমানে এই সকল দেশে রাষ্ট্র ও কতিপয় পুরাতন ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের মিলিত নেতৃত্বে এক ধরণের মিশ্র একচেটিয়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে (ভারতের শিল্পনীতি দ্রষ্টব্য)।

কুকুরের দৌড় ও ঘোড়দৌড়ে উহার ব্যয় হয়; অপূর্ণোন্নত দেশটি স্বাধীন হইলে "স্বাধীন" রাজনৈতিক নেতাদের নিজস্বার্থে নিয়োগের কাজে এবং উচ্চপদস্থ দেশীয় চাকুরিয়াশ্রেণী সৃষ্টি করার কাজে উহার কিছু অংশ ব্যয়িত হয়। যে অপূর্ণোন্নত দেশের শ্রম ও প্রকৃতিদত্ত সম্পদ আহরণ করিয়া সেই উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি, সেই দেশ অপূর্ণোন্নতই থাকে।

পরিশিষ্ট (১)

জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা—A short note on the economic development of Japan.

ভারত কেমন করিয়া অপূর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইল উহার পাশাপাশি জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা দরকার। এশিয়ার মধ্যে জাপানই এমন একটি প্রধান দেশ যাহার উপর সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন হয় নাই। এশিয়ার অন্যান্য প্রায় সকল দেশই বিদেশের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গীতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইতে পারিয়াছে। চীন সম্পর্কেও বলা যায় যে, বৈদেশিক পুঁজিপতিরা হস্তক্ষেপ না করিলে তাহার নিজস্ব গতিবেগে সামন্ততন্ত্র উৎখাত হইয়া নিশ্চয়ই ধনতান্ত্রিক বিপ্লব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইত।[২৬]

এশিয়ার ইংলণ্ড —জাপান

পশ্চিমী ধনতন্ত্র যখন ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা হইতে দেশের পূর্ব সঞ্চিত অর্থ এবং তৎকালীন উৎপাদনের একাংশ লুণ্ঠন করিতেছিল, তখন জাপানের অবস্থা এশিয়ার অপর কোন দেশ অপেক্ষা উন্নত বা শিল্পোন্নয়নের উপযোগী ছিল না। জমি ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীর হাতে জমি [২৭]—এইরূপ অবস্থা জাপানেরও ছিল।

---

২৬ "In the commodity production unfolding in the depths of chinese feudal society there were nascent already the first beginnings of capitalism. China would have therefore even without the impact of foreign capitalism gradually developed into a capitalist country."—*Maotse Tung*, **Selected Works** vol. III. P. 142.

২৭ "With its purely feudal organisation of landed property and its developed small peasant economy "—*Marx.*

শুধু তাহাই নহে, দেশের শাসনতন্ত্র যাহাদের হাতে ছিল তাহারা কেবল যে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ তাহাই নহে। তাহারা ছিল যে কোন পরিবর্তনের ঘোরতর বিরোধী। ব্যবসায়ী শ্রেণীদের প্রায় সমাজ-বহির্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছিল, সমাজের উদ্‌বৃত্তের বৃহৎ অংশ দ্বারা সামরিক বাহিনীকে লালন পালন করা হইত। সামন্ততান্ত্রিক শাসনের এই জড়ত্বের মধ্যেই সহরে ও গ্রাম্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে প্রভূত মূলধন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর শিল্পপুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে বহু বাধা নিষেধ আরোপিত ছিল।

জাপানের অবস্থা ভারতের তুলনায় উন্নত ছিল না, কিন্তু উহার উদ্‌বৃত্ত লুট হয় নাই

মেইজি বিপ্লবের (Meiji Restoration) অন্যতম প্রধান ফলই হইল জাপানে এমন একধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাহাতে দেশে পুঁজিতন্ত্রের প্রসার হইতে পারে। সকল দেশেই ধনতান্ত্রিক শক্তি নিজের প্রয়োজনমত রাষ্ট্রসংগঠন তৈয়ারী করিয়া লয়; জাপানের মেইজি বিপ্লবের ফলেও যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাতে অন্যথা হয় নাই। বরং অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ না করিয়া পরোক্ষভাবে ধনতন্ত্র বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু জাপানের মেইজি শাসন প্রত্যক্ষভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশে প্রতিপদে সাহায্য করিয়াছে। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের গুরুত্ব তাই অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব

জাপানী ধনতন্ত্রের অগ্রগতির যুগে কৃষি সংস্কার করা হয় নাই, বরং কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বজায় রাখিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্রুত গতিতে শিল্পবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। জাপানী ধনতন্ত্রের প্রধান মূলধন-সঞ্চয়ের উৎস ছিল কৃষি; জাপানী গ্রামই জাপানী পুঁজির উপনিবেশ হিসাবে কাজ করিয়াছে। কৃষিতে শোষণ বাড়াইবার ফলে মজুরের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল এবং মজুরির হার অত্যন্ত কম রাখা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া সরকারী ঋণপত্রে যে দাম দেওয়া হইল তাহার ফলে মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া গেল এবং শিল্পমুখিতা বৃদ্ধি পাইল। সামন্ত প্রভুর সহিত জমির আর চাষীর সম্পর্ক রহিল না, সরকারী অর্থ পাওয়ায় সেই টাকা ব্যাঙ্ক, শেয়ার, শিল্প ও বড় বড় কৃষি ফার্মে খাটাইয়া সে শিল্পপ্রভুতে রূপান্তরিত হইল, এই সকল অর্থ ব্যাঙ্কের হাতে জমা হইয়া দেশে বিপুল ঋণ প্রসারের সম্ভাবনা বাড়াইয়া

রাষ্ট্র কিরূপে সাহায্য করিয়াছে

তুলিল। ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে দেশের সরকার ঋণ পাইত, সরকারের নিকট হইতে ব্যাঙ্কসমূহ ঋণ পাইত, সরকারী কোষাগার ও ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এইরূপে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইল।

জাপানে ধনতন্ত্র বিকাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হইল যে, জাপানী রাষ্ট্র নিজেই প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিল। রেলপথ নির্মাণ, জাহাজ তৈয়ারী, পথঘাট তৈয়ারী, মূল ও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা, যন্ত্রপাতি তৈয়ারী—সকল কাজেই রাষ্ট্র নিজে মূলধন নিয়োগ করিয়াছিল। কোনো শিল্পকে বলা হইল যে, ভবিষ্যতে বহু বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্র তাহার মালপত্র কিনিবে, কোনো শিল্পে বিনিয়োগ করিলে রাষ্ট্রের তরফ হইতে গ্যারাণ্টি দেওয়া হইল। সরকারী কণ্ট্রাক্ট হইতে ইহারা প্রভূত অর্থ পাইল। কিছুদিন পরে অত্যন্ত কম দামে এই সকল রাষ্ট্রীয় শিল্প ওই সকল পুঁজিপতিদের নিকটই বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। পশ্চিমী ধনতন্ত্রের বিকাশে যেমন ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী সাহসী বীর বহু উদ্যোক্তা পুঁজিপতি দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানে সেইরূপ ক্লাসিকাল উদ্যোক্তা পাওয়া যায় না, এখানে প্রধান শিল্পনেতা হইল রাষ্ট্র।

এশিয়াতে শিল্পোন্নতি জাপানেই প্রথম দেখা দিল তাহার কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। প্রথমতঃ, এশিয়াতে জাপানই দেশের পুর্বসঞ্চিত মূলধন ও উদ্‌বৃত্ত ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে।

এশিয়ার মধ্যে কেন জাপানেই শিল্পবিপ্লব ঘটিল

দ্বিতীয়তঃ, এশিয়াতে জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ খুব কম এবং জনগণের দারিদ্র্য খুব বেশি। ইউরোপে যেমন ইংলণ্ড দরিদ্র থাকায় ও প্রাকৃতিক সম্পদে গরীব থাকায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের উপযোগী মনের জোর সংগ্রহ করিয়াছে, জাপানের ক্ষেত্রেও তাই। তাহা ছাড়া দেশ গরীব হওয়ার ফলে সেই দেশ বিদেশী আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াও উঠে নাই।[২৮]

তৃতীয়তঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিমী ধনতন্ত্রের প্রবেশ এশিয়াতে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণে ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্র ততদিনে শক্তিশালী হইয়া উঠায় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ভারসাম্য

---

২৮ শ্যামদেশও লুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ ও উর্বরতা বেশি হওয়ায় এইরূপ উন্নয়ন ঘটে নাই।

এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহাতে ব্রিটেন চীনকে ভারতের মত অবস্থায় পরিণত করিতে পারে নাই এবং জাপানকে নিজের পথে বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইতে দিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, জাপান নিজে পরাধীন না হওয়ায় এখানে অন্যান্য দেশের মত বিদেশী শিক্ষা ও যন্ত্রজ্ঞানের শিক্ষার প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব দেখা দিতে পারিল না। সর্বোপরি, বৈদেশিক আক্রমণ না হইয়া এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি থাকায় জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বেগ দ্রুততর হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহারাই জাপানী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ।

পরিশিষ্ট (২)

ভারতে ব্রিটিশ লুট ও ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ—British loot in India and Britain's Capitalist development.

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভারত-লুটের প্রভাব কতখানি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া Brooks Adams লিখিতেছেন [২৯]:

"ভারতের ঐশ্বর্যের অনুপ্রবেশ ব্রিটেনের নগদ পুঁজির প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটাইয়া জাতির শক্তিভাণ্ডারকে কেবলমাত্র বাড়ায় নাই, উহার গতির নমনীয়তা ও বেগও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর অতি অল্প কালের মধ্যেই বাংলাদেশের লুটের মাল লণ্ডনে পৌছিতে সুরু করিয়াছিল এবং উহার ফলও তৎক্ষণাৎ দেখা দিল; কারণ সকল বিশেষজ্ঞরাই স্বীকার করেন যে, শিল্প বিপ্লব—যে ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীকে পূর্ববর্তী সকল যুগ হইতে পৃথক করিয়া তুলিয়াছে—তাহা ১৭৬০ সাল হইতেই সুরু হইয়াছিল। বেইনেসের (Baines) মতে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ভারতের ন্যায় প্রায় একই প্রকার সরল ধরণের ছিল; আর জ্বালানির প্রয়োজনে জঙ্গল উৎখাত করার ফলে ১৭৫০ সালের দিকে ইংলণ্ডের লৌহশিল্প সম্পূর্ণভাবে পতনোন্মুখ ছিল। সেই সময়ে ব্রিটেনে ব্যবহৃত লৌহের $\frac{৪}{৫}$ ভাগই সুইডেন হইতে আসিত।

"পলাশীর যুদ্ধের ঘটনা ঘটে ১৭৫৭ সালে; এবং তাহার পরেই পরিবর্তনের যে দ্রুতবেগ সৃষ্টি হয় সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত উহার সমান আর কিছু দেখা যায়

[২৯] The Law of Civilisation and Decay, P. 259-60 – *Brooks Adams.*

না। ১৭৬০ সালে ফ্লাইং শাটেলের (Flying Shuttle) আবির্ভাব ঘটিল, লৌহ গলাইবার প্রয়োজনে কয়লা কাঠের স্থান অধিকার করিল, ১৭৬৪ সালে হারগ্রীভস্ (Hargreaves) স্পিনিং জেনি (Spinning jenny) আবিষ্কার করিলেন, ১৭৭৬ সালে ক্রম্পটন কাপড় তৈয়ারীর কাজে মিউল (Mule) ব্যবহার সুরু করিলেন, ১৭৮৫ সালে কার্টরাইট শক্তিচালিত তাঁতযন্ত্রের ব্যক্তিগত স্বত্বের অধিকার লাভ করিলেন, এবং সর্বোপরি, ১৭৬৮ সালে ওয়াট (Watt) বাষ্পীয় এঞ্জিনকে পাকা করিয়া তুলিলেন—এই বাষ্পীয় এঞ্জিনই হইতেছে কেন্দ্রীভূত শক্তিকে বিভিন্নক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার সবচেয়ে ক্রটিহীন যন্ত্র। যদিও এই সকল যন্ত্রপাতি সেই যুগের ত্বরিত গতিবেগের বিভিন্ন উৎসমুখ খুলিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহারাই এই গতিবেগের কারণ নহে। কেবল আবিষ্কারসমূহের দিক হইতে বিচার করিলে উহারা নিষ্ক্রিয়, উহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণগুলির মধ্যেও অনেকগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া চাপা পড়িয়াছিল, তাহাদের সক্রিয় করিয়া তোলার উপযুক্ত শক্তিভাণ্ডার সঞ্চিত হওয়ার অপেক্ষায় কাল কাটাইতেছিল। আর সেই শক্তিভাণ্ডারকে অবশ্যই সর্বদা টাকার আকারে প্রকাশ পাওয়া চাই—আর উহা মজুত-রাখা টাকা হইলে চলিবে না, চলমান গতিশীল হইতে হইবে। ভারতের ঐশ্বর্যের অনুপ্রবেশ এবং উহার ফলে ঋণের প্রসারের পূর্বে এই প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত কোনো শক্তির অস্তিত্ব ছিল না; ওয়াট্ যদি ৫০ বৎসর পূর্বে জন্মাইতেন, তবে তিনি ও তাঁহার আবিষ্কার উভয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। ভারতে ব্রিটিশ লুট হইতে যে পরিমাণ ঐশ্বর্য আদায় হইয়াছে, পৃথিবীর সুরু হইতে এ পর্যন্ত এমন কোনো লগ্নী দেখা যায় নাই, যাহাতে লাভের হার উহা অপেক্ষা বেশি—কারণ প্রায় ৫০ বছর ধরিয়া ইংলণ্ডের কোনো প্রতিযোগী ছিল না। ১৬৯৪ হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত (১৭৫৭) উন্নয়নের গতি ছিল অপেক্ষাকৃত শ্লথ; ১৭৬০ হইতে ১৮১৫ সালের মধ্যবর্তীকালে ইহা ছিল অতি দ্রুত ও বিস্ময়কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উন্নয়নের তত্ত্ব (Theory of Development)

অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি বা উন্নয়ন কাহাকে বলে [১] (Definition of Economic Growth or Development)

কলিন্ ক্লার্কের মতে "অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংজ্ঞা হইল অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি।" অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি হইতেছে বলিলে বোঝা যায় (ক) অর্থের সহিত বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর ও কাজকর্মের প্রাচুর্য, (খ) পরিশ্রম কমিয়া যাওয়া বা বিশ্রামের (Leisure) পরিমাণ বৃদ্ধি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিলে বোঝা যায় সর্বাপেক্ষা কম শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের (প্রকৃতিদত্ত ও শ্রম-সৃষ্ট) সাহায্যে ঐ সকল কাজকর্মের ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ান।[২]

কলিন ক্লার্কের সংজ্ঞা ; অর্থনৈতিক কল্যাণের বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (বা উন্নয়ন) বলিলে বোঝা হইবে কিছু পরিমাণ

---

১ *Paul Baran*—Political Economy of Growth.

২ "Economic progress can be defined simply as an improvement in economic welfare, following Pigou, can be defined in the first instance as an abundance of all those goods and services which are customarily exchanged for money. Leisure is an element in economic welfare, and more precisely we can define economic progress as the attaining of an increasing output of those goods & services for a minimum expenditure of effort, and of other resources, both natural and artificial."—*Colin Clark,* The conditions of economic progress, P. 8.

এই সংজ্ঞা গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা আছে। (ক) কল্যাণের সহিত অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধিকে সমান করিয়া ফেলা যায় না, কারণ দেশে মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ কল্যাণ বৃদ্ধি করে না, যেমন বর্তমানে তৈয়ারী মূলধনী দ্রব্য যাহা এখনই উৎপাদনে নিযুক্ত হইতেছে না, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক দ্রব্যাদি, আমদানী-রপ্তানীর হিসাবে নীট রপ্তানীর উদ্বৃত্ত প্রভৃতি। (খ) অর্থের সহিত বিনিময়যোগ্য নহে এইরূপ বহু দ্রব্যাদি ও কার্যাদি অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির সহিত জড়িত থাকিতে পারে (স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট প্রভৃতি)। আবার অর্থের সহিত বিনিময়যোগ্য অনেক দ্রব্য বা কার্য অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়ায় না (যেমন, বিলাসব্যসনের দ্রব্য, নেশার জিনিসপত্র, আয়কর ফাঁকি দেওয়াইবার উপযুক্ত উকিলের কাজকর্ম)। (গ) সর্বোপরি, অর্থনৈতিক কল্যাণ পরিমাপের যোগ্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নাই, কম ব্যয়ে বা কম পরিশ্রমে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িল কি না তাহা পরিমাপের বাস্তব কোনো মানদণ্ড এই সংজ্ঞা হইতে পাওয়া যায় না।

সময়ের মধ্যে (কোন দেশের অধিবাসীদের) মাথাপিছু বস্তুজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি (Increase over time in percapita output of material goods)। এই সংজ্ঞারও কয়েকটি বাস্তব ত্রুটি আছে, তাহা মনে রাখা দরকার। যেমন দুইটি পৃথক সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ তুলনা করার অনেক রকম অসুবিধা দেখা দিতে পারে।[৩]

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির সংজ্ঞা নির্ণয়

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি যখন ধীর ও গতির হার মন্দ তখন এই সকল সমস্যা ততটা অসুবিধার স্থষ্টি করে না। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ বেশি থাকিলে উৎপন্নদ্রব্যের সূচক (output index) তৈয়ারীকরা বিশেষ অসুবিধা-জনক, কারণ কেবল যে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হয় তাহা নহে, বহু নূতন নূতন দ্রব্য দেখা দেয় এবং বহু পুরানো দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণেও দ্রুত পরিবর্তন আসিতে থাকে। অর্থের হিসাবে পরিমাপের বহু বাস্তব অসুবিধা আছে, যেমন দামস্তরে বৃদ্ধি বা হ্রাস মাথাপিছু আয়ের হিসাব বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। ইহার মধ্যে "কাজকর্ম" (services) হিসাব করা উচিত নয়, বস্তুজাত দ্রব্যসামগ্রীই (Material goods) গণনা করা দরকার। উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এইরূপ অনুৎপাদক কাজকর্ম, (unproductive services or labour, যেমন—নাচ, গান, ঘোড়দৌড়, সার্কাস, ওকালতি, মোক্তারি, প্রভৃতি) বাড়িয়া গেলে দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার দ্রুত হইয়াছে, এরূপ মনে করা উচিত হইবে না।[৪]

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির তত্ত্ব (Theory of Economic growth)

মূল প্রশ্ন হইল মাথাপিছু বস্তুজাত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বা মাথাপিছু প্রকৃত আয় (Real Income per capita) বৃদ্ধি পায় কিরূপে ও কেন। চারিটী কারণে এই বৃদ্ধি হইতে পারে। (ক) কোনো সাংগঠনিক বা যন্ত্রজনিত

৩ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া দেশের মোট উৎপাদন গঠিত, বহু বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর গুণাগুণ অনবরত পাল্টাইতেছে, পুরানো দ্রব্য লোপ পাইয়া নূতন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

৪ "In the eastern European countries services not directly connected with the production and transport of goods are not regarded as productive and their value is thus excluded from national income. For a poor country which is trying to develop its industry and to reduce the underemployment common in service trades, the Marxist definition of national income has some obvious advantages over the more inclusive concept suited to wealthy industrialized economies and now commonly adopted in underdeveloped countries"—*United Nations*, Economic Survey of Europe since the war (1958), P, 25.

(organisational or technological) পরিবর্তন না আনিয়া কেবলমাত্র দেশের উপকরণগুলির (শ্রম ও ভূমি) ব্যবহার বাড়ান যাইতে পারে। (খ) কেবলমাত্র সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটানো যাইতে পারে, যেমন উৎপাদনের একদিক হইতে সরাইয়া উপকরণগুলিকে অন্যদিকে খাটান, শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় বাড়ান। (গ) পুরানো ও জরাজীর্ণ যন্ত্রপাতির বদলে দক্ষ যন্ত্র নিয়োগ করা যাইতে পারে। (ঘ) সর্বোপরি, নূতন যন্ত্রপাতি (উন্নত স্তরের বা একই স্তরের) ও উৎপাদনের নূতন সুযোগ সুবিধা বর্তমানের সহিত যোগ করা যাইতে পারে। প্রথম তিন উপায়ে বাড়াইলে সমাজে নীট বিনিয়োগ খুব বেশি না বাড়াইলেও চলিতে পারে, কিন্তু কিছুটা বাড়ান অন্ততঃ নিশ্চয়ই দরকার। তবে চতুর্থ উপায় ছাড়া, অর্থাৎ সমাজে নীট বিনিয়োগ না বাড়াইলে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দ্রুত হইতে পারে না। যত বেশি হারে নীট বিনিয়োগ (Net investment) বাড়ান হইবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ তত অধিক হইয়া উঠিবে।

সমাজে নীট বিনিয়োগ বাড়ানই ক্রমবৃদ্ধির উপায়

নীট বিনিয়োগ বাড়ান তখনই সম্ভব হয় যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোগ ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণে নিযুক্ত সম্পদের তুলনায় মোট উৎপাদন বেশি হইয়া থাকে। যে পরিমাণ সম্পদ মোট উৎপন্ন হয় তাহার সবটুকু যদি ভোগ ও চল্‌তি মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখিতেই ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে কোনো উদ্‌বৃত্ত থাকে না। এই অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত না সৃষ্টি হইলে দেশে নীট বিনিয়োগ কেমন করিয়া বাড়িবে? সুতরাং, দেশে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি (Volume and nature) নির্ভর করে এই অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ (Volume) ও ব্যবহারের পদ্ধতির (mode of utilization) উপর।

নীট বিনিয়োগ কাহাকে বলে : অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত

যদি অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত কম সৃষ্টি হয় তবে দেশে নীট বিনিয়োগ কম হইবে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার (rate) বা গতিবেগ কম হইবে; অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত বেশি সৃষ্টি হইলে, দেশে নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগও বেশি হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টিই (generation of surplus) আসল নয়, উহা উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিযুক্ত ও ব্যবহৃত (proper utilisation of the surplus) হওয়া দরকার। যদি সেই উদ্‌বৃত্ত দেশের বাহিরে চলিয়া যায়

অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ও উহার উপযুক্ত ব্যবহারের উপরই ক্রমবৃদ্ধির গতি নির্ভর করে

বা অপরিকল্পিত উপায়ে ভুল দিকে নিযুক্ত হয় তবে ক্রমোন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ও নিয়োগ পদ্ধতির (size and mode of utilization) উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

এই দুইটি বিষয় নির্ভর করে (ক) সমাজের উৎপাদক উপকরণগুলির উন্নতির স্তর, এবং (খ) যে সমাজের মধ্যে উৎপাদনের ধারা চালু রহিয়াছে সেই সামাজিক কাঠামোর উপর। অর্থাৎ উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতির স্তর (degree of development of productive forces) এবং বহু ব্যক্তির ও শ্রেণীর বিভিন্নমুখী সম্পর্কের উপর (relations of production)। এই উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কগুলি কি ভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব।

কোনো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি হয় ইহাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব গতিশীলতা (Own dynamics) এবং উহাদের মধ্যে গতিশীল সম্পর্কের উপর (dynamic relationship)।

সুতরাং আমরা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিতরূপে জানাইতে পারি—

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি
↓
ক্রমবর্ধমান মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি
↓
নীট বিনিয়োগের বৃদ্ধি
↓
অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণে বৃদ্ধি ও উহার উপযুক্ত নিয়োগ বা ব্যবহার
↓

উৎপাদক উপকরণগুলির উন্নতির মাত্রা বৃদ্ধি	সামাজিক কাঠামোর উপযুক্ত সংগঠন
↓	↓
উৎপাদনের শক্তির নিজস্ব গতিশীলতা	সামাজিক সম্পর্কের নিজস্ব গতিশীলতা

↓
উভয়ের গতিশীল সম্পর্ক

অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের বিশ্লেষণ ও ইহার বিভিন্ন রূপ (Analysis of Economic surplus and its various forms)

অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ এবং উহার উপযুক্ত নিয়োগের উপর একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। সুতরাং অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

তিন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী

তিন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তকে বিচার করিয়া ইহার তিনটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়: (ক) চল্‌তি অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত (Actual economic surplus); (খ) সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত (Potential economic surplus); এবং, (গ) পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত (Planned economic surplus)।

চল্‌তি অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত

সমাজের চল্‌তি মোট উৎপাদন হইতে চল্‌তি মোট ভোগের পরিমাণ বাদ দিলে চল্‌তি অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত পাওয়া যায়। ইহাকেই চল্‌তি সঞ্চয় বলে। এই সঞ্চয় সেই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির (assets) আকারে সমাজের মোট সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়, (যেমন উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতি, মজুত মাল, বৈদেশিক পাওনা, মজুত নগদ টাকা বা সোনা প্রভৃতি)। যে সকল দ্রব্য ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে সেই সকল দ্রব্যের বৃদ্ধির পরিমাণই চল্‌তি অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত। আজকাল প্রায় সকল দেশেই চল্‌তি অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ পরিমাপ করার উপযোগী সংগঠন তৈয়ারী হইয়াছে এবং এইরূপ হিসাব হইতেছে।

সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত

প্রাকৃতিক ও যন্ত্রকৌশলগত পরিবেশ (Natural & Technological environment) স্থির রাখিয়া সামাজিক কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিলে যে মোট উৎপাদন হইতে পারিত তাহা হইতে সমাজের প্রয়োজনীয় ভোগ (essential consumption) বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকেই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত বলে। সমাজের সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত তুলিয়া লইতে হইলে উৎপাদন সংগঠনে ও সমাজের কাঠামোতে বহু পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। প্রথমতঃ, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকজনের প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ-ব্যয় কমাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনুৎপাদক শ্রমিকেরা

থাকার ফলে সমাজের যে উৎপাদন নষ্ট হইতেছে তাহা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বর্তমান উৎপাদন সংগঠনের মধ্যে অযৌক্তিক ও অপচয়মূলক সাংগঠনিক কাঠামো থাকার দরুণ যে উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে না সেই অপচয় দূর করিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশৃংখলা এবং তথাকথিত কার্যকরী চাহিদা (effective demand) কম থাকার দরুণ উদ্ভূত বেকারির ফলে যে উৎপাদন নষ্ট হইতেছে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। উন্নততর সুসংগঠিত ধনতান্ত্রিক বিশৃংখলা হইতে মুক্ত সমাজেই এই সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত প্রকৃত উদ্‌বৃত্ত হিসাবে পাওয়া যায়। সমাজে সামন্ততান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক কাঠামো দূর করিবার প্রয়োজনীয়তা কি[৫] তাহা বুঝিবার জন্য সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত সম্পর্কে এই ধারণা থাকা দরকার।

সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত কোথায় লুকায়িত আছে

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে যখন সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখন সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করা হয়, তাহাই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত। পরিকল্পনার মাধ্যমে যে "সর্বোন্নত" স্তরে (Optimum) উৎপাদন করা যায় তাহা হইতে **"কাম্য"** (Optimal) ভোগের পরিমাণ বাদ দিলে যে উদ্‌বৃত্ত পাওয়া যায় তাহাই পরিকল্পিত উদ্‌বৃত্ত। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্মিলিত শুভবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক মন ও যুক্তির দ্বারা এই উৎপাদন ভোগ ও উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ স্থির হয়। সর্বোন্নত বলিলে সর্বাধিক বুঝায় না, দেশের জনসাধারণের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের সুখ শান্তি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা মনে রাখিয়া (সর্বাধিক মুনাফার প্রয়োজন না থাকায়) এই কাম্য (Optimum) বিন্দুতে উৎপাদন ভোগ ও উদ্‌বৃত্ত নির্ধারিত।[৬]

উৎপাদনের উপকরণগুলি কতদূর উন্নত হইয়াছে, সমাজের অধিবাসীদের ভোগের রূপ কি প্রকার এই সকল বিষয়ের উপর পরিকল্পিত উদ্‌বৃত্ত নির্ভর করে।

---

৫ বা যুদ্ধের প্রয়োজনে কতদূর সম্পদ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র টানিয়া লইয়া থাকে।

৬ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের নিজস্ব প্রয়োজনে নির্ধারিত উৎপাদন ও উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টির ফল এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত নয়, সুতরাং একমাত্র সমাজতন্ত্রেই ইহাদের কাম্যবিন্দুতে (Optimum) পৌঁছান সম্ভবপর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন

Unplanned Capitalist Development

কোনো দেশে কোনো সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বা গতিবেগ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে সেই কাঠামোতে কি পদ্ধতিতে উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি ও নিয়োগ ঘটিতেছে উহার উপর। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হইত প্রধানতঃ জমি হইতে ভূমিদাসদের দ্বারা এবং উহা ব্যবহৃত হইত জমিদার ও ভূম্যাধিকারীদের বিলাস ব্যসন চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। ফলে এইরূপ সমাজে উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হইত খুবই কম এবং উক্ত মূলধন হিসাবে আরব্ধ সম্পদ ও উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করার কাজে নিযুক্ত হইতে পারিত না। ইহার দরুণ সমাজ-কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ খুবই কম থাকিত।

সামন্ততন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার কম কেন

কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হয় বৃহদায়তন কলকারখানা হইতে মজুরদের দ্বারা, তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট উদ্‌বৃত্ত মূল্য পুঁজির মালিক নিজে পুনরায় মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিয়া ক্রমশঃ আরও উদ্‌বৃত্ত মূল্য ও মূলধন গড়িয়া তুলিতে থাকে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি ও উহার ব্যবহারের পদ্ধতি এরূপভাবে বদলাইয়া যায় যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বেশি কেন

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের উপর অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধানিষেধ আরোপিত থাকে; তাই সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের পর হইতেই ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের মুনাফা বাড়াইবার অবিরাম প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে। নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মারফৎ তাহারা অবিশ্রান্তভাবে মূলধন-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে থাকে, মূলধনের সাহায্যে মজুর খাটাইয়া যে উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করে তাহার সাহায্যে পুনরায় অধিকতর মূলধন নিয়োগ এবং অধিকতর উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি —এই ধারায় ধনতন্ত্রের অগ্রগতি হইতে থাকে। নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দরুণ উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি করিতে তাহারা বাধ্য হয়, বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উন্নতিতে যন্ত্রশিল্পের (techno-

উৎপাদন ও বিনিয়োগের ঘূর্ণিচক্র

logy) দ্রুত উন্নতি হয়, শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করে, নিত্য নূতন বাজার ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে থাকে। দেশে অব্যবহৃত উপকরণ পড়িয়া থাকিতে পারে না। উৎপাদক উপকরণসমূহ সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়, কারণ ব্যয় না কমাইতে পারিলে মুনাফা সর্বাধিক হইবে না, মূলধন-সঞ্চয় দ্রুত হইতে পারিবে না, প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইতে হইবে। মূলধনের অপচয় হইতে পারে না, কারণ উৎপাদক বিনিয়োগে নিযুক্ত না হইলে উহা হইতে অধিকতর মূলধন-সঞ্চয় সম্ভব হইবে না। মূলধন-সঞ্চয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান ও এইরূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠা একই সঙ্গে অধিকতর মূলধন-সঞ্চয়ের কারণ ও কার্যফল। ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে দেশের মোট সম্পদ ও জাতীয় আয় খুবই প্রসারিত হইতে থাকে।

মজুরি বাড়ে না, তাই উদ্‌বৃত্ত বেশি থাকে

এই ব্যবস্থায় কেবল যে উৎপাদন বাড়ে তাহাই নহে, জাতীয় সম্পদের অধিক অংশই অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তে রূপান্তরিত হইতে পারে। মজুরদের নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় মজুরির হার জীবন-ধারণের স্তরের (Subsistence level) বেশি হইতে পারে না। শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কৃষি বিপ্লবের ফলে সহরে মজুরের সংখ্যা বাড়ে, বলিয়া মজুরের বাজারে তাহাদের পর্যাপ্ত যোগান থাকে। মজুরীর হার কম থাকে, যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করাইয়া লয় (Supply creates its own demand)।

অনুৎপাদক শ্রমিক থাকে না, তাই উদ্‌বৃত্তের অপচয় হয় না

প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রে "অনুৎপাদক" শ্রমিকের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এইরূপ সমাজের প্রথম দিকে সকল শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই মূলধন-সঞ্চয়ের গতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। সামন্ত প্রভু বা রাজা বাদশাহের বিলাস বহুল জীবনযাত্রা তুলিয়া দেওয়া হয়, ব্যয়বহুল ধর্মকর্ম যজন যাজন কমাইয়া পরিমিতিবোধ সারল্য ও অনাড়ম্বরতার উপর নূতন ধর্মীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়।[১]

মহাজন, দালাল ও ব্যবসায়ী শ্রেণী থাকে বটে, কিন্তু তাহারা নূতনরূপে পরিবর্তিত হইয়া ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অঙ্গ হইয়া পড়ে। তখন তাহারাও

১ ব্রিটেনের পিউরিটান ধর্মের সহিত পুঁজিপতিদের সংযোগের ইহাই গোড়ার কথা।

"উৎপাদক" শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করা চলে। তাহাদের কাজকর্ম অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টিতে সাহায্য তো করেই, মোট অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের যে অংশ তাহারা পায় তাহার অধিকাংশই (প্রতিযোগিতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের তাগিদে) সঞ্চিত হইতে থাকে।

ধনতান্ত্রিক শিল্পপতিরা বা পুঁজিপতিরা যে উদ্‌বৃত্ত হাতে পায় তাহার অপব্যয় হইতে পারে না; প্রতিযোগিতার চাপে তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মূলধন-সঞ্চয়ের তাগিদ আসিয়া পড়ে। 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে' (Struggle for existence) একমাত্র যোগ্যতমই বাঁচিয়া থাকিতে পারে' (Survival of the Fittest), 'অযোগ্যের বিলুপ্তি' ঘটিবেই (Elimination of the unfit)। কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা সাধারণ অবস্থা হইতে পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হইয়া তাহারা পূর্বের সারল্য ও অনাড়ম্বরতা বজায় রাখিবারই চেষ্টা করে। সমগ্র দেশে সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তর আসে, ব্যয়কুণ্ঠ জীবনযাপন ও মূলধনসঞ্চয় জীবনাদর্শের রূপ গ্রহণ করে।[২]

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অন্তর্নিহিত নিয়মেই অপচয় হইতে পারে না

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইরূপ সর্বাধিক অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি ও উহার নিয়োগ পদ্ধতির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধির হার খুবই বেশি হইতে পারে। একমাত্র বাধা থাকে কৃষিক্ষেত্র। কৃষিতে সামন্ততন্ত্র চলিতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম দেখা দিবে, কৃষিজাতদ্রব্যের দাম বাড়িবে, মজুরির হার বাড়াইতেই হইবে, অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। তাই ক্রমে কৃষিতেও ধনতন্ত্র প্রবেশ করে, যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়িতে থাকে। "স্বাধীন সরল" ক্ষুদ্র চাষীর দল গ্রাম ছাড়িয়া সহরের মজুর হয়, আর বৃহৎ যন্ত্রপাতির সাহায্যে কারখানার ভংগীতে কৃষিকার্য সুরু হয়।[৩] এইরূপে উদ্‌বৃত্তসৃষ্টি ও মূলধনসঞ্চয়ের তাগিদেই

কৃষিতে ধনতন্ত্র আসিয়া পড়ে

---

২ The money cult implies its own asceticism, its own self-denial, its own self-sacrifice—parsimony and frugality, a contempt for worldly, temporal and transient satisfactions ; it implies the striving for *everlasting* treasure.

—*Marx*, **Critique of Political Economy.**

৩ The commons in England, the Tiers-Etat in France, the bourgeoisie of the continent generally......were a saving class, while the posterity of the feudal aristocracy were a squandering class......Therefore the former by degrees substituted themselves for the latter as the owners of a great proportion of the land. *J. S. Mill*—**Principles of Political Economy.**

সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরিত হয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির সর্বাধিক হার দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে (Competitive capitalism) এইরূপ দ্রুত অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ঘটে ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পরে এই কাঠামো নিজস্ব নিয়মের তাগিদেই একচেটীয় ধনতন্ত্রে (Monopolistic capitalism) রূপান্তরিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বা ক্রমবৃদ্ধির হার আর দ্রুত থাকিতে পারে না। এক সময় যে কাঠামো উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি, মূলধন-সঞ্চয় ও সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম বিনিয়োগ সম্ভব করিয়াছিল, সেই কাঠামো পরিবর্তিত হওয়ায় পরবর্তীকালের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি ও উহার সুষ্ঠু বিনিয়োগ বাধা পায়। অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার কমিয়া যায়, পরিপক্বতা, নিশ্চলতা, বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা আসিয়া পড়ে (Maturity and Stagnation)।

কিন্তু অবশেষে ইহারই মধ্যে একচেটিয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে

মনে রাখা দরকার, প্রতিযোগিতার নিজস্ব গতিশক্তি ও অন্তর্নিহিত যুক্তিতেই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়, উহা নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটায়। উৎপাদনকারী ফার্ম যত বৃহৎমাত্রায় ও সম্পদশালী হইয়া উঠে, এই তীব্র প্রতিযোগিতায় তাহারই তত বেশি টিঁকিয়া থাকার সম্ভাবনা, প্রতিযোগিতায় সাফল্যের অবশ্য-প্রয়োজনীয় এই সর্তই ফার্মগুলিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায়, একচেটীয় ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উদ্ভব হয়।[৪]

উহারই নিজস্ব নিয়মে

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির চারিটি 'ক্লাসিকাল' কারণ বা বাস্তব সর্ত আছে (Four classical objective[৫] conditions of growth): (ক) বর্তমানের সকল উৎপাদক উপকরণের পূর্ণ ব্যবহার, (খ) দেশে মজুরীর হার (অর্থাৎ ভোগের স্তর) এমন নীচু থাকা যাহাতে পূর্ণনিয়োগের স্তরে উৎপন্ন সম্পদের অধিকাংশই উদ্‌বৃত্তে পরিণত হইতে পারে, (গ) এই উদ্‌বৃত্ত যাহারা পায় তাহারা ইহার অপব্যয় না করিয়া সর্বাধিক অংশ বিনিয়োগ করে, অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তের বেশির ভাগ অংশই

প্রতিযোগিতামূলক ক্লাসিকাল ধনতন্ত্রে উন্নয়নের হার বেশি থাকে

[৫] Subjective বা ভাবগত কারণের মধ্যে প্রধান হইল পুঁজিতান্ত্রিক মনোবৃত্তির প্রসার—ইহা এই সকল বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

মূলধনে রূপান্তরিত হয়, এবং (ঘ) উপযুক্ত মুনাফাতে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ বা ক্ষেত্রের কোনো অভাব থাকে না।

ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একচেটীয় ধনতন্ত্রের যুগে এই সকল অবস্থা বা সর্ত বজায় থাকে না, তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধির হার দ্রুত হইতে পারে না। এই যুগে বেকারি, অব্যবহৃত শ্রম ও যন্ত্রশক্তি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস করান প্রভৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সকল উৎপাদক উপকরণের পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। দেশের ভোগের স্তরে বৃদ্ধি মুনাফাবৃদ্ধির তুলনায় কমই হইয়াছে, তাই একমাত্র ভোগের স্তর ও প্রকৃত মজুরির হার কম রাখিয়াই যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হইতেছে। উপকরণগুলির পূর্ণব্যবহার না করিয়া ভোগের স্তর সংকুচিত রাখিয়াই উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। যাহারা এই উদ্‌বৃত্ত পায় তাহারা পূর্বের ন্যায় আর ব্যয়কুণ্ঠ নাই; বিজ্ঞাপন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এবং একচেটীয় অধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোভাব যাহাতে অনুকূলে আসে সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রচার ও রাজোচিত বিলাসব্যসন প্রভৃতিতে উদ্‌বৃত্তের একাংশ নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও এই বিপুল উদ্‌বৃত্তের পরিসমাপ্তি নাই। তাই রাষ্ট্রীয় সহযোগে বিদেশে সাম্রাজ্যস্থাপন, যুদ্ধ, গুপ্তচরবৃত্তি প্রভৃতিতে এই উদ্‌বৃত্তের নিয়োগ ঘটিতেছে। দেশের মধ্যে বেকারি রহিয়াছে, ভোগের স্তর কম রহিয়াছে, অনাহার ও অশিক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু আকাশে স্পুটনিক উড়িতেছে, পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহান্তরে বিনিয়োগের সুবিধাজনক ক্ষেত্র (suitable investment opportunities) খোঁজা হইতেছে।

কিন্তু একচেটীয় ধনতন্ত্রে উন্নয়নের কোন সর্তই পূরণ হয় না

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন

Planned Socialist Development

অপূর্ণোন্নত দেশগুলি যদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে চায় তবে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ। যাহাতে অপূর্ণোন্নত দেশের জনসাধারণ পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা মনে না আনেন, সেই জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিরূপে শিল্পোন্নয়ন হইয়াছিল সেই ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, বর্তমানের সামাজিক ও সম্পত্তিগত সম্পর্কগুলি (Present social and property-relations) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপে দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটান যায় কেবলমাত্র সেই তত্ত্বই উপস্থিত করা হইতেছে।[১]

পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্র যদি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কতিপয় শিল্প স্থাপন করে ও পরিচালনা করে, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ না করে, দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রক্ষা করে এবং বিদেশী মূলধন স্থাপনের সুযোগ দিয়া পুরাণো বা নূতন শোষণের কাঠামো কায়েম রাখে, তবে সেই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ খুবই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাহা সীমাবদ্ধ ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকেই ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত বাড়াইবার হার কম থাকে, উহার ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিছুতেই হইতে পারে না।

অপূর্ণোন্নত দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার সমস্যা পূর্ণোন্নত দেশের সমাজতন্ত্র হইতে পৃথক ও বহুল পরিমাণে জটিল। পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজের উৎপাদনী শক্তির বা উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বেশি, উহার বিজ্ঞানসম্মত নিয়োগই হইল প্রধান সমস্যা। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে একদিকে দেশের উপকরণগুলিকে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার

অপূর্ণোন্নত দেশে সমাজতন্ত্রের স্থাপনের পথ খুবই কষ্টসাধ্য এবং পূর্ণোন্নত দেশ হইতে পৃথক

১ জাতিসংঘ হইতে প্রকাশিত বা পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক আলোচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় সকল তত্ত্বের রূপই হইল এই প্রকার। তাহারা ধরিয়াই লন যে, উন্নয়নের অর্থ হইল সামন্ততন্ত্র হইতে পশ্চিমী দেশোপযোগী ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রীতিনীতি ও মনোবৃত্তি গড়িয়া তোলা। ইহারা শিল্পায়নের সহিত ধনতান্ত্রিক বিকাশকে এক করিয়া ফেলেন। উহাদের যে কোনো রিপোর্ট বা বই হইতেই ইহা বোঝা যাইবে।

করিবার মত সংগঠন তৈয়ারী করিতে হইবে, অপরদিকে এই কাজ সফল করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে।[২]

অপূর্ণোন্নত দেশের সমাজতন্ত্রের কাজই হইল পুরাণো অর্থনীতির সংস্কার এবং নূতন সংগঠন গড়িয়া তোলা (the reconstruction of the old economy and the organisation of the new); পুরাণো অর্থনীতির সংস্কারের দ্বারা সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত পাওয়া যাইবে এবং নূতন সংগঠন গড়িয়া তাহাকে তুলিয়া পরিকল্পিত উদ্‌বৃত্তে রূপান্তরিত করা যাইবে। প্রথম দিকে অনুৎপাদক শ্রেণীর ভোগ কমিবে ঠিকই, কিন্তু জনসাধারণের ভোগ বৃদ্ধি পাইয়া প্রকৃত অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত কমাইয়া দিবে। জাতীয় করণের ফলে শিল্প ও খনি, রেলপথ, বড় বড় কাঁচামাল উৎপাদনকারী কৃষিফার্ম প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত মুনাফা বা উদ্‌বৃত্ত সমাজের হাতে চলিয়া আসিবে। কিন্তু কৃষিবিপ্লবের ফলে বড় বড় কৃষিফার্ম ভাঙিয়া ছোট ছোট চাষীর হাতে বিভক্ত হইবে, চাষীদের নিকট হইতে খাজনা মকুব করা হইবে, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের শোষণ লোপ করা হইবে—ইহাতে অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সমাজের হাতে সরাসরি চলিয়া আসিবে, এমন নহে। এই সকল ক্ষেত্রে যে উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হইত তাহার দ্বারা গ্রামের জনসাধারণের ভোগের মাত্রা কিছুটা বাড়িবে।

প্রথম যুগে সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত পরিকল্পিত উদ্‌বৃত্তে রূপান্তরিত হইবে, পরে উহাকে বাড়ান হইবে

বিপ্লবের ঠিক পরবর্তী কালেই ভোগের এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বাড়িবে এমন বলা চলে না। উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সাধারণ বিশৃংখলা দেখা দেয় তাহার ফলে বিনিয়োগ ও জীবনযাত্রার মানে বৃদ্ধি ঘটান তো সম্ভব নয়ই, উহা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনাই প্রবল। কতদিন এইরূপ বিশৃংখলা থাকিবে তাহা নির্ভর করিবে বহু রাজনৈতিক কারণাবলীর উপর।[৩]

---

২ The bourgeois revolution *terminates* usually with the conquest of power, while for the proletarian revolution the conquest of power represents merely its beginning, with power employed as a leverage for the reconstruction of the old economy and the organisation of the new."

Stalin—Works vol 8. P. 21.

৩ একদিকে রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রামের তীব্রতা, পুরাণো শাসকশ্রেণীর প্রতিরোধ, অপরদিকে জনসাধারণের চেতনার স্তর, উৎসাহ উদ্দীপনা ও নিয়মানুবর্তিতা সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির যোগ্যতা ও উন্নতির স্তর প্রভৃতি।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই এই অসুবিধা বেশি পরিমাণে হইয়া থাকে; পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অসুবিধা অনেক কম হয়, পূর্বের সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা লাভবান হইতে পারে। অবশ্য প্রথম যুগের সংঘর্ষ এবং অর্থ নৈতিক বিশৃংখলা কিছুকালের জন্য অন্ততঃ তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু এই বিশৃংখলা এবং উৎপাদনের অবনতি নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, সঠিক সমাজতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করিলে মাত্র কয়েকবৎসরের মধ্যেই তাহারা অন্ততঃ পূর্বের উৎপাদন, ভোগ ও উদ্‌বৃত্ত-সৃষ্টির স্তরে পৌঁছাইতে পারিবে।[8]

প্রথম যুগে উদ্‌বৃত্ত কিছুটা কমিয়া যাইতেও পারে

কতকগুলি অনুন্নত দেশ আছে (যেমন তৈল উৎপাদনকারী মধ্য এশিয়া বা খনিজ দ্রব্য উৎপাদনকারী আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা) যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে আসিয়া পড়ে এবং জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ কিছুটা বাড়াইয়াও উৎপাদনে বিনিয়োগ করার মত উদ্‌বৃত্তের অভাব হয় না। যেখানে জাতীয় উৎপন্নের অধিকাংশ কৃষি হইতে আসে এবং সেই উৎপাদন করে মাঝারি ও ছোট চাষীরা, সেখানে এই কৃষিকার্য হইতেই উদ্‌বৃত্ত তুলিয়া আনা দরকার। শুধু দরকার নয়, ইহা উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য।

কৃষি হইতে উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করাই উন্নয়নের একমাত্র প্রথম ধাপ

"The difference between socialist revolution and bourgeois revolution lies precisely in the fact that the latter finds ready forms of capitalist relationships, while the Soviet power—the proletarian power—does not inherit such readymade relationships......The organisation of accounting, of the control of large enterprises, the transformation of the whole of the state economic mechanism into a single huge machine, into an economic organism that will work in such a way as to enable hundreds of millions of people to be guided by a single plan—such was the enormous organizational problem that rested on our shoulders."—*Lenin*—Selected works in Two vols. vol II Part I.

৪ রাশিয়াতে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হইয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ, বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব এই তিন কারণ মিলাইয়া এবং আটবৎসরের মধ্যেই যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব হইয়াছিল। চীনে এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতেও বিশৃংখলার প্রধান কারণ ছিল যুদ্ধজনিত ধ্বংস; কিন্তু তাহারা দুই তিন বৎসরের মধ্যেই পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ১৯৪৯ সালের মধ্যে (*United Nations*—Economic Survey in Europe 1949); এবং চীনে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে ১৯৫২ সালের মোট উৎপাদন পূর্বের চীনা ইতিহাসের যে কোন বৎসর অপেক্ষা বেশি হইয়াছিল (*United Nations*, Economic Bulletin for Asia and the Far east, Nov. 1958)।

কৃষি হইতে এই উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ করিতেই হইবে ইহা যেমন নিশ্চিত, সেই উদ্‌বৃত্তের সংগ্রহ করার বাস্তব অসুবিধাও খুব বেশি। কৃষি বিপ্লবের ফলে (জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও চাষীর মধ্যে জমি বিলি) গ্রামাঞ্চলের ভোগের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবেই।[৫]

ফলে চাষীর হাতে উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ কমিবে, মাথাপিছু আয় কিছুটা বাড়িলেও চাষীদের জীবনযাত্রার মানে গুণগত (qualitative) কোন পরিবর্তন হইবে না। উপবাসের অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে, কিন্তু দারিদ্র্য দূর হইবে না। যখন তাহাদের প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধিটুকু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিবে, তখন এই জন্য তাহারা বাধা দিতে আগাইয়া আসিবে। এই কারণেই বিশ শতকে সোভিয়েট রাশিয়ায় খণ্ড ছিন্ন কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রথমতঃ, কৃষি আয়করের সাহায্যে এই উদ্‌বৃত্ত তুলিয়া লওয়া চলে। কিন্তু এইরূপ খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কৃষিক্ষেত্রগুলির আয়ের প্রকৃত হিসাব করা এবং তাহা সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। চাষীরা ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে কর আদায়ে বাধা দেয়, কারণ সামন্ততান্ত্রিক বহু প্রকার খাজনা ও আদায়ের হাত হইতে তাহারা সবেমাত্র মুক্তি পাইয়াছে। সর্বোপরি, এইরূপ কৃষি-কাঠামোতে টাকার বিনিময়ে বাজারে বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের পরিমাণ কম, আত্মভোগে (Self-Consumption) নিয়োগের অংশই বেশি। এইরূপ অবস্থায় চাষীর হাতে নগদ টাকার পরিমাণ কম, আর জিনিসপত্রের সাহায্যে কর আদায়ের (Taxes in kind) বাস্তব অসুবিধা অত্যন্ত বেশি। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে, কৃষকের ব্যবহার্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া এই উদ্‌বৃত্ত তুলিয়া লওয়া চলে। কিন্তু অর্ধাহারী ও অনাহারী কৃষক যতদূর সম্ভব কম উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া নিতান্ত দরকারী জিনিস ছাড়া অপর কিছু কেনে না। ধনী চাষী ও জোতদার শ্রেণীর লোকেরা—যাহাদের হাতে বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্ত কিছু পরিমাণ থাকে—তাহারা নিজেদের ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে পারে অথবা অন্য চাষী বা (রাষ্ট্র ছাড়া) অপর ব্যক্তির নিকট হইতে দরকারী জিনিসগুলি ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং, দেখা যায় যে,

যৌথ-খামার ছাড়া অন্যান্য উপায়গুলি কেন সফল হইবে না

[৫] ভারতেও এইরূপ দেখা যাইতেছে, যদিও কৃষি সংস্কার সম্পূর্ণ হয় নাই, cf—Food Enquiry Committee report.

ব্যক্তিগত চাষ প্রথার উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা (power of surplus generation) এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সেই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ করার ক্ষমতা (mobilisation)—উভয়ই বিশেষ সীমাবদ্ধ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে ব্যক্তিগত জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাষ (Individual subsistence farming) তুলিয়া দিয়া যৌথ খামার স্থাপন করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ। শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটাইয়া বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কৃষিকে শিল্পের স্তরে তুলিয়া উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইবে এবং উৎপাদনকারী সমবায়ী চাষীদের জীবনযাত্রার মান দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থির করা (কমান বা বাড়ান) সম্ভব হইবে। অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বাড়ান এবং উহা সংগ্রহ করার সুবিধা—সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে এই প্রয়োজনীয় কাজের জন্য যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা তাই অবশ্যম্ভাবী পূর্বসর্ত।

উদ্‌বৃত্তের নিয়োগ বিন্যাস—সমাজের মোট উৎপাদনের কত অংশ ভোগে এবং কত অংশ বিনিয়োগে খাটান হইবে অর্থাৎ ভোগের স্তর কোন্‌খানে স্থির করিয়া কি পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করিতে হইবে সে বিষয়ে নিদিষ্ট কোন নিয়ম নাই বলা চলে। উৎপাদনী শক্তির উন্নতির স্তর এবং তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজন উভয়ে মিলিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশটি ইহা স্থির করে। যদি উহা উন্নত ধরণের সমাজতান্ত্রিক দেশ হয় তবে ভোগের স্তর বেশি না কমাইলেও চলে, কিন্তু অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা হইলে দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনে ভোগের স্তর কমাইয়া বেশি উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি প্রয়োজন হইতে পারে। বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকিলে ভোগের অনুপাত বেশি থাকিবে, (উদ্‌বৃত্তের অনুপাত কম থাকিবে) ; আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকিলে ভোগের অনুপাত কম থাকিবে (উদ্‌বৃত্তের অনুপাত বেশি থাকিবে)।[৬]

উদ্‌বৃত্ত বিন্যাসের সাধারণ নীতি

সমাজতান্ত্রিক দেশে অগ্রগতির হার বাড়াইবার জন্য ভোগের স্তর খুবই নীচুতে রাখা দরকার, এমন কোন কথা নাই। ভোগের স্তরের সঙ্গে দেশের অধিবাসীদের উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী মনোভাব—উভয়ই যুক্ত আছে।

৬ ১৯৪১ সালে আক্রান্ত হইবার ঠিক দশবৎসর পূর্বে ১৯৩১ সালে ষ্ট্যালিন বলিতেছেন "We are 50-100 years behind the advanced countries. We have to traverse this distance in ten years. We shall either accomplish it or else we shall be crushed." *Stalin*. Works, vol 13.

ভোগের স্তর কমাইয়া মোট বিনিয়োগ বাড়ান চলে ঠিকই, কিন্তু শ্রমিক-পিছু উৎপাদন কমিয়া যাইতে পারে। তাই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-সাধন করিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণের উপযোগী এক নীতি গ্রহণ করা হয়।

দেশের অধিবাসীদের মনোবল উন্নত করিয়া, বৃহত্তর স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করিয়া, শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া, ভবিষ্যৎ উন্নততর সমাজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের কথা স্মরণ করাইয়া শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা (Productivity) বাড়ান হয়। সমাজের শ্রমিকের স্থান ও মর্যাদার পরিবর্তন হয়, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত মনোবল ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়; উৎপাদনশক্তি বাড়াইবার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হয় (যেমন সোভিয়েট রাশিয়ায় Stakhanovite আন্দোলন); সমাজের বিজ্ঞানীদের উপর নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের অবিরাম চাপ আসিতে থাকে। এইরূপেই সমাজতান্ত্রিক দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্র-কৌশলের উন্নতি হইতে থাকে, শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি পরস্পরকে চাপ দিয়া উভয়ের উদ্‌ঘূর্ণমান গতিবেগ (Upward Spiral) সৃষ্টি করে।

ভোগের স্তর না কমাইলেও চলে কারণ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই বাড়ে

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের সহিত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ, উহা সৃষ্টির পদ্ধতি এবং উহা নিয়োগের উদ্দেশ্য কোন দিকেই মিল নাই। এই পরিকল্পিত উদবৃত্তের পরিমাণ স্থির হয় সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া; উহার সৃষ্টি ও সংগ্রহের পদ্ধতি স্থির হয় এমন ভাবে যাহাতে সমাজের সকল ব্যক্তির উপর সমানভাবে ত্যাগ ও ভোগের অনুপাত

৭ "সঞ্চয় ও ভোগের সম্পর্কের বিষয়ে এই কথা মনে রাখা দরকার যে, এই দুই-এর উভয়কেই একসঙ্গে সর্বাধিক করার দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব......কারণ তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাহা ছাড়া, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল মাত্র সঞ্চয় বাড়ান বা কেবল মাত্র ভোগ বাড়ান, এইরূপ আংশিক দৃষ্টিতেও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইহাদের পারস্পরিক বিরোধ (Contradiction) এবং তাহাদের পরস্পর-প্রভাবশীলতা ও নির্ভরশীলতা এই উভয় দিকই বিচার করিয়া এবং দীর্ঘকালীন উন্নয়নের হিসাবে ইহারা সাধারণভাবে মিলিয়া যায় এই কথা মনে রাখিয়া এই সমস্যাকে উভয়ের সর্বোত্তম সংযোগের (Optimal combination) পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দরকার। উন্নয়নের গতিবেগ (Speed) সম্পর্কেও কাজের দুরূহ জটিলতা মনে রাখা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আগামী বছরের বা কয়েক বছরের মধ্যে সর্বাধিক সঞ্চয় করার প্রচেষ্টার দরকার নাই, কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে এমনভাবে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা দরকার যাহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া দ্রুততম উন্নয়নের বেগ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাইতে পারে।—**Resolution in the Fifteenth Congress of the C. P. S. U. (B).**

বণ্টিত হয়; এবং উহার নিয়োগ করা হয় সুদূর ভবিষ্যতে সমাজের জনশক্তি ও প্রাকৃতিক উপকরণের সর্বোত্তম (Optimal) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে।

শিল্পের উন্নতি বা কৃষির উন্নতি?—অপূর্ণোন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেক সময় এইরূপ প্রশ্ন তোলা হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন্ পথে সুরু হইবে—কৃষির উন্নতির মাধ্যমে অথবা শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে। এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, কারণ কৃষি ও শিল্পের উৎসের একযোগে উন্নতিই সামগ্রিক উন্নয়ন আনিতে পারে। শিল্পের উন্নতি কৃষির উন্নতি ঘটায়; কৃষির উন্নতিতে শিল্পের উন্নতি দ্রুততর হয়, এইরূপে একের উন্নতি পরের উন্নতিকে আগাইয়া তোলে। পরস্পর প্রভাবশীল বলিয়া ইহাদের সম্মিলিত উন্নতির গতিবেগ এত বেশি।

উভয়ের একযোগে উন্নতি

অপূর্ণোন্নত দেশের জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাষ ব্যবস্থা উন্নত করিতে হইলে কৃষিক্ষেত্রের ছোটখাট সংস্কারের সাহায্যে সম্ভব নয়[৮] ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। উন্নত সার, বীজ, কৃষি শিক্ষা, কম সুদে ঋণ প্রভৃতির সাহায্যে চাষীর প্রকৃত আয় একটু বাড়িলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ আবার তাহা কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া চাষীদের নিজেদের হাতে এইরূপ আয়বৃদ্ধির দরুণ খুব বেশি উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হয় না, যাহাতে মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে। এই সকল সংস্কারের ফলে উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি ও মূলধন-গঠন না হইলে, নিজস্ব উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি না হইলে, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোন নিজস্ব ভিত্তি গড়িয়া না উঠিলে—এই সকল সংস্কার প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষা দেওয়ার বা খয়রাতী সাহায্য করার সামিল হইয়া উঠে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার ও কৃষি বিজ্ঞানের সাহায্যে বিরাট ফার্মে উৎপাদন করা ছাড়া কৃষির কখনও উন্নতি হইতে পারে না। ইহার জন্য দরকার মূলধন, অপূর্ণোন্নত দেশের কৃষকের পক্ষে এইরূপ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এবং (যদি রাষ্ট্র ঋণ দেয় বা সাহায্য করে) তাহার ক্ষুদ্র জমি খণ্ডগুলিতে উহা প্রয়োগ করাও চলে না। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে কৃষিতে প্রভূত মূলধন প্রবেশ করিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাইয়াছিল। ছোট ছোট চাষীর হাত হইতে জমি বড় বড় ধনী চাষীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বড় বড় ধনতান্ত্রিক কৃষি-ফার্ম স্থাপিত হইয়াছিল।

কৃষির উন্নতির জন্য শিল্পের উন্নতি দরকার

৮ ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

কৃষির এই উন্নতিতে শিল্প সস্তায় কাঁচামাল ও (নিঃস্ব চাষীর দল হইতে) মজুর পাইয়া উন্নত হইয়াছে, শিল্পের ও সহরের প্রসারে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ ও পুঁজির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।[৯]

কিন্তু কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিতে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই সমাজতান্ত্রিক উন্নতি করিতে হইলে কৃষির উন্নতি সর্বাগ্রে দরকার। এই কথা সোভিয়েত পরিকল্পনাকারীগণ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।[১০]

অপূর্ণোন্নত দেশে কৃষিও শিল্পের উন্নতি তাই পরস্পর নির্ভরশীল ; একমাত্র শিল্পের উন্নতিই কৃষিকে যন্ত্রপাতি ও বাজার যোগাইতে পারে, কৃষির উন্নতির দরুণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা খাদ্য ও কাঁচামাল পাইতে পারে। সর্বোপরি শিল্পোন্নয়নের জন্য অপর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক পাইতে হইলে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার।[১১]

এই পরস্পর নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে অপূর্ণোন্নত দেশে প্রথমদিকে শিল্পে (এবং কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী যন্ত্রশিল্পে)

---

৯ এই ইতিহাস সকলেই জানেন, তবু কৃষির উন্নতির জন্য পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীরা উপদেশ দেন, তাহার কারণ অপূর্ণোন্নত দেশের (সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক) কোনরূপ উন্নয়নই তাঁহারা চাহেন না, তাঁহাদের উপনিবেশ করিয়াই রাখিতে চান। আমেরিকার Gray Report-এ বলা হইয়াছে, "The potentialities and problems of the undeveloped countries and the nature of our interest in their economic development indicate the character of development programmes that we should support......The main requirement, in most cases, is for development which will improve agricultural production. Development along these lines must be balanced with expanded facilities for industrial production, at the outset especially in light industries producing consumers' goods......The United states will have an increasing need for raw-materials, particularly minerals, as domestic resources are progressively exhausted." **Report to the President on Foreign Economic Policies P. 59.**

১০ "Such despoliation of human energies and labour as takes place in the small, individual peasant economy cannot last any longer. If a transition were to take place from this splinter economy to a socialized economy, productivity of labour could double and treble, human labour could be saved twofold and threefold both for agriculture and for human economy at large...Our commitment and our duty is to direct (all forces of technology) ......so that the most backward of production, agriculture......should be placed upon a new road, so that it should be transformed, and so that agriculture should be changed from a trade conducted irrationally, obsoletely into an activity based on science and the achievements of technology", *Lenin.*

১১ It is precisely...saving of labour that represents one of the main advantages of largescale farming—*Engles.* **' The Peasant Question in France and Germany.**

বিনিয়োগ বাড়ানই উন্নয়নের একমাত্র পন্থা। যে স্বল্প উদ্‌বৃত্ত বা মূলধন প্রথম দিকে রাষ্ট্রের হাতে থাকে তাহার সাহায্যে ছোটখাট কৃষি সংস্কারে লাভ নাই কারণ ছোট সংস্কারে কৃষির এত বেশি উন্নতি হইতে পারে না যাহাতে প্রচুর অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বসর্ত হিসাবে প্রথমে শিল্পে বিনিয়োগই সঙ্গত পন্থা। এই কারণেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে তাহারা ২৫ লক্ষ ট্রাক্টর এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে প্রায় ৫০ লক্ষ ট্রাক্টর তৈয়ারী করিয়াছিল।

ভোগ্য দ্রব্যের শিল্প (হাল্কা শিল্প) বা উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প (ভারী শিল্প)—অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টির পরে উহাকে কিরূপ শিল্পের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে হইবে এই সমস্যা প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিচারের উপর নির্ভর করে: প্রথমতঃ, ভোগের স্তর কোন্‌খানে রাখিয়া কি পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত রাখা উচিত, এবং দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা কালে বা ভবিষ্যতে দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার কতখানি বেশি করা উচিত।[১২]

নূতন স্থাপিত উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পগুলি যে যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে, তাহাদের পরবর্তী পরিকল্পনা কালে অলস রাখা যায় না, তাহাদের সাহায্যে নিশ্চয় উৎপাদন বাড়াইতে হয়। সেইজন্য পূর্বের পরিকল্পনা কালের তুলনায় পরবর্তী পরিকল্পনা কালে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হয়। যত বেশি উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ান হইবে, ততই দেশে বিনিয়োগ বাড়াইতে হইবে, এবং অগ্রগতির বেগ তত দ্রুত হইবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে করা যাউক যে, বর্তমান পরিকল্পনা কালে কোন দেশে তিনটি নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের উপযোগী বিনিয়োগ করা হইলে এই কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিল। পরবর্তী পরিকল্পনায় প্রথম হইতেই সেই কারখানাগুলিতে ইস্পাত উৎপাদন সুরু হইবে।

ভারী শিল্পে বিনিয়োগ বেশি হইলেই ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়িতে পারে কেন

---

১২ বর্ধিত পুনরুৎপাদন (expanded reproduction) বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মার্ক্স স্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির মূল তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন: The current gross product of Department I (producers' goods industries) has to exceed the current replacement demand for producers' goods on the part of Department I and of Department II (Consumers' goods industries).—Capital vol II Chap. 21. লেনিন এই সম্বন্ধে আরও সুন্দরভাবে বলিয়াছেন "in order to expand production....it is necessary to produce first the means of production, and this requires, consequently the expansion of that branch of social production which manufactures means of production."

সুতরাং সেই ইস্পাতের সাহায্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন বা যন্ত্রপাতির উৎপাদন পরবর্তী পরিকল্পনাতে করিতেই হইবে। পূর্বের ইস্পাত তৈয়ারীর কারখানাগুলিতে ইস্পাত তৈয়ারী হইবে, উহার সহিত নূতন কারখানা বা যন্ত্রপাতি উৎপাদন যুক্ত হইবে। ফলে মোট বিনিয়োগ বাড়াইতেই হইবে। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কারখানা স্থাপন করিলে তাহা হইতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইল এবং জনসাধারণের ভোগে তাহা ব্যয় হইয়া গেল। পরবর্তীকালে নিজস্ব প্রয়োজনেই বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবে, এরূপ কোন গতি সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ যত বেশি হইবে, সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বেগ তত দ্রুত, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্‌বৃত্তের যত অধিক অংশ নিযুক্ত হইবে, অগ্রগতির হার তত কম।[১৩]

পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রধান কাজই হইল এই অনুপাত স্থির করা। এই বিষয়ে ভুল করিলে, উৎপাদক শিল্পে অধিক বিনিয়োগ করিলে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কমিয়া যাইবে; অথবা ভোগ্য শিল্পে অধিক বিনিয়োগ করিলে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধনী দ্রব্য বা যন্ত্রপাতির অভাব দেখা দিবে।[১৪]

মূলধন-প্রগাঢ় বা শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি—(The choice between capital-intensive or labour-intensive techniques of production)

চাষী সরাইয়া মূলধন বাড়াও

অধিকাংশ অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ খুব বেশি থাকে। ফলে অনেকে বলেন, অপূর্ণোন্নত দেশের উৎপাদন পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় করা উচিত, মূলধন-প্রধান করার দরকার নাই।[১৫] প্রচ্ছন্ন বেকারদের কৃষি হইতে সরাইয়া লইয়া আসিয়া উৎপাদক-দ্রব্য উৎপাদনে

১৩ Maurice Doble : "Rates of Growth under the five year Plans", an article in his book 'On Economic Theory and Socialism'.

১৪ "The Economy of Hungary, 1950 to 1954", *United Nations*. Economic Bulletin for Europe (August 1955).

১৫ "The densely populated countries in process of development do not need tools and machines of the same degree of capital-intensity as those used in the advanced economies where labour is relatively scarce. Some of the equipment and hence also the techniques of production imported from more developed countries are likely to be highly capital-intensive and therefore not well adapted to countries where capital is scarce and labour abundant." —*R. Nurkse*, **Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, P. 45.**

শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে নিয়োগ করিতে পারিলে মূলধন-গঠন দ্রুত হইতে পারে, এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে কয়েকটি অসুবিধার কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। (ক) যে শ্রমিককে গ্রামের "প্রচ্ছন্ন বেকারি"র স্তর হইতে সরাইয়া মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের কার্যে খাটান হইবে তাহাকে কিছু পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য দিতেই হইবে, তাহা না হইলে অন্ততঃ নিজের জীবনধারণের উপযোগী মূল্য সে সৃষ্টি করিতে পারিবে না। যদি এই ব্যবস্থা করিতে পারা না যায় তাহা হইলে গ্রাম হইতে সরানোর ফল হইল তাহাকে খয়রাতী সাহায্য করার মত। ইহাতে বিনিয়োগে নিযুক্ত হইবার উপযোগী অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত কমিয়া যাইবে, উহা বাড়িবে না। (খ) একজন "প্রচ্ছন্ন" বেকারকে গ্রাম হইতে শিল্পকেন্দ্রে সরাইয়া আনিতে হইলে তাহার জন্য বাসস্থান, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ সকল কিছুই নূতন করিয়া কিছু কিছু তৈয়ারী করিতে হইবে। এই হিসাব যোগ করিলে উৎপন্ন দ্রব্য-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ কিছুতেই কম হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। (গ) এই সকল নূতন শ্রমিকদের পুরাণো সমাজের চল্‌তি হারেই মজুরী দিতে হইবে, অর্থাৎ একজন শ্রমিক মূলধন-প্রগাঢ় শিল্পে যেরূপ মজুরি পায়, প্রায় তাহার সমান মজুরিই সে পাইবে। কিন্তু শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে তাহাদের মাথা-পিছু উৎপাদন-ক্ষমতা কম, (Productivity Per Labourer) ইহা মনে রাখা দরকার। (ঘ) গ্রামে থাকাকালীন সে যে ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করিত তাহা এখন গ্রামের লোকজনদের ভোগে লাগিবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অন্ততঃ সম্পূর্ণ পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতি উন্নয়নের হার কম

অর্থাৎ শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি গ্রহণ করিলে এই সকল বিভিন্ন কারণে শ্রমিকদের ভোগ্যদ্রব্য জোটাইবার জন্য ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পেই উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পের তুলনায় অধিক প্রসার ঘটাইতে হয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উন্নয়নের গতি কমিয়া যায়, ক্রমবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।[১৬]

১৬ ...the choice between more or less capital-intensive forms of investment has nothing to do with existing factor-proportions......It depends not on the existing ratio of available lavour to capital (treated as a stock), but on precisely the same considerations as those which determine the choice between a high and a low rate of investment......namely the importance to be attatched to raising consumption in the immediate future compared with the potential

সুতরাং, পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি অথবা মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতি গ্রহণ করিবে, তাহা স্থির করার সময়ে কতকগুলি বিষয় মনে রাখিতে হইবে (ক) শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি গ্রহণ করিলে ক্রমবৃদ্ধির হার কম। (খ) বর্তমানে উৎপাদন সংগঠনে তুলনামূলকভাবে শ্রমিক বেশি, কিন্তু কিছুদিন পরে উৎপাদন সংগঠন বদলাইলে দেশে বিভিন্ন উপাদানের যোগানের পারস্পরিক দুষ্প্রাপ্যতা বদলাইয়া যাইতে পারে। (গ) ক্রমবৃদ্ধি নির্ভর করে, প্রধানতঃ, উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার উপর। প্রায় সকল উৎপাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই (ট্রাক্টর, মেশিন টুল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) উৎপাদন পদ্ধতি প্রধানতঃ মূলধন-প্রগাঢ়। তাই প্রথম যুগে পদ্ধতি নির্বাচন (choice of technique) করার স্বাধীনতা কতদূর থাকিতে পারে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। উৎপাদন করা হইবে কি হইবে না ইহা ছাড়া অপর কিছু পছন্দের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। পূর্ণোন্নত দেশগুলির তুলনায় ঐতিহাসিক দিক হইতে অপূর্ণোন্নত দেশগুলির সুযোগ এ দিক হইতে বেশি, তাহারা পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রকৌশলগত আবিষ্কারের ভাণ্ডার একত্র সম্মুখে পাইতেছে, তাহারা এই সুযোগ হারাইলে ইতিহাসের শিক্ষা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলি হইতেই এইরূপ 'ধীরে চলার' (*go* slow) প্রস্তাব আসিতেছে এবং যে সকল অপূর্ণোন্নত দেশে পূর্ণসমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেখানকার ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থনকারী পণ্ডিতেরা তাহা সমর্থন করিতেছেন।

কমিশন কোনটি গ্রহণ করিবে?

---

increase of consumption in the more distant future which a particular rate of investment and form of investment will make possible. In other words, the same grounds which would justify also a high degree of capital-intensity in the choice of investment forms ; and viceversa.—*Maurice Dobb*—**A note on the so-called degree of Capital Intensity of Investment in Underdeveloped countries in his—'On Economic theory & Socialism' P. 149.**

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধা-পরিকল্পিত মিশ্র অর্থ নৈতিক উন্নয়ন

Semi-planned mixed economic development

মিশ্র অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা (The concept of mixed economy)

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে অনেক সময় পূর্ণ ধনতন্ত্র বা পূর্ণ সমাজতন্ত্র কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় না, এক ধরণের মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে। দেখা যায় যে, দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে কিছু কিছু উৎপাদনের উপায় (Means of Production) রাষ্ট্রীয় মালিকানায়, বাকী উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের (পুঁজিপতি , সামন্তপ্রভু ও বনিকী পুঁজিপতির) হাতে। এইরূপ দেশে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উচ্ছেদ করিয়া সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়া ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। কৃষির একটি বিরাট অংশে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক ও পদ্ধতি চলিতে থাকে, এই উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ অর্থ-নৈতিক নিয়মাবলীর (Economic Laws corresponding to feudal mode of Production) কার্যকারিতা দেখা যায়, কৃষির ও শিল্পের একাংশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ নিয়মাবলী প্রচলিত থাকে, শিল্পের অপরাংশে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতির মৌলিক নিয়মগুলি কার্যকরী হওয়ার চেষ্টা করে। এই তিন ধরণের নিয়মাবলী পাশাপাশি সহাবস্থান করিতে থাকে, এবং (এই কাঠামোর সমর্থকেরা দাবী করেন যে) সেই সহাবস্থানের মধ্য দিয়াই অর্থ নৈতিক উন্নয়ন চলিতে থাকে। দেশের "সমাজতান্ত্রিক" অংশকে পরিকল্পিত ক্ষেত্র (Planned sector) এবং অপর অংশকে অপরিকল্পিত ক্ষেত্র (Unplanred sector) বলা হয়।

পরস্পরবিরোধী তিন ধরণের নিয়মের "শান্তিপূর্ণ" সহাবস্থান

এইরূপ মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে বহু প্রকার চলতি ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন যে পূর্ণধনতন্ত্র বা পূর্ণ সমাজতন্ত্র উভয়ের দোষ ত্রুটি ও আতিশয্য (Excesses or Extremes) দূর করিয়া ইহা এক নূতন ধরণের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (New Economic System)। কেহ কেহ বলেন যে

রাজনৈতিক দিক হইতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এইরূপ এক অর্থনৈতিক মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভাল। আবার অনেকে ইহাকে অহিংসা ও মিলনের নীতির বাস্তব প্রয়োগ বলিয়া মনে করেন। ইহারা সকলেই কিন্তু এইরূপ মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Social and Economic System) বলিয়া মনে করেন। ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে নিয়মাবলীর পূর্ণ বিশ্লেষণ না করিলেই একমাত্র সেইরূপ সাময়িক কাঠামোকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বিপ্লব আনয়নকারী শ্রেণী ও শক্তিগুলির দুর্বলতার জন্যই ইহা এইরূপ নির্দিষ্টতা ও স্থায়িত্বের মনোভাব লইয়া আসে। সর্বোপরি সাময়িক ভাবে এই তিন প্রকার (সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক) নিয়মের কার্য-কারিতার মধ্যে যতদুর সম্ভব সামঞ্জস্য চলিতে থাকে এবং আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির পূর্ণ কার্যকারিতা তখনও সুরু হয় নাই বলিয়াই এইরূপ "সহাবস্থান" চলিতে পারে। ক্রমে যখন নিয়মগুলির পরস্পর-বিরোধিতা বাড়িতে থাকে, তখন উৎপাদন-সম্পর্কগুলির পরিমাণগত পরিবর্তনের (Quantitative change) বেগ দ্রুততর হইয়া উঠে এবং এই কাঠামোর সাময়িকতা ও অস্থায়িত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। ক্রমে এই সকল দেশ একচেটিয়া ধনতন্ত্রে বা পূর্ণ সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয়, পরস্পর-বিরোধিতার মধ্য হইতে এক ধরণের নিয়মাবলী নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে।[১]

ইহা কাঠামো, কিন্তু একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা নয়

কেন একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া ইহা প্রতিভাত হয়, কিন্তু ইহা অস্থায়ী

কতদিন পরে এইরূপ উত্তরণ ঘটিবে, তাহা অনেক ধরণের শক্তির উপর নির্ভর করে। মনে রাখা দরকার, উৎপাদন শক্তিগুলির উন্নতি ও প্রসার হইতে যত দেরি হইবে উত্তরণের পূর্বের অবস্থা তত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকিবে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ভয়ে পরস্পর-বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা পরস্পরকে মানাইয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। ধনতান্ত্রিক বিপ্লব এই সকল

[১] যতদিন তাহা না হয় ততদিন অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ দ্রুত হইতে পারে না, ইহার কারণ পরে আলোচিত হইতেছে।

দেশে কিছুতেই আর সামন্তবিরোধী সমাজ-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিবে না, কারণ যে কোন শ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক বিপ্লবই (সামরিক Coup-de-etat নয়) আজকাল সমাজের সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। তাই, ইহাদের পরস্পর-বিরোধিতা ও সামঞ্জস্য একই সঙ্গে চলিতে থাকিবে। উৎপাদক উপকরণগুলির বা উৎপাদন শক্তির উন্নতির গতিবেগ এবং সামাজিক বা উৎপাদক সম্পর্কগুলির নিজস্ব পরিবর্তনের গতিবেগ উভয়ের দ্বারা নির্ধারিত হইবে কতকাল ধরিয়া এইরূপ "মিশ্র" কাঠামো বজায় থাকিবে।[২]

কতকাল পরে এইরূপ রূপান্তর আসিবে

কোন্ দিকে রূপান্তর আসিবে, তাহাও অনেক ধরণের শক্তির উপর নির্ভরশীল, এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাধারণ রূপে (general manner) তাহাদের আলোচনা করা চলিতে পারে। এইরূপ "মিশ্র" কাঠামোতে রাষ্ট্রের রূপও মিশ্রিত থাকে। কোন্ শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর সম্মুখের বাধানিষেধ ইহা অপসারণ করিতেছে এবং উহার প্রসার ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিতেছে, তাহা অনেক সময় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও অল্প হইলেও কিছুটা আধা-সমাজতান্ত্রিক—এই সকল স্বার্থের সংমিশ্রণে রাষ্ট্র গঠিত থাকে। কখনও কখনও কোন বিশেষ শ্রেণী সরকারী নীতি ও আইন-কানুনের সাহায্যে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় (নিজ শ্রেণী-স্বার্থের অনুকূল ও অপর শ্রেণী-স্বার্থের হানিকর) কিছু সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারে, তাহাতে অপর শ্রেণী সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ নিজের হাতে লইয়া আসিবার প্রচেষ্টা বাড়াইয়া দেয়। এই প্রচেষ্টা কোন বিপ্লবের আকার গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া এবং দেশে পার্লামেন্টারী রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত থাকে বলিয়া (যেখানে ভোটে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় শাসন চলে) প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লইয়া কাড়াকাড়ি ও চক্রান্ত সৃষ্টি হইতে থাকে। এই কারণে এইরূপ দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চক্রান্তকারী দল ও উপদল দেখা দিতে থাকে এবং দেশের অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে বহুমুখিতা, অনির্দিষ্টতা এবং দোদুল্যমানতা (Multi-fronged, uncertain and vaccilating) আসিয়া পড়ে। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি অচঞ্চল ভাবে গভীর বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় নীতি ও উহাদের কার্যকারিতার রূপ কেমন দাঁড়ায়, ও কেন

[২] ইহাদের গতিবেগ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

করা ও উহাকে কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব হয় না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধা পাইয়া উহার গতিবেগ হ্রাস পায়। রাষ্ট্রের মধ্যে যে নীতি গৃহীত হইয়াছে দেশে তাহা কার্যকরী করিয়া তোলা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, কারণ দেশের মধ্যে, দলের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যেই উহার বিরোধিতা চলিতে থাকে। যদি সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ শক্তিশালী হইয়া না উঠে এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের সাহায্যে দেশের জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণ না করিতে পারে সেইরূপ অবস্থায় এই দেশে সামরিক অভ্যুত্থান দেখা দিবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি শক্তিশালী থাকিলেও উহার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বাড়ে বটে, কিন্তু বর্তমানের শক্তি বিন্যাস পাল্টাইলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিপ্লবের ভয়ে সেই অভ্যুত্থান সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

এইরূপ রাষ্ট্রের পরিবর্তনের রীতি-নীতি

যখন পরস্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না, অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক ধরণের জরা ও অচলাবস্থা দেখা দেয়, কোন শ্রেণীই যখন অপর কোন শ্রেণীকে শাসনকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যবর্তী শক্তিকেন্দ্র হইতে সরাইতে পারে না, তখন উহারই মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী সামরিক বাহিনীর সাহায্যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাইয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রকে দখল করে। মিশ্র অর্থনীতির অন্তর্নিহিত গতির নিয়ম কানুন এই শিক্ষা দেয় যে একই স্থানে পা-দাপাদাপি করিয়া বেশি দিন চলে না, ইহার নিজস্ব গতিবেগই ইহাতে পরিবর্তন আনিবে। ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় সামরিক নেতার অভ্যুত্থান সফল হইলে দেশটি কিছুদূর পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের গতিবেগ লাভ করে। ইহা পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইতে পারে না, কারণ একচেটিয়া দেশী ও বিদেশী ধনতন্ত্রের আঁওতায় উহাকে উপনিবেশ স্থানীয় হইয়া থাকিতে হয়। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় সামরিক নেতার অভ্যুত্থান সফল হইলে সেই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা পিছাইয়া যায়, নিজস্ব ধনতান্ত্রিক শক্তির বা সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাফল্য না ঘটা পর্যন্ত ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগ সৃষ্টি হইতে পারে না।

কোন দেশে এইরূপ "মিশ্র" অর্থনীতি গড়িয়া উঠার ঐতিহাসিক দুইটি কারণ আছে, আপনা আপনি আকাশ হইতে ইহা নামিয়া আসে না অথবা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা রাজনৈতিক দর্শনের অভিব্যক্তি ইহা নয়। প্রথমতঃ, এইরূপ দেশের ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে নাই,

উপর হইতে চাপিয়া বসিয়াছে, দেশী সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদ—এই উভয় দিকের চাপে বামনাকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, পদে পদে সামন্ততন্ত্রের সহিত রফা করিয়া রাজনৈতিক পরাধীনতা হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ দেশের সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়াছে এবং জাতীয় পরাধীনতা হইতে নিজেদের মুক্ত করায় জনচিত্তে তাহারা স্থান করিয়া লইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে উপেক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না অথচ সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করার মত তেজ নাই (বামনাকৃতি হওয়ার জন্য) এবং ইচ্ছাও নাই (সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভয়ের ফলে)। এইরূপ অবস্থাবিন্যাসের মধ্যেই "মিশ্র" কাঠামো গড়িয়া উঠে।[৩] অনেক সময় দেশী বা বিদেশী ডিক্টেটরী দূর করিবার জন্য সকল শ্রেণীকে মিলাইয়া এক বৃহত্তর যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিতে হয়। এই যুক্ত ফ্রন্ট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবার পূর্বে জনসাধারণের বিপুল সমর্থন লাভ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাইলে উহা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট কোন নীতি গ্রহণ করিতে পারে না। ইহারাই মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর ঐতিহাসিক ভিত্তি।

ঐতিহাসিক দুইটি কারণে ইহার উদ্ভব: বামনাকৃতি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভয়

মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ
(Sectors in a mixed economy)

"মিশ্র" অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, এইরূপ অবস্থায় দেশের মোট অর্থনৈতিক কাঠামোর একাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত এবং অপরাংশ ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের আয়ত্তাধীন থাকে। প্রথম অংশকে বলে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র বা সরকারীক্ষেত্র (Public Sector); দ্বিতীয় অংশকে বলে ব্যক্তিক্ষেত্র বা বেসরকারীক্ষেত্র (Private Sector)। কিন্তু এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন একটি বিশেষ নামাকরণ করা যায় না। সকল দেশেই, এমন কি, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও মোট অর্থনীতির একাংশ (ছোট হউক বা বড় হউক) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়, কেহ অন্ততঃ ভুল করিয়াও ইংলণ্ড বা আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মিশ্র

[৩] সমাজ বিজ্ঞানী বা ধন বিজ্ঞানীদের নিকট মিশ্র কাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এক সঙ্গে তিন প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মাবলী ও তাহাদের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত অল্প স্থান ও কালের দর্পণে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠে।

অর্থনীতি বলিয়া মনে করেন না। তাহা ছাড়া কাহার মালিকানায় কোন্ কোন্ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান আছে, এইরূপ বিভাগ সমাজবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কোনো প্রতিষ্ঠান বেসরকারী মালিকানায় ছিল, উহা রাষ্ট্রের মালিকানায় চলিয়া আসিল, পরিচালকমণ্ডলী স্থির রহিল, শ্রমিক-পরিচালক সম্পর্ক স্থির রহিল, মুনাফা-ভিত্তিক উৎপাদন ও বিক্রয় সংগঠন স্থির রহিল, অথচ সমাজতন্ত্রের প্রসার হইল, এরূপ কথা ভাবা যায় না। উপরে খোলস পাল্টাইলে সাপ অপর কোন জন্তুতে যেরূপ রূপান্তরিত হয় না, নিছক কাগজে পত্রে মালিকানাস্বত্ব অনুযায়ী ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের প্রসার হইতেছে এমন কথা বলা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক নহে। মালিকানাস্বত্বের পরিবর্তন নিশ্চয় গুরুতর বিষয়, কিন্তু যদি নিছক মুনাফা করার জন্য শ্রমিকদের অসহযোগিতায় ধনতন্ত্রের নিয়মাবলী মানিয়া উৎপাদন হইতে থাকে তবে উহাকে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র (State Capitalism) বলাই ভাল। শ্রমিকেরা সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা না করিলে, নিজেরা নিজ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি, সংগ্রহ ও উহার নিয়োগের উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত না করিলে, সর্বোপরি যে রাষ্ট্র সেই উদ্বৃত্ত তুলিয়া লইয়া অন্যত্র নিয়োগ করিবে সেই রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ বা শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শের একাধিপত্য না থাকিলে তাহাকে কতদূর সমাজতন্ত্র বলা চলে তাহা বিচার করার প্রয়োজন আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো বলিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন মৌলিক নিয়মগুলি ও গতিপদ্ধতি (Fundamental laws and motions of different economic systems) পাশাপাশি চলিতেছে, অন্ততঃ সেইরূপ মনে হইতেছে, অথবা চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাই বুঝিব।

মিশ্র অর্থনীতির বাজারে চলিত ব্যাখ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ

এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে অপূর্ণোন্নত "মিশ্র" অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তলাইয়া দেখা দরকার। সাধারণতঃ, এই সকল দেশের ব্যক্তিক্ষেত্র বা বেসরকারী-ক্ষেত্র আকারে ও গুরুত্বে রাষ্ট্রীয় বা সরকারীক্ষেত্রের তুলনায় বড়। ব্যক্তিক্ষেত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল (ক) (শ্রম উপকরণের নিয়োগ এবং মোট উৎপাদনের দিক হইতে) সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত কৃষিকার্য (Feudal

ব্যক্তিক্ষেত্র কাহাদের লইয়া গঠিত

agricultural sector) বা জীবন ধারণের স্তরোপযোগী কৃষিকার্য (Subsistence farming)। এই অংশ ছাড়া বৃহৎ মাত্রায় চাষ এবং বাগিচার (Plantations) অংশ আছে ; ইহারা মূলতঃ ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করে, অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে একাংশ বিদেশী মূলধনের অধীন, সেই অংশ হইতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। (খ) কৃষিকার্যের পরে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে বলিয়া ধরা হয়। এই অংশের উৎপাদন প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মাধীন; সাধারণতঃ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে উৎপাদন আবদ্ধ থাকে, যন্ত্রপাতি বা শক্তি ব্যবহৃত হয় না, বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচগুলি লাভ করিতে পারে না, উৎপাদনের পরিমাণ কম বলিয়া কম উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় এবং নিজস্ব মূলধন-সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত বর্ধিত হারে মূলধন নিয়োগ, উৎপাদনের পরিমাণ ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইয়া চলা সম্ভব হয় না। (গ) বৃহৎ শিল্পের ও খনি শিল্পের মধ্যে একাংশ বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার আয়ত্তাধীন, কিন্তু তাহারা দেশী বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করে না, তাহাদের উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল রপ্তানি করা। ইহাদের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত দেশের লোকেরা খুব কমই পায়, সস্তা কাঁচামাল, সস্তা মজুরি, সস্তা পরিবহন ব্যয় প্রভৃতির সুবিধা পাইবার জন্য উহারা বিদেশ হইতে আসিয়া শিল্প স্থাপন করিয়াছে মাত্র। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অপরাংশ দেশী পুঁজিপতিদের দ্বারা স্থাপিত, ইহারা ধনতান্ত্রিক নিয়মাবলীর অধীন। (ঘ) দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় ও বন্টনের সূত্রগুলি (Sources of trade and distribution), আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের সূত্রগুলি এবং দেশের পরিবহন ব্যবস্থা—এই সকল কাজে দেশের মূলধনের প্রচুর অংশ নিযুক্ত থাকে, শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে উহা বণিকী পুঁজিতে আবদ্ধ থাকে। (ঙ) দেশে ঋণ লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রগুলির (Sources of credit and trading in money) মধ্যে একাংশ বিদেশী মূলধন ও পরিচালনায়, ফলে তাহাদের উদ্বৃত্ত বিদেশে চলিয়া যায়, দেশী পুঁজিপতিদের আওতায় সৃষ্ট উদ্বৃত্ত দেশের মধ্যেই থাকে।

এবং তাহাদের উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা কিরূপ

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বা সরকারীক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করিলেও উহার মধ্যে কয়েক ধরণের উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, কয়েকটি শিল্প আছে যাহারা বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী নয় এরূপ বিষয় উৎপাদন

করে, যেমন স্কুল কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্র হইতে সাধারণতঃ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও মূলধন-গঠন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি শিল্প যেমন গৃহনির্মাণ, পথঘাট নির্মাণ প্রভৃতি, যাহাদের দ্বারা পরোক্ষে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি বা মূলধন-গঠন দ্রুততর হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, বড় শিল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি যাহারা সরাসরি মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। ইহারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের মালিকানায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে ও দ্রুত মূলধন-গঠনের ভিত্তি। চতুর্থতঃ, বণিকী পুঁজির কার্যক্ষেত্রে, আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বা দেশের আভ্যন্তরীণ বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অংশ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকেও উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ করা দরকার

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে এইরূপে শ্রেণী বিভক্ত করিতে পারিলে খুবই ভাল হয় কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ দ্রুততর করার জন্য বিভিন্ন অংশের উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা জানা দরকার। শুধু তাহাই নহে, উদ্বৃত্ত সৃষ্টির পদ্ধতি (Mode of generation) সেই উদ্বৃত্তের নিয়োগ বিন্যাস (Allocation) এবং উদ্বৃত্তের ব্যবহার (utilisation) এই সকল মিলিয়াই কোনক্ষেত্রে মালিকানা ও পরিচালনার অর্থনৈতিক প্রকাশ (economic expression of ownership & managerial rights) ঘটে। সর্বোপরি, কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (System) ভাল কি মন্দ তাহা জানিতে হইলে দেখা দরকার উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পৃথকভাবে ও একত্রে মিলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধিকে কতখানি বাড়াইতে পারে। অর্থাৎ দেশে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সৃষ্টি, উহা সংগ্রহ করা এবং উহার বিজ্ঞানসম্মত সুযৌক্তিক নিয়োগ—এই ব্যবস্থার মধ্যে কতদূর সুসম্পন্ন হয়। এই কথা মনে রাখিয়াই "মিশ্র" ব্যবস্থার সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও নিয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম দেখা যায় এবং কেমন ভাবে তাহাদের পরস্পর-বিরোধিতার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়, তাহা আলোচনা করা দরকার।

কেন এই শ্রেণীবিভাগ দরকার : ব্যবস্থার যোগ্যতা বিচার

বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা
(Capacity of different sectors to generate surplus)

এই সকল দিক বিচার করিলে দেখা যায় যে, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো উহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য করে এমন বলা চলে না। জীবনধারণের উপযোগী কৃষিকার্য (Subsistence farming) হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে না এবং যৌথ খামার ব্যবস্থা ছাড়া অথবা ধনতন্ত্রের বিকাশ ছাড়া (Unfinished Agrarian revolution) কৃষির দ্রুত উন্নয়ন ঘটিলে সফল হইতে পারে না। কৃষির যে অংশ বৃহৎ মাত্রায় চাষ করে বা বাগিচাতে উৎপাদন করে তাহাদের উদ্বৃত্ত-সৃষ্টির ক্ষমতা বেশি ঠিকই। কিন্তু বড় বড় ফার্ম যাহাদের আছে, তাহারাও জমি আর বাড়াইতে চাহে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শক্তির চাপে রাষ্ট্র জমি মালিকানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। তাহারা যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে, সেই উদ্বৃত্ত পুনরায় জমিতে বিনিয়োগ হইয়া কৃষির উৎপাদনী-শক্তিকে বাড়াইয়া তোলে না। সামন্ততান্ত্রিক অতি-ভোগে (Excess consumption) নিযুক্ত হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকায় উহা মহাজনী বা বণিকী পুঁজিতে পরিণত হয় এবং মনে রাখা দরকার অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ পুঁজির কোন অভাব সাধারণতঃ থাকে না। বাগিচাতে উৎপাদনের একাংশে বৈদেশিক মালিকদের কর্তৃত্ব থাকিলে সেই অংশের মালিকেরা উদ্বৃত্ত নিজেদের "মাতৃভূমিতে" পাঠাইয়া দেয়। দেশী মালিকেরা উদ্বৃত্তের সাহায্যে ভারী কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে চাহে না, কারণ সস্তা শ্রমিক থাকায় তাহারা চাষে মূলধনের অধিক বিনিয়োগ বিশেষ লাভ-জনক নয় বলিয়া মনে করে। (দ্রব্যের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে) কেহ যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চাহিলে দেশের মূলধন, প্রধানতঃ বিদেশে চলিয়া যায়, কারণ অপূর্ণোন্নত দেশে এইরূপ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী কলকারখানা থাকে না।

ছোট চাষে উদ্বৃত্ত নাই

বৃহৎ চাষ ও বাগিচা

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা নিতান্তই কম, শ্রম ও মূলধন কম নিয়োগ করিয়া অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে না। উপরন্তু, এই সকল শিল্প

কাঁচামাল, ঋণ ও বিক্রয় সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে মহাজনী-পুঁজিপতি বা শিল্প-পুঁজিপতিদের নিকট এমনভাবে শোষিত হয় যে কোন উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না।[৪]

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা নাই

যদি দেশের পরিকল্পনায় এরূপ বলা হয় যে, বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগী দ্রব্য (Cempotitive goods) উৎপাদন না করিয়া ইহারা পরিপূরক দ্রব্য (Complementary goods) উৎপাদন করিবে, তাহা হইলে তাহারা আরও অধিক হারে শোষিত হইতে থাকে এবং সমাজের অপূর্ণোন্নতি বৃদ্ধি করে।

সর্বাধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা হইল বৃহৎযন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিয়মাবলী প্রধানতঃ ধনতান্ত্রিক, এবং এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির প্রয়োজন, ও তাই, পরিমাণও বেশি। কিন্তু এই ক্ষেত্রের মালিকানার প্রধানতঃ দুইটি অংশ, দেশী ও বিদেশী। দেশী পুঁজিপতিরা প্রায় প্রথম হইতেই একচেটিয়া রূপের, সুতরাং তাহাদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত দ্বারা তাহারা সেই শিল্পের উৎপাদন বাড়াইতে চাহে না। ফলে তাহাদের নিজস্ব তাগিদে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে নিজেদের উদ্বৃত্ত তাহারা নিয়োগ করে না।[৫]

বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া দরকার। প্রথম ভাগে সেই সকল শিল্প যাহারা আভ্যন্তরীণ

বিদেশী মালিকানার শিল্পগুলি দুইপ্রকার

বাজারে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেশী শিল্পের মতই অবস্থা দেখা দেয়, উদ্বৃত্তের কিছু অংশ বিদেশে যায়, প্রচুর মাহিনা দিয়া দেশী বা বিদেশী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। তাই দেশী মালিকানার শিল্পের তুলনায় ইহাদের উদ্বৃত্ত আরও কম পরিমাণে বিনিয়োগ হয়। কিন্তু এইরূপ শিল্পের পরিমাণ কম।[৬]

দ্বিতীয়ভাগে, সেই সকল শিল্প যাহারা প্রধানতঃ রপ্তানীর জন্যই উৎপাদন করে। অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে বিদেশী মালিকানায় স্থাপিত অধিকাংশ শিল্পগুলিই

---

[৪]জাপানের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের শোষণ দ্বারা বৃহৎ শিল্পে মূলধন গঠনের এই পদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

[৫]পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

[৬] "Typical manufacturing Industries working chiefly for the domestic market do not appear to attract foreign capital." —*League of Nations, Industrialization and Foreign Trade.* (1945) P-66.

এইরূপ। এই শিল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি বিষয় দেখা যায়। (ক) এই সকল প্রতিষ্ঠান শিল্প সুরু করার সময়ে অত্যাচার বা সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও রাজাদের সহিত চুক্তি করিয়া, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মালিকানা স্থাপন করিয়াছে, বিশেষ কোন দাম দিতে হয় নাই, সুতরাং কোন মুলধনই প্রায় বাহির হইতে উপনিবেশে আনিতে হয় নাই। (খ) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটিয়াছে মুনাফা খাটাইয়া, নিজের মাতৃভূমি হইতে উপনিবেশে মুলধন পাঠান খুব কমই হইয়াছে।[৭]

বিদেশী শিল্পের উদ্বৃত্ত কোথায় যায়

যে সকল যন্ত্রপাতির দরকার হইয়াছে, তাহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা ও বিদেশী শেয়ার ক্রেতাদের ডিভিডেণ্ড বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অপূর্ণোন্নত দেশের উন্নয়ন ঘটাইতে পারে নাই। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিগত মালিকানার

---

[৭] ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার কথা লিখিতে গিয়া স্যার আর্থার সল্টার লিখিতেছেন,— "it was only in an earlier period, which terminated soon after 1870, that the resources for foreign investment came from an execess of current exports over imports. In the whole period from 1870—1918, when total foreign investment increased from about £ 1000 million to nearly £ 4000 million the total new investments made were only about 40% of the income from past investments during the same period."—*Foreign Investment* (P. 11). তাহার পুর্বেই ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাই বিদেশী বিনিয়োগ নামে এদেশে আনিয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া বিদেশী সম্পত্তির ("পবিত্র সম্পত্তির অধিকার" বা sacred property rights) রক্ষার "দাবী" বিবেচনা করা দরকার। বিদেশী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ এবং সেই সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্নও এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা দরকার। ভারত সরকারের কার্যকলাপের একটি নমুনা দেওয়া চলে। স্বাধীনতার পর মহীশূরে কোলার স্বর্ণখনি যখন জাতীয়করণ করা হইল তখন মহীশূর রাজ্য সরকার ৮৭·৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজে চাপ দিয়া ১৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিল। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনসভায় দুঃখ করিয়া বলিলেন: "The goverment of India has gone to the extent of stating that if it came to that, they would pay the difference between the original sum of Rs. 87-8 lakhs and the sum of Rs. 164 lakhs to the state governent as a loan" (The Hindu, Oct 17, 1956) Quoted in "*Second Five year Plan, A critique*" by Bhupesh Gupta M. P.

কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বর্তমানেও তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে আসিতেছে না। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ দেশী কর্মচারী থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের মাহিনার বড় অংশ বিদেশী দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারের মধ্য দিয়া বিদেশে চলিয়া যায়। দেশী শ্রমিকের মজুরির হার খুবই কম এবং যেখানে উহা বেশি সেখানে অধিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করা হয়, সুতরাং কোম্পানীর আয়ের খুব কম অংশই মজুরীর রূপে দেশের লোকের হাতে পৌছায়।[৮] যতটুকু পৌছায় তাহাও গরীব মজুরদের হাতে যায় চলিয়া ভোগে ব্যয় হয়, দেশের উন্নয়নমূলক উদ্বৃত্তে (Developmental surplus) পরিণত হয় না। একমাত্র করের সাহায্যে কিছুটা উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে, অবশ্য হিসাবের পদ্ধতি ও তথ্য এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাহাতে করের পরিমাণ খুব কম হইয়া পড়ে।

বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্যতম হইল বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সূত্রগুলি। বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রগুলি প্রধানতঃ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিদের হাতে, কারণ জাহাজ নির্মাণের উপযোগী প্রভূত মূলধন, দক্ষতা আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সংযোগস্থান ও পরিচিতির সূত্রসমূহ অপূর্ণোন্নত দেশের বণিকদের হাতে নাই। তাই বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত উদ্বৃত্তের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যায় (বন্দর কর্তৃপক্ষ যাহা পায় তাহা ব্যতীত)। আভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি দেশী বণিকী পুঁজিপতিদের হাতে, এবং এই ক্ষেত্র হইতে প্রভূত মুনাফা তাহাদের হাতে সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত শিল্পে বিনিয়োগ হয় না, কারণ ব্যবসাতে যে হারে মুনাফা আসে, শিল্পে সেই হারে মুনাফা আসে না এবং আসিলেও ঝুঁকি খুবই বেশি।

বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত বিদেশে চলিয়া যায়

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে উদ্বৃত্ত শিল্পে নিযুক্ত হয় না

---

[৮] In Venezuela, petroleum accounts for over 90 percent of all exports (and for a large part of total national product), but the oil industry employs only some 2 percent of Venezuela's labour force. *Nurkse—Problems*, P. 23. In the middle East, all of 0·34 percent of the population are engaged in oil industry while less than 5 percent of the oil revenues are paid out as wages.—*United Nations, Review of Economic conditions in the Middle East* (1951). P. 63.]

* রাষ্ট্রের পক্ষে বিক্ষিপ্ত এই সকল উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করাও খুবই অসুবিধাজনক এবং এই সূত্রগুলি বেসরকারী মালিকানায় রাখিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা কখনই সম্ভব নয়, ইহা পরে আলোচিত হইয়াছে।

অপূর্ণোন্নত দেশের বেসরকারী ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করা। বেসরকারী শিল্পগুলিকে টাকা ধার দেওয়ার জন্য অনেক বিদেশী ঋণদান প্রতিষ্ঠান থাকে (যেমন ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস)। ইহারা উদ্বৃত্তের যে অংশ পায়, তাহার সাহায্যে দেশীয় অন্যান্য শিল্পগুলিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করে। কৃষিকার্যে যে মহাজনী পুঁজি নিযুক্ত হয় তাহা যৌথ খামার প্রতিষ্ঠিত না থাকায় কৃষকদের হাত হইতে সুদের আকারে প্রভূত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারে। মহাজনীপুঁজিজাত উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ফাট্‌কা (speculation) ব্যবসাতে নিযুক্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত বিনিয়োগ ক্ষেত্রে আসে না।

মহাজনী পুঁজিজাত উদ্বৃত্তের একাংশ পায় বিদেশীরা, অপরাংশ খাদ্য ও কাঁচামালের ফাট্‌কাবাজিতে সাহায্য করে

সরকারী ক্ষেত্রে বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে। যে সকল দিকে পরিকল্পিত বিনিয়োগ হয় তাহার মধ্যে স্কুল কলেজ অফিস বা ঘরবাড়ী প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতিতে বিনিয়োগ হইতেও সরাসরি প্রভূত উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে না। এই সকল কার্যে অর্থ নিয়োগ করাকে পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে বিনিয়োগ (Investment) বলেন বটে, কিন্তু ইহাদের দীর্ঘকালীন ভোগ্য দ্রব্য (Long run consumption goods) বলিলেও চলে। অন্ততঃ যে অপূর্ণোন্নত দেশ দ্রুত শিল্পায়নের জন্য স্বল্প পরিমাণ মূলধনকে সর্বাধিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে চায় ও উহা হইতে সর্বাধিক ক্রমবৃদ্ধির হার পাইতে চায়, তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সকল কার্যে সরকারী অর্থনিয়োগ দ্রুত উদ্বৃত্ত সৃষ্টির সহায়ক বলিয়া মনে করা চলে না।

রাষ্ট্রীয় বিনিযোগের অনেক অংশ হইতেই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না

সরকারী ক্ষেত্রের যে অংশ কৃষি বা শিল্পকে ঋণ দিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়া গঠিত তাহারা নূতন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে না। বেসরকারী মহাজনী পুঁজির মালিকেরা চাষী বা শিল্পপতিদের হাত হইতে সুদের আকারে যাহা তুলিয়া লয়, তাহার একাংশ রাষ্ট্র পাইয়া থাকে। রাষ্ট্র কর্তৃক মহাজনী কারবার স্থাপিত হইলে এই "সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত মহাজনী ব্যবসা"র ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি প্রশস্ত হইতে পারে না। একমাত্র সরকারী বৃহৎ শিল্প কয়টিতে অধিক

রাষ্ট্রীয় মহাজনী ব্যবসাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না

উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেই উদ্বৃত্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কার্যে পুনরায় নিযুক্ত করা চলিতে পারে।

পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে দেশের মোট সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত পরিকল্পিত উদ্বৃত্তে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেসরকারী মালিকানার অংশে কিছুটা সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ হয় না, বিজ্ঞাপন, বিক্রেতাচাতুর্য ও এইরূপ অপচয়মূলক কার্যে অপব্যয় হয়। ইহার দরুণ মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ও ফলে উন্নয়নের হার কম হইতে বাধ্য।

মিশ্র কাঠামোতে কেন উদ্বৃত্তর পরিমান কম

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিতে সরকারী ব্যয় খুব বেশি থাকে, ফলে পরিকল্পিত নীট বিনিয়োগ কম হয়। দেশের বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পপুঁজিপতি, জমিদার, বণিকী পুঁজিপতি, মহাজনী পুঁজিপতি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজনের অতিভোগ নিবারণ করিয়া উাহা পরিকল্পনার কার্যে খাটান সম্ভব হয় না। শ্রমিক ও চাষীরা নিজেদের ভোগ কমাইয়া উৎপাদনী শক্তি বাড়াইয়া অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে চায় না, তাহাদের মনোবল ব্যাহত হয়, কারণ দেশের একাংশে অতি-ভোগ বজায় থাকে। এইরূপ অতিভোগ-কাঠামোর (excess consumption structure) প্রদর্শন-প্রভাবে (Demonstration effect) দেশের উৎপাদক শ্রেণীর ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতার মনোবৃত্তি সৃষ্টি না হওয়ায় উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই সকল কারণে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে নীট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের অসুবিধা

Difficulties of Mobilisation of surplus from oifferent sectors

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে নীট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ (Size) কেবল যে কম সৃষ্টি হয়, তাহাই নহে, রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সংগ্রহ

উদ্বৃত্ত তোলার তিনটি নীতি

(Mobilisation) করার সুবিধাও তুলনামূলক ভাবে কম। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল অংশই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায়, সেখানে রেশনিং এবং কন্ট্রোলের সাহায্যে সকল শ্রেণীর লোকজনের ভোগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া

রাষ্ট্র সকল উদ্বৃত্ত নিজে ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতির বেসরকারী অংশে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সংগ্রহে বহু বাস্তব বাধা আছে। সাধারণভাবে তিনটি উপায়ে বেসরকারী অংশের উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা করা হয়, কর আরোপ, ঋণ গ্রহণ এবং ঘাট্‌তি ব্যয়ের নীতি। ইহারা কতদূর উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহা আলোচনা করা দরকার।

বেসরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সকল অংশে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, কর আরোপের দ্বারা তাহার কিছু অংশ নিশ্চয় রাষ্ট্রের হাতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর ইহাতে সন্দেহ নাই। অপূর্ণোন্নত দেশের ব্যবসায়িক অসাধুতা (যাহার উৎপত্তিস্থল হইল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক এবং বাড়িবার সুযোগ পায় নাই এইরূপ বামনাকৃতি ধনতন্ত্র) অনেক পরিমাণে আয়কর এবং বিভিন্ন কর বহুবিধ উপায়ে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি তৈয়ারী করে।* তাহা ছাড়া, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে (ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও) বেশীর ভাগ আদায় হয় "পরোক্ষ" করের দ্বারা, যেমন উপজ-কর (excise duties)। এই সকল পরোক্ষ কর জনসাধারণের ভোগের স্তর সংকুচিত করে, তাহাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় (Per capita real income) কমাইয়া দেয়। মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সেই মাথাপিছু আয় কমান ইহাই মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত বিরোধ (Internal Contradiction)। যত বেশি কর আরোপ করিয়া পরিকল্পিত বিনিয়োগ বাড়াইবার চেষ্টা হইবে ততই মাথাপিছু প্রকৃত আয় কমিতে থাকিবে, কারণ উপজ-কর বা পরোক্ষ কর সবগুলিই ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের নিকট অপসারণ (Shifting) করিতে পারে। ইহা সুস্পষ্ট যে, একচেটীয় ও অলিগোপলীয় (Monopolistic or oligopolistic) প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের উপর করভার (burden of the tax) ক্রেতাদের নিকট সম্পূর্ণ পাঠাইয়া দিতে পারে, কারণ তাহারাই 'দাম-নির্মাতা' (Price-maker) এবং ক্রেতারা 'দাম-গ্রহীতা' (Price-taker)।* অপরপক্ষে ইহা মনে রাখা দরকার যে, অধিবাসীদের একাংশের

পরোক্ষ কর-নীতির অন্তর্নিহিত বিরোধ

---

* কৃষিবিপ্লব অসম্পূর্ণ থাকায় (Unfinished agrarian revolution) ছোট ছোট চাষীদের নিকট হইতে করের সাহায্যে কোন উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয় ইহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

*অধ্যাপক Schitovsky-র এইরূপ বিভাগ বহুলাংশে সঠিক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রকৃত আয় কমিবার সঙ্গে সঙ্গে (সেই কর লব্ধ অর্থ বিনিয়োগ হওয়ার দরুণ) অপরাংশের কর্মসংস্থান হয়, তাহাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে (যদি অবশ্য এই করলব্ধ অর্থের উপযুক্ত বিনিয়োগ হয়)।

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে আয়কর বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ করগুলি (ফাঁকি বাদ দিলে) বাড়াইয়া উদ্বৃত্ত তুলিয়া লইতে পারা যায় ঠিকই, কিন্তু তাহা স্বল্পকালীন। কারণ বেসরকারীক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক মুনাফালোভিতাই কাজকর্ম ও প্রেরণার একমাত্র উৎস। উদ্বৃত্ত হাতে না থাকিলে বেসরকারীক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রেরণা থাকে না, উদ্বৃত্ত তুলিয়া না হইলে সরকারীক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার উপায় থাকে না, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর এই অন্তর্নিহিত বিরোধের একমাত্র পরিণতি হইল দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নয়নের গতিবেগ কমিয়া যাওয়া।

প্রত্যক্ষ কর-নীতির অন্তর্নিহিত বিরোধ

ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে সঞ্চয় তুলিয়া লইয়া রাষ্ট্রের হাতে পৌঁছান সম্ভবপর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা সেই উদ্বৃত্ত তখনই ঋণ দিবে, যখন নিজেরা উহাকে খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে না। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন অনুযায়ী যদি ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার হয়, তবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক ঋণ আদায়ের পদ্ধতি ছাড়া পরিকল্পিত ক্ষেত্রের জন্য এই উদ্বৃত্ত পাইবে না, ব্যবসায়ীরা নিজেরাই অধিক হারে মুনাফার লোভে উহাকে নিয়োগ করিবে। যদি ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার না হয়, তবে নূতন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারিবে না এবং রাষ্ট্র ঋণ পাইবে না। সুতরাং ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার বা সংকোচন উভয়ই রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঋণ পাইবার সম্ভাবনা কমাইয়া দেয়। আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। ঋণ করিলে উহার জন্য যে সুদ দিতে হয়, তাহাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং সেই সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। বর্তমানে উহা এমনভাবে নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে উহা হইতে উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পায়, সুদের হার ছাপাইয়া উহা পরিশোধ করার মত উৎপাদন বাড়ে। ভবিষ্যতে উহা পরিশোধ করার সময়ে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে কম পড়িবার সম্ভাবনা।

ঋণ-নীতির অন্তর্নিহিত বিরোধ ও ত্রুটি

পরোক্ষ-করের সাহায্যে অর্থ আদায় করিয়া ঋণদানকারী ধনিকশ্রেণীকে সুদ দিতে হয় বলিয়া সমাজের আয়-বৈষম্য ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, ইহাও মনে রাখা দরকার।

ঘাটতি ব্যয়ের নীতি একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে রাষ্ট্র যখন কিছু পরিমাণ কর্মসংস্থানকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলিয়া স্থির করে, তখন সেই কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তরে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহার তুলনায় সমাজে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ যত কম হয়, সেই ফাঁক, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ দ্বারা পূরণ করা হয়।[১০] এই ফাঁক যত প্রশস্ত হইবে, রাষ্ট্রের তরফ হইতে ব্যয়ের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। বাজেটের এই ঘাটতি পূরণ করার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইল টাকা ছাপাইয়া দেশে নোট প্রচলনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া, ইহাকেই ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতি বলে। আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হইলেও দীর্ঘকালের জন্য এইরূপ চালান মোটেই সম্ভবপর নহে। যদি উৎপাদক বিনিয়োগে এই টাকা খাটান হয়, তবে ইহার বদলে অধিবাসীদের হাতে দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ে এবং কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিনিয়োগের ধরণে যদি ভুল হয় অর্থাৎ কেবল শীততাপনিয়ন্ত্রিত আকাশচুম্বী ঘর-বাড়ী বা স্কুল কলেজ হাসপাতাল বা সৈন্যসামন্ত রাখা, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে এই অর্থ বিনিয়োগের ফলে কোনরূপ ক্রয় বিক্রয়-যোগ্য ভোগ্য বা মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় না। চল্‌তি হারে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় নগদ টাকার পরিমাণ লোকের হাতে বাড়িতে থাকে ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। জীবন যাত্রার মান খুবই নীচুতে থাকায় এবং বেসরকারীক্ষেত্রের উৎপাদন কাঠামোতে অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সেই নগদ টাকা জিনিসপত্রে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে ফাট্‌কাদারী উহাদের

(পার্শ্বটীকা: ঘাট্‌তি ব্যয় কাহাকে বলে)

(পার্শ্বটীকা: কেন ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ও উহার ফল কি)

[১০]যেমন ১০ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের স্তরে দেশে মোট ১৫০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত-সংগ্রহ ও বিনিয়োগ হওয়া দরকার। ১০০০ কোটি টাকা ব্যক্তিগত ব্যবসাদাররা বিনিয়োগ করিবে, তখন রাষ্ট্রের তরফ হইতে ৫০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করা দরকার।

দুষ্প্রাপ্যতর করিয়া তোলে এবং দাম বাড়াইয়া দেয়, মুদ্রাস্ফীতি গভীরতর ও প্রশস্ততর হইতে থাকে। এইরূপ মুদ্রাস্ফীতিতে বেসরকারী ব্যবসায়ী শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পায়, শ্রমিক ও মজুর শ্রেণীর মাথা-পিছু প্রকৃত আয় কমিয়া যায়, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার কম হইয়া পড়ে। বেসরকারী ক্ষেত্র লাভবান হইলেও তাহারা কিন্তু এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি চাহে না। অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলে তাহাদের লাভ ও বিনিয়োগের চুলচেরা হিসাব নিকাশ বানচাল হইয়া যায়, কোম্পানী ও ব্যক্তিগত পুঁজিপতির সম্পত্তির মূল্য (Value of the assets) হ্রাস পায়; বেসরকারীক্ষেত্রের ধনতান্ত্রিক ঋণ-কাঠামো (Credit-structure) ভাঙিয়া পড়িতে চাহে। ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয়, নতুন গজাইয়া উঠা উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্পত্তির ও বিনিয়োগের মূল্য কমাইয়া দিয়া ও শ্রমিক কৃষকের প্রকৃত আয় কমাইয়া দিয়া দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের গতিবেগ ব্যাহত করে। যত অধিক ঘাটতি ব্যয় হইবে এবং উহার যত বেশি অংশ অনুৎপাদক কাজে খাটান হইবে, ততই মুদ্রাস্ফীতির প্রসার হইবে ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অগ্রগতির বেগ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

উদ্বৃত্ত ব্যবহারের গতি-প্রকৃতি

Nature & direction of utilisation of surplus

উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও উদ্বৃত্তের সংগ্রহ উভয় বিষয়ে এই সকল বাধা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের যে অংশ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হাতে আসে তাহার বিনিয়োগ করিয়া পরিকল্পিত ক্ষেত্র (Planned Sector) দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ বেসরকারী ক্ষেত্রের কাজকর্ম তাহার আয়ত্তের বাহিরে। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তিক্ষেত্রের কার্যকলাপ রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিকল্পনা সফল হওয়ার পথে বহুবিধ বাধা সৃষ্টি করে এবং ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্রম বৃদ্ধির গতিবেগ দ্রুত হইতে পারে না।

বেসরকারী ক্ষেত্র পরিকল্পনাকে বাধা দেয়

ইহার মোটামুটি তিন রকমের কারণ আছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একটি সামগ্রিক বিষয়, পরস্পর সংলগ্ন গ্রন্থির দ্বারা যুক্ত একটি শৃংখলের মত, যে কোন একটি গ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়িলে উহা সমগ্রভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সিমেন্ট উৎপাদন করিল, উহা ব্যক্তিক্ষেত্রের ব্যবসায়ীরা ঠিক

সময় মত দাম দিয়া কিনিয়া না লইলে রাষ্ট্রীয় কারখানায় উৎপাদনের গতিধারা স্থগিত বা ব্যাহত হইবে। ব্যক্তিক্ষেত্র যে কয়লা উৎপাদন করিবে তাহা ঠিক সময়মত ও পরিমাণমত উৎপন্ন না করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের কাজকর্ম কমিয়া আসিবে। এই সমাজে একটি দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল; একের উৎপন্ন দ্রব্য অপরের কাঁচামাল, একাংশে উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি অপর অংশের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইতে বাধ্য। তাই মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপাদনের পরিমাণ, গতি, স্থান, কাল প্রভৃতি বিষয় লইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র ও ব্যক্তিক্ষেত্রের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য ঘটান সম্ভব হয় না। দেশের পরিবহন-ব্যবস্থাও যদি বেসরকারীক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে, তবে এইরূপ উৎপাদনের সমন্বয় সাধন (Co-ordination) আরও কষ্টকর হইয়া উঠে।

কারণ:
(১) সমন্বয়সাধন হয় না

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে (Physical Planning); ব্যক্তিক্ষেত্রে পরিকল্পনা গৃহীত হয় অর্থের হিসাবে (Financial Planning), নগদ অর্থকে দ্রব্যে রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় অধিক অর্থ ফেরৎ পাওয়াই ব্যক্তিক্ষেত্রের পরিকল্পনাকারীদের লক্ষ্য। খোলা বাজার হইতে জিনিস কিনিয়া আবার খোলা বাজারে বিক্রী করা—এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিক্ষেত্রকে চলিতে হয় বলিয়া তাহারা অর্থের হিসাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উপকরণ কোন্ দিকে নিযুক্ত হইবে ব্যক্তিক্ষেত্রে তাহা নির্ভর করে সর্বাধিক মুনাফার (Maximum Profit) সম্ভাবনার উপর; সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাহা নির্ভর করে সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর (Maximum Productivity)।

(২) উভয় ক্ষেত্রের লক্ষ্য পৃথক

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যাহত হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। পরিকল্পনা চলিত থাকার কালে সমাজ-মানসের উপযুক্ত পরিবর্তন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যের পূর্বসর্ত (Pre-condition) বলিলেও ভুল হয় না। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির ধারার মধ্যেই সমাজমানসের সেই প্রস্তুতি চলিতে থাকে, সমগ্র সমাজদেহ ও সমাজ-মন উন্নয়নের গতিবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। পুরাণো সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ; বিশ্রাম-শ্রম, আমোদ-

প্রমোদ, শত্রুতা ও বন্ধুত্ববোধ, পারিবারিক সম্বন্ধগুলি সকল কিছুর রূপ বদলাইয়া যাইতে থাকে। সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মন পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া দ্রুত রূপান্তরিত হইতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পূর্বসর্ত ও লব্ধফল (Precondition and acquired effect) হইল দেশে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের প্রসার; শ্রমমুখী ও সমবায়মুখী জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বেসরকারী ধনতান্ত্রিকক্ষেত্রে স্থূল অর্থনৈতিক লাভক্ষতির চুলচেরা হিসাব-নিকাশে ব্যক্তিমানস আন্দোলিত হয়।[১১] সমাজ-মনের মধ্যেই এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং এইরূপ দ্বন্দ্ব নিহিত থাকে বলিয়া মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেশপ্রেম ও সামাজিক চেতনা ব্যাহত হয়, অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথ সরল ও গতি দ্রুত হইতে পারে না।

(৩) মিশ্র সমাজ-মানসের ফল

মিশ্র কাঠামোতে কিরূপে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটে

Why private enterprise or Capitalism expands under mixed economy

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে অপরিকল্পিত বেসরকারী ক্ষেত্র কেবলমাত্র উন্নয়নের গতিবেগ কমাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের "সমাজতান্ত্রিক" পরিকল্পনার ফলে তাহারা লাভবান হয়। এইরূপ লাভবান হয় বলিয়াই ব্যক্তিক্ষেত্র "সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের" সহিত অনেকাংশে সহযোগিতা করে, এমন কি ব্যক্তিক্ষেত্রের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যবসাদার নিজে উদ্যোগী হইয়া মিশ্র অর্থনীতির স্বপক্ষে প্রচার সুরু করে।[১২]

মিশ্র কাঠামোতে ধনতন্ত্রেরই সুবিধা

সর্বপ্রথমেই বলা যায়, বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের কথা (External economies)। ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের মালিকানায় শিল্প সম্প্রসারণের গতি দ্রুততর হয় যদি দেশে পথঘাট, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, দক্ষমজুর বা এন্‌জিনিয়ার তৈয়ারীর জন্য

[১১] Appreciative and sensitive to crude economic calculus—কেবল রুটির হিসাবেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে।

[১২] সম্মুখে সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যেমন অর্ধেক ত্যাগ করাও যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভয়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর অর্ধেক ছাড়িয়া দিতেও ব্যক্তিক্ষেত্রের মালিকদের কোন আপত্তি থাকে না।

শিল্প শিক্ষার উপযোগী স্কুল কলেজ এই সকল প্রস্তুত থাকে। পূর্ণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পায়নের গতিবেগে ধনিকেরা নিজেরাই বা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই সকল "বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের" ব্যবস্থা হয়। ধনতন্ত্রের নিজের বিকাশই এই সকল সুবিধা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে রাষ্ট্রের উপর অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এই সকল কাজ সম্পাদনের ভার পড়ে, সুতরাং বেসরকারী মালিকদের আপত্তি করার কারণ থাকে না। তাই বলা হয় "রাষ্ট্রেরও শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে." "দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্র ও ব্যক্তিক্ষেত্র উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া উন্নয়ন ঘটাইবে।" নিজেরা যে সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী হারে এবং তাড়াতাড়ি মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই অথচ সাধারণ শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যে সকল কাজ খুবই দরকারী, উহাদের রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে জনসাধারণের নিকট সমাজতন্ত্র বলিয়া প্রচার করাও চলে। এই সকল বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের ফলে উৎপাদন-ব্যয় কমে ও আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তৃতি ঘটে, রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের কার্য-কলাপের প্রসারের ফলে ব্যক্তিক্ষেত্রের মুনাফার হার বাড়ে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি হইলে তাহা লইয়া সমালোচনা করিয়া পূর্ণ সমাজতন্ত্রের অক্ষমতার কথা প্রচার করিয়া রাজনৈতিক মুনাফাও কম পাওয়া যায় না।

বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা ব্যক্তি-ক্ষেত্রই পাইয়া থাকে

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণ ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূলধন-গঠন দ্রুততর হইয়া উঠে এবং কোন ব্যবসায়ীর নগদ অর্থকে অপর ব্যবসায়ীর মূলধনে রূপান্তরিত করার উপযোগী ঋণসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলে। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া বেসরকারী ব্যবসাদারদের মূলধন সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। মূলধন-সংগ্রহের ঝুঁকির ও খরচের একাংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রই বহন করে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রয় বাড়াইবার জন্য উহার দায়িত্ব বহন করা হয় (Underwriting of shares), ঠিক সময় ঋণ পরিশোধ করিলে সুদের ভার হইতে কিছুটা অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থাও থাকে। মুনাফা-মুখী ব্যবসায়ীরা সরকারী কর্মচারীদের অসাধু করিয়া তোলে এবং রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রের মূলধনের সাহায্যে শিল্প সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

ঋণসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয় না

তৃতীয়তঃ, পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বলিলে উহার সকল অংশের এক সামগ্রিক ভারসাম্য বুঝায়।[১৩]

এই কাঠামোর এক অংশের উৎপাদন অপর অংশের কাঁচামাল এবং এইভাবে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সহিত জড়িত ও নির্ভরশীল। প্রত্যেক অংশ অপর অংশের নিকট হইতে জিনিস কেনে এবং নিজের জিনিস বিক্রয় করে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রজাত দ্রব্য ব্যক্তি-ক্ষেত্রকম দামে পায়: বাণিজ্যহার ব্যক্তি-ক্ষেত্রের পক্ষে

এক অংশজাত দ্রব্যের সহিত অপর অংশজাত দ্রব্যের (নিহিত শ্রমের উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী) অনুপাত বা বাণিজ্যহার (Terms of Trade) স্থাপিত হয়। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রভূত অর্থব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া উৎপাদন ব্যয় হইতে কম হারে দ্রব্য বিক্রয় করা হয় (যেমন, সার, সরকারী পরিবহন ও অন্যান্য দ্রব্য); তাহাতে ব্যক্তিক্ষেত্রই লাভবান হয়। সকল অংশ বেসরকারী ব্যবসাদারদের হাতে থাকিলে যে দামে দ্রব্য বা উপকরণ পাইতে পারিত, তাহাপেক্ষা কম দামে সরকারী-ক্ষেত্র হইতে তাহারা উহা পাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে বাণিজ্যহার ব্যক্তিক্ষেত্রেরই অনুকূল হইয়া উঠে, সুতরাং মিশ্র কাঠামো রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের বিনিময়ে অর্থাৎ জনস্বার্থের বিনিময়ে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের স্বার্থ অধিকতর বজায় রাখে।

চতুর্থতঃ, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তিক্ষেত্র লাভবান হন, কারণ দেশে শ্রমিকদের মজুরির হার এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই

বেসরকারী ক্ষেত্র কম মজুরি দিয়া ও কল্যাণ-মূলক ব্যয় না করিয়া ব্যবসা করিতে পারে

অনেকাংশে বহন করিতে হয়। পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু মিশ্র কাঠামোতে তথাকথিত "সমাজতন্ত্রে"র নামে এই সকল বিষয় রাষ্ট্রই নির্ধারিত করিতে থাকে। জাতীয় উদ্বৃত্ত সৃষ্টি বা মূলধন-গঠনের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে নিম্ন মজুরির হার চালু রাখা হয়, তাহার পূর্ণ সুযোগ বেসরকারীক্ষেত্রের মালিকগণ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের উদাহরণ অনুসারে তাহারাও মজুরির হার কম রাখে, কিন্তু উহার ফলজাত উদ্বৃত্ত কোন জাতীয় পরিকল্পনার কার্যে নিযুক্ত হয় না। শ্রমিককল্যাণমূলক কাজকর্মের

[১৩] ভারসাম্য বলিলেই স্থিতিশীলতা বুঝায় না, প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজস্ব গতিশীলতা এবং উহাদের পারস্পরিক গতিশীলতার ভিত্তিতেই সমাজের এই ভারসাম্য বজায় থাকে।

জন্য তাহাদের খরচ কম হয়, তাহারা অধিক উদ্বৃত্ত নিজেদের হাতে রাখিতে পারে।[১৪]

পঞ্চমতঃ, বিদেশী ধনিকদের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করিয়া বেসরকারী ক্ষেত্র খুবই লাভবান হয়। রাষ্ট্রের সাহায্যে তাহারা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যহার নিজেদের অনুকূলে আনিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি হইতে সাহায্যের ভিত্তিতে কম সুদে এবং কম দামে সংগৃহীত ঋণ ও উপকরণগুলি তাহারা ব্যবহারের সুযোগ পায়।

বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখে ব্যক্তিক্ষেত্র রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে

সর্বোপরি, অপূর্ণোন্নত দেশের শিল্পপতিরা কিছুটা একচেটিয়া অধিকার রাখিতে পারে বলিয়া অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে কিন্তু সেই উদ্বৃত্তের সাহায্যে শিল্প প্রসার ঘটায় না। নিজেরা বিনিয়োগের সুযোগ না পাইলে শিল্পপতিরা ও বণিকী পুঁজিপতিরা সরকারকে ঋণ দিয়া সুদ পাইতে পারে। সেই সুদের উপর অনেক সময় রাষ্ট্র কর নেয় না, সুদলব্ধ আয়ের পরিমাণ উহারা পুনরায় ঋণ দেয়, এইরূপে রাষ্ট্রের হাতের উদ্বৃত্তের উপরই ব্যক্তিক্ষেত্র একধরণের কর আরোপ করিতে পারে।

পরিকল্পনাতে বিনিয়োগ করিয়াই লাভ করে

এই সকল কারণে দেখা যায় যে, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিকল্পনার ফলে ব্যক্তিক্ষেত্রই অধিকতর লাভবান হয়, নূতন পরিবেশে নূতন উপায়ে ধনতন্ত্র প্রসারের উপযুক্ত কাঠামোই হইল মিশ্র অর্থনীতি।[১৫]

---

[১৪] একচেটিয়া মালিক হিসাবে রাষ্ট্র মজুরির হার কমও রাখিতে পারে।

[১৫] "It should be clear, however, that, if an underdeveloped country really succeeds in starting, and sustaining by its policy interferences an upward cumulative process of economic development, this will provide more and not less space for what of private enterprise such country possesses or is able to foster—"*Gunnar Myrdal*—"Economic Theory and underdeveloped Regions" (1957) p. 79.

ইহা যে কিরূপ সত্য তাহা ভারতের দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারা যায়। যে দিন আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন ঘোষণা করা হয় সেই দিনই শেয়ারবাজার তেজী হইয়া উঠে। পরের দিনের Times of India-র সংবাদে বলা হইতেছে, "Under the stimulus of the Prime ministers' Statement on Economic policy the Bombay stock Exchange developed a cheerful tendency after a fairly long period of dullness. On Thursday, the operations took a constructive view of the Prime Minister's exposition of the Socialist Pattern of Society. Prices picked up again and under the lead of steel, many features of strength were established."

এইরূপ তথাকথিত সমাজতন্ত্রে বা আধাসমাজতন্ত্রে পুঁজিপতিরাই লাভবান হন, তাই এই কাঠামোর সম্পূর্ণ অপসারণ করিয়া পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নয়নের হার কখনই আকাঙ্খিত স্তরে উঠিতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

The need for Socialist planned economy

ধনতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর ফলে অপূর্ণোন্নত দেশের উন্নয়নের গতি যে পরিমাণে ব্যাহত হয়, তাহা মোটেই কম নয়। সুতরাং ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নয়নের প্রধান সর্তই হইল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলা। আজিকার দিনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধীর গতিতে হইবে এই প্রস্তাব তোলা খুবই অন্যায় এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। একটি বৎসর নষ্ট হওয়ার অর্থ হইল কোটি কোটি মানুষের জীবন, আশা ও আকাঙ্খার অপমৃত্যু। এই অপঘাত, উপকরণ ও মানবিক শক্তির অপব্যয় ও ক্ষয়—ইহার কোন সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই।[১৬]

উন্নয়নের হার বৃদ্ধির জন্য সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবী এমন যুগ পার হইয়া আসিয়াছে যখন উন্নয়নের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ জ্ঞান ; আজ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথে বাধা হইল মানুষের অজ্ঞানতা, অযৌক্তিকতা, পুরাতনের প্রতি অন্ধ আসক্তি এবং নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার ভয়। যুক্তি দিয়া যাহাকে ন্যায় সিদ্ধ বলিয়া মনে করা যায়, সেই পথ গ্রহণের বাধা হইল বর্তমানের সমাজ-জাত স্বার্থান্ধতা।

---

[১৬] "This state of affairs becomes daily more absurd and more unnecessary. It must be abolished, it can be abolished. A new social order is possible in which the present class differences will have disappeared and in which — prehaps after a short transitional period involving some privation, but at any rate of great value morally—through the planned utilization and extension of the already existing enormous productive forces of all members of society, and with uniform obligation to work, the means for existence, for enjoying life, for the development of all bodily and mental faculties will be available in an equal measure and in every increasing fulness"—*Engles*, Introduction to *Marx's* wage, Labour & Capital.

সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির পথও যে নিতান্ত সহজ হইবে, তেমন বলা চলে না, এইরূপ সমাজ গড়িয়া তোলাও বহু দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই পার হইতে হইবে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্য হইতে ইহাকে জন্ম লইতে হইতেছে, বহু অযৌক্তিকতা এবং এবং অজ্ঞানতা প্রথম যুগে ইহার মধ্যে নিশ্চয় থাকিতে পারে।[১৭]

কিন্তু এই অযৌক্তিকতা সেই সমাজ ব্যবস্থার বাহির হইতে আগত; দেশেরউৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যেই ইহা আর নিহিত থাকিবে না। সমাজতান্ত্রিক দেশটি ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইবে এবং নিজের সামাজিক প্রয়োজনেই সেই ভুল ত্রুটি এড়াইবার মত জ্ঞান আহরণের বেগ ও পরিধি বৃদ্ধি করিবে। যদি এইরূপ সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া না উঠে, তখন অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে এই অচলাবস্থা আরও কত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সাগর অভিমুখে নদীর স্বাভাবিক গতিবেগ ব্যাহত হইলে উহা নিজেকে শুকাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, পৃথিবীতে এরূপ বহু দেশ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বাস্তবে অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভাবে উন্নততর সমাজে উত্তরণ না হওয়াতে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।*

[১৮] সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র—মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর সাঁড়াশীর এই দুইটি হাত হইতে অপূর্ণোন্নত দেশগুলির মুক্তি পাওয়া তাই ঐতিহাসিক দিক হইতে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

---

১৭ What we have to deal with here is a Communi-t society, not as it has developed *on its own foundations*, but on the contrary, as *it emerges from Capitalist society*; which is thus in every respect, economically, morally and intellectually, still stamped with the birthmarks of the old society from whose womb it emerges. —*Marx*, Critique of the Gotha Programme.

১৮ The need for overturn may become ripe, but the strength of the revolutionary creators of that overturn may turn out to be inadequate for carrying it out. Under such conditions society rots and this rotting sometimes lasts entire decades. *Lenin*. (*works vol* 9. P 338)

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তত্ত্ব ও প্রয়োগ

Theory and Practice of Economic Planning

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গঠনকৌশল

Constructional techniques of an Economic Plan

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পরিকল্পনার জন্য তিনটি প্রাথমিক বিষয় প্রয়োজন। উহার মধ্যে প্রধান হইল কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। সকল ব্যক্তি বা ফার্মই নিজ নিজ উৎপাদন, আয়, ব্যয় প্রভৃতি কাজকর্ম মোটা-মুটি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে না। এইরূপ পরিকল্পনায় সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে দেশের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগমন হয় না। পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে দেশের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকা অবশ্যই দরকার। দ্বিতীয়তঃ, দেশে কি পরিমাণ ও কিরূপ উপকরণ আছে তাহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। উপকরণসমূহের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ব্যবহারের রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। সর্বশেষে উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বাস্তব সম্ভাবনাবিচ্যুত কাল্পনিক উচ্চাকাঙ্খী বা নিম্নাকাঙ্খী লক্ষ্য ধার্য করিলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অধিক হইতে পারে না।

পরিকল্পনার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময়ে সাধারণতঃ সুদূর ভবিষ্যতে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান কিরূপ দাঁড়াইবে এই ধরণের একটি সুদীর্ঘকালীন চিত্র সামনে রাখা হয়, যেমন ২৫ বৎসর ৩০ বৎসর, প্রভৃতি। এইরূপ চিত্রাঙ্কনকে দূরপ্রেক্ষিত বা দূর-প্রসারী পরিকল্পনা (Perspective Planning) বলে। এই সুদীর্ঘকালীন লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য এককালীন একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না; সেই দীর্ঘকালকে ছোট ছোট কালাংশে (Time-period) বিভক্ত করা হয় (যেমন ৫ বৎসর), এবং দূর লক্ষ্যে পৌছিবার পথের অল্প একটু অংশকে

পরিকল্পনা-কাল বা সময়

এই পরিকল্পনাকালের লক্ষ্য হিসাবে ধার্য করা হয়। সাধারণতঃ রাশিয়ার অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা মোটামুটি প্রথা দাঁড়াইয়া গেলেও মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠিক পাঁচ বৎসরেরই হইতে হইবে এমন কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। তবে পরিকল্পনাকাল খুব ছোট হওয়া উচিত নয়, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছান যায় না। তবে উহা খুব দীর্ঘ হওয়াও উচিত নয়, কারণ একই পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

পরিকল্পনার কাজই হইল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক ও গতি নির্ণয় করা (direction & speed of economic development) এবং বাস্তবে সেই পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যকরী করিয়া তোলা। বর্তমান উপকরণ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎপত্তি-বিন্দু বা উদ্যোগবিন্দু (starting point) ধরিয়া লইয়া ক্রমবৃদ্ধির সুরু হইয়া কোন বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছান—ইহাকেই সেই সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ বলা চলে। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক দেহে যে সকল যোগসূত্র (Links) আছে সেই অনুন্নত সংযোগসূত্রগুলিকে টানিয়া তুলিয়া উন্নত স্তরে অর্থনৈতিক কাঠামোর সংগঠন করাই পরিকল্পনার কাজ।

অর্থনৈতিক কাঠামোর সংযোগসূত্রগুলি একত্রে টানিয়া তোলা

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-দেহের সংযোগসূত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করা দরকার এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী উৎপাদন সংগঠন, আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির ধারা ও স্রোতকে পরিচালিত করা দরকার। দেখা দরকার যে, কি উপকরণ, কত পরিমাণে, কোথায় অবস্থিত, কিরূপে নিযুক্ত। তাহার পর বিচার করিতে হইবে ইহাদের কোন্ ক্ষেত্রে, কি পদ্ধতিতে, কত কম ব্যয় করিয়া, কত দ্রুত, পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী, সর্বাধিক পরিমাণ সম্পদ উৎপাদনে নিয়োগ করা সম্ভব। ইহার পরে স্থির করিতে হইবে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে (sector) উপকরণগুলি কিরূপে পরিকল্পিত উৎপাদনের প্রয়োজনে নিযুক্ত হইতে পারে এবং উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তনে কোনো প্রতিবন্ধক আছে কি না। বর্তমানের ব্যবহার হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিয়া

এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উত্তরণ

উৎপাদনের শূন্যস্থান পূরণ করা হইবে কি না, এবং কিরূপে হইবে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন কি ভাবে অপর দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বা বর্তমান উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহাও দেখিতে হয়। সমাজের প্রায় সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন পরস্পরসংশ্লিষ্ট। সকল দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনে ও বণ্টনে কোথাও বাধা সৃষ্টি না হইয়া যাহাতে সুসামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং উৎপাদন, আয় স্রোত ও ব্যয়স্রোত সর্বদা অব্যাহত থাকে, ইহাদের গতি ও পরিমাণে সামঞ্জস্যবিহীনতা না ঘটে, তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন।

ব্যালান্স গঠন (Balancing)

পরিকল্পনা কৌশলের প্রধান বিষয় হইল ব্যালান্স স্থাপন করা, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগমন। এই ব্যালান্স সাধারণতঃ তিন প্রকার: উপকরণের ব্যালান্স (Material Balances), শ্রমের ব্যালান্স (Labour Balances) ও আর্থিক ব্যালান্স (Financial Balances)। ব্যালান্স গঠন করিতে হইলে বিভিন্ন বিষয়ের বহু তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং এই তালিকা-সমূহ পাশাপাশি সাজাইয়া অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে ক্রমবৃদ্ধি ও অগ্রগমনের সকল স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও পরস্পরসংলগ্ন নির্ভরশীলতা (Interrelated interdependence) বজায় রাখা হয়। ক্রমবৃদ্ধির পরিকল্পিত পরিমাণ ও গতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক দেহ বা বিষয়সমূহ সঠিকভাবে অগ্রসর হইতেছে কি না তাহা এইরূপ ব্যালান্স গঠন করিয়াই জানিতে পারা যায়। অবস্থা বা প্রয়োজনের পরিবর্তনে পরিকল্পনা সংশোধন করিতে হইলে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে, এই সকল ব্যালান্স গঠনকারী সকল যোগসূত্রকে নূতনভাবে স্থাপন ও সংযোজন করিতে হয়।

পরিকল্পনার কৌশল: তিন প্রকার ব্যালান্স গঠন

উপকরণের ব্যালান্স বলিলে বোঝা যায় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, ভোগ, মূলধনীদ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন ও উহাদের ক্ষয়ক্ষতি, কাঁচামালের ব্যবহার, ভোগ্যদ্রব্যের মজুত, আমদানী ও রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ (Quantum and Corelation)। শ্রমের ব্যালান্স বলিলে বোঝা যায় সকল প্রকার নিপুণ ও অনিপুণ শ্রমের যোগান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে

নিয়োগ ও বণ্টন, ইহাদের ব্যবহারের প্রগাঢ়তা (intensity of ,utilisation), যন্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ। আর্থিক ব্যালান্স বলিলে বোঝা যায় দেশে সঞ্চয় এবং বিভিন্ন প্রকারের ভোগকার্যে জাতীয় আয়ের নিয়োগ ও বন্টন, বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে বা সামাজিক উন্নতির জন্য পুঁজিরূপে অর্থলগ্নী, মজুরীভাণ্ডারের বিভিন্নক্ষেত্রে বণ্টন, ক্রয়শক্তি সৃষ্টি করা ও বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারে উহার বণ্টন, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ও নগদ অর্থের প্রচলনবেগ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Monetary institutions) কর্তৃক অর্থ ও ঋণ সৃষ্টি—প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ ও ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ। পরিকল্পনা কমিশন বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাজ হইল এইরূপ প্রত্যেকটি ব্যালান্সের মধ্যে পরস্পরসংলগ্ন নির্ভরশীলতা (Interrelated interdependence) বজায় রাখা ; সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক দেহে সঞ্চারিত পরিবর্তনের (generated change) পরিমাণ, দিক ও গতি স্থির করা, যাহাতে জাতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পিত, সুসম ক্রমবৃদ্ধি (Planned and balanced Growth) ঘটে।

এই তিনটি ব্যালান্স আবার পরস্পরসংশ্লিষ্ট ও নির্ভরশীল

এই সকল ব্যালান্স গঠন করিবার দুই ধরণের পদ্ধতি আছে, পরিকল্পনাকে প্রয়োগগতভাবে রূপদান করিবার জন্য দুইটি বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যালান্স গঠন করা হয় ; আড়াআড়ি ব্যালান্স (Crosswise Balances), এবং পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স (Backward Balances)।

দুই পদ্ধতিতে ব্যালান্স গঠন

কাঁচামাল, অর্ধনির্মিত দ্রব্যাদি, শ্রমশক্তি প্রভৃতি সকল উপকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য নির্ধারণ করাই আড়াআড়ি ব্যালান্সের পদ্ধতি। সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ এবং মোট উপকরণের পরিমাণ— ইহাদের মধ্যে সম্ভাব্যতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখাই আড়া-আড়ি ব্যালান্সের উদ্দেশ্য। সকল উপকরণ, যেমন জমি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন-সংগঠন, প্রধান ধাতুদ্রব্য, বিদ্যুৎ বা অন্যান্য যন্ত্রচালনশক্তি, শ্রমশক্তি প্রভৃতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে অর্থাৎ অব্যবহৃত থাকিয়া সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ কমাইয়া দিতে না পারে তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আড়াআড়ি ব্যালান্স গঠন ও পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ

ইহাও দেখা দরকার যে, উপকরণসমূহের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী যেন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়, তাহা না হইলে লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি পরিকল্পিত স্তরে পৌছিতে পারিবে না। জনশক্তির ক্ষেত্রে ইহার বিচার ও প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয়; লক্ষ্য কম ধার্য হইলে অনিয়োগ (unemployment) ও অপূর্ণ-নিয়োগ (under-employment) দেখা দিবে, লক্ষ্য সাধ্যাতিরিক্ত ধার্য হইলে নিয়োগাধিক্য (hyper-employment) ও পূর্ণাধিক কর্মনিয়োগ (over-full employment) দেখা দিবে, উৎপাদনের ধারা ব্যাহত হইবে।

আড়াআড়ি ব্যালান্সের দুইটি বিশেষ সমস্যা আছে: সর্বোত্তম স্থান নির্বাচন (Optimum location), এবং দ্রব্যসামগ্রীর আকারে স্থিরীকৃত আসল লক্ষ্যের (real targets) সহিত উহা উৎপাদনের উপযোগী অর্থবিনিয়োগের পরিমাণগত সম্পর্ক। এরূপভাবে দ্রব্যোৎপাদনের স্থান নির্বাচন করিতে হইবে যেখানে পরিবহন ব্যয় সর্বনিম্নে এবং উপকরণের যোগান সর্বাধিক সুবিধাজনক। প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই এইরূপে স্থানসম্পর্কীয় ব্যালান্স (Locational Balance) গঠন করা দরকার। এই ব্যালান্সের ব্যাপারে কোনো বিশেষ অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং সেই অঞ্চলের মোট উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। দ্বিতীয় সমস্যা হইল দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্য ও অর্থলগ্নীর লক্ষ্য—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা (Financial Balances)। অর্থভিত্তিক সমাজে দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্য অর্থের হিসাবে (জিনিসপত্রের মোট দামের দ্বারা) প্রকাশ করা হয়। আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সকলই অর্থের হিসাবে করা হয়, সুতরাং ইহাদের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদি দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী অর্থলগ্নী না করিয়া উহাপেক্ষা কম করা হয়, তাহা হইলে সমাজে দ্রব্য ও উপকরণ অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে। যদি উহাপেক্ষা বেশি করা হয়, তবে উৎপাদনে নিয়োগোপযোগী উপকরণসমূহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উহাদের দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতির পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্য ও অর্থলগ্নীর পরিমাণ ধার্য করিবার সময়ে এই সকল বিচ্যুতির (lapses) সম্ভাবনা নজরে রাখিতে হয়। বিশেষ করিয়া খেয়াল রাখিতে হয়, যেন পরিকল্পনা

আড়াআড়ি ব্যালান্সের দুইটি সমস্যা ও পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ

কর্তৃপক্ষের হাতে দেশের আয়ব্যয় স্রোত হইতে সঞ্চয় তুলিয়া লওয়ার এবং দ্রব্য-সামগ্রীর বন্টন নিয়ন্ত্রণের উপযোগী যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, বিশেষ প্রকার কর-কাঠামো (Tax-structure) এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণাদির (system of controls) ব্যবস্থা থাকে।

পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স-এরই অপর নাম হইল সর্বনিম্ন ক্ষেত্র হইতে হিসাব করিয়া পরিকল্পনা রচনা করা (Planning from below)। উৎপন্ন দ্রব্য এবং উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণসমূহের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপকরণের নিয়োগ স্থির করাই এইরূপ পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স গঠনের কাজ। যেমন, ছাতার কাপড় উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করার সময়ে দেখিতে হইবে যে ছাতার বাঁট এবং লোহার শিকগুলির উৎপাদন কি কি পরিমাণ হইতে পারে বা কি পরিমাণে ধার্য করা হইয়াছে। যদি এইরূপে বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করা না হয় তাহা হইলে কিছু পরিমাণ ছাতার কাপড় গুদামে পড়িয়া থাকিবে, অপচয় হইবে এবং শিকগুলি অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে। যেমন, ট্রাক্টরের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে হিসাব করিতে হইবে কি পরিমাণ ইস্পাত, কয়লা, লোহা প্রভৃতি প্রয়োজন, মজুরী বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ হইবে। এইরূপ অসংখ্য দ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতির চাহিদা যোগ করিয়া ইহাদের উৎপাদন-পরিমাণের বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে এবং ইহাদের উৎপাদনের জন্য আবার পিছনে তাকাইয়া যে সকল দ্রব্য দরকার উহাদের হিসাব করিতে হইবে। ইহাই হইল পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স। দেখা যাইবে যে, ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াইতে কয়লা দরকার, আবার কয়লার উৎপাদন বাড়াইতে গেলে ইস্পাতজাত যন্ত্রের দরকার, এইরূপে গোড়া হইতে সুরু করিয়া সকল দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়া দরকার। ইহার মধ্যে আরও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার সময় সম্বন্ধে। যদি পরিকল্পনাকালের মধ্যে যন্ত্র উৎপন্ন হয় তবেই তাহার দ্বারা কয়লা উত্তোলিত হইতে পারিবে এবং আরও যন্ত্রোৎপাদন করা চলিবে। সুতরাং প্রত্যেকটি দ্রব্যের পরিমাণগত লক্ষ্যের সহিত কি সময়ের মধ্যে উহার ব্যবহার (নিয়োগ বা ভোগ) করিতেই হইবে তাহাও সুনির্দিষ্ট থাকা দরকার; তাহা না হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদনের ধারাই ব্যাহত হইয়া দেশের অথনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগ কমাইয়া দিবে।

পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স গঠন

উপাদান-উৎপন্নের বিশ্লেষণ—(Input-output Analysis) :

উৎপন্ন দ্রব্য এবং উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণের মধ্যে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে পারিলে সকল দ্রব্যের ও উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য সঠিকভাবে স্থির করা যায়; ইহার জন্য সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইহাকে উপাদান-উৎপন্নের বিশ্লেষণ (Input-output analysis) বলে। দেখা যায় যে, সমাজের কোনো দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া হয় ভোগ কার্যে নতুবা অপর কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়। একের উৎপাদন অন্যের উপকরণ, অন্যের উৎপন্ন অপর কাহারও উপকরণ—এইভাবে প্রত্যেক শিল্প বা উৎপাদনক্ষেত্র অন্য শিল্প বা উৎপাদনক্ষেত্রের সহিত পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত ও গ্রথিত। যেমন, বীজ হইল উপকরণ এবং উহা হইতে গম হইল উৎপন্ন দ্রব্য। এই গম কৃষিক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও ময়দার কলের উপকরণ; যাহার উৎপন্ন দ্রব্য হইল ময়দা।

সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই উৎপন্ন ময়দার কিছু পরিমাণ ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং কিছুটা আবার রুটি উৎপাদনের শিল্পে উপকরণ হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, একের উৎপন্ন অন্যের উপকরণ—এইভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রত্যেকটি উৎপাদনক্ষেত্র বা শিল্প পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন শিল্পে, যেমন গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কম ধার্য করিলে ময়দার কল উপকরণ কম পাইবে ও তাহার উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, যন্ত্রাদি অব্যবহৃত থাকিবে, ফলে রুটির উৎপাদনক্ষেত্রেও উপকরণের অভাব ঘটিবে, যন্ত্র অব্যবহৃত থাকিবে এবং ময়দার ভোগ কমিয়া যাইবে। গম উৎপাদনের লক্ষ্য বেশি ধার্য করিলে, অন্যান্যক্ষেত্রে কি পরিমাণ উপকরণের প্রয়োজন আছে বা তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কি, এই সকল বিশ্লেষণ না করিলে, গমের সদ্ব্যবহার না হইয়া অপচয় হইতে পারে, তাহাতে ক্রমোন্নতি হার কমিয়া যাইবে। সুতরাং আন্তঃ-শিল্প-সম্পর্ক বা উপাদান-উৎপন্নের প্রয়োজনীয় অনুপাত বিশ্লেষণ করিয়া সকল ক্ষেত্রের পক্ষে পারস্পরিক ভাবে সর্বোত্তম (optimal) লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন।

আন্তঃশিল্প সম্পর্ক দুইভাবে বিচার করা যায় : ব্যালান্স-সমীকরণ (Balance-Equation) এবং কাঠামোগত সমীকরণ (Structural-Equation)। কোন্

শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কিছুটা সেই শিল্পেই ব্যবহৃত হইতে পারে (যেমন, কৃষিক্ষেত্রে বীজ ধান); কিছুটা অন্য শিল্পসমূহে নিযুক্ত হইতে পারে ; এবং কিছুটা ভোগে ব্যবহৃতও হইতে পারে। এইরূপে প্রতিটি শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কিরূপে এবং কয়টি শিল্পে ব্যবহৃত হয় অথবা ভোগ কার্যে চলিয়া আসে—ইহা জানা যায় ব্যালান্স সমীকরণের দ্বারা। সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপন্ন ও উপকরণ কিরূপে, কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য যে বিশেষ ধরণের তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে উৎপত্তি স্থানের তালিকা (Matrix-table) বলে।

বিভিন্ন শিল্পের নির্ভরশীলতাঃ ব্যালান্স সমীকরণ ও কাঠামোগত সমীকরণ

অপরপক্ষে, কোনো শিল্পের উৎপন্নের কি অনুপাত অপর শিল্পের উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার জন্য চলিয়া যায় তাহার বিশ্লেষণকে কাঠামোগত সমীকরণ বলে। যেমন 'ক' শিল্পের $\frac{1}{5}$ অংশ উৎপন্ন দ্রব্য 'খ' শিল্পে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, 'গ' শিল্পে $\frac{3}{5}$ অংশ এবং ভোগের কাজে $\frac{1}{5}$ অংশ নিযুক্ত হইতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, কোনো শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য নিজে বা অপর শিল্পে তৎক্ষণাৎ নিয়োগ না করিয়া মূলধনী দ্রব্য হিসাবে মজুত করিয়া রাখিয়া দিতে পারে, ভোগকারীরাও উহাকে তখনই সরাসরি ভোগের কাজে না লাগাইয়া কিছুটা জমাইয়া রাখিতে পারে।

যাহাই হউক, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন করিতে হইলে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহারা কোথা হইতে আসে এবং সমাজের সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও উপকরণ সংগ্রহ কিরূপে পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেই পরিকল্পনার সকল বিষয়ের লক্ষ্য ধার্য করা সম্ভব হয় এবং এইরূপেই পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভবপর।

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার

Rate of Economic Growth

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ পদ্ধতি হইল সমাজের সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের গতিবৃদ্ধি করা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার ক্রমাগত স্তরে স্তরে বাড়াইয়া চলা। ইহা সম্ভব হয় যদি সর্বদা মূলধন-গঠনের হার দ্রুততর

করা হয়। আজ যে মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইল তাহার সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিয়া সেই অধিক উৎপাদন হইতে বেশি পরিমাণ সরাইয়া লইয়া আসিয়া পুনরায় অধিকতর মূলধন গঠিত হইবে এবং উহার সাহায্যে দ্রব্যোৎপাদন আরও বাড়ান চলিবে। এইরূপে পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তর পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় অধিকতর উৎপাদনশীল, অধিকতর উদ্বৃত্ত (Surplus) সৃষ্টিকারী এবং অধিকতর মূলধন-গঠনকারী। দ্রব্যোৎপাদন কিছু উদ্বৃত্ত সৃষ্টি—অধিক মূলধনের নিয়োগ—অধিকতর দ্রব্যোৎপাদন—অধিকতর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি—অধিকতর মূলধনের নিয়োগ; এইরূপ চক্রাকৃতি উদ্ঘূর্ণমান (Upward spiral movement) গতিধারায় উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িতে থাকে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি সঞ্চার হয়। উন্নয়নের এই গতি নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর। প্রথমতঃ, মূলধন ও উৎপন্নের অনুপাত (Capital-output ratio)।

ক্রমবৃদ্ধি কাহাকে বলে

উহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর ঃ মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদন ক্ষমতা

মূলধন উৎপন্নের অনুপাত কাহাকে বলে? যেমন, বৎসরের মধ্যে যদি ১০০ মূলধন হইতে উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ হয়, তাহা হইলে মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত হইল ১০০ ঃ ২৫; অর্থাৎ $\frac{\text{মূ}}{\text{উ}}\left(\frac{C}{O}\right)$ = ৪ ঃ ১। এই মূলধন-উৎপন্নের বিপরীত হইল, অর্থাৎ $\frac{\text{উ}}{\text{মূ}}\left(\frac{O}{C}\right)$ হইল উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত; অর্থাৎ কি পরিমাণ মূলধনের নিয়োগ কিরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবৃদ্ধির গতি নির্ভর করে দেশে মূলধনের পরিমাণের উপর। দেশে আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ সকল স্তরে সকল সময়ে স্থির থাকে না, বরং আয়-স্তর বাড়িতে থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাতকে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত দিয়া গুণ করিলে সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার নিরূপণ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ, ক্রমবৃদ্ধির হার = পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে $\frac{\text{সঞ্চয়}}{\text{আয়}} \times \frac{\text{উ}}{\text{মূ}}$।

ক্রমবৃদ্ধির হার নিরূপণ

ক্রমবৃদ্ধির হার পরিমাপের এই সূত্রটির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও বিচারে কিছুটা সীমাবদ্ধ তাৎপর্য আছে। উৎপাদন-পদ্ধতি বা উৎপাদন সূত্রে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ কি অনুপাতে মূলধন নিয়োগ করিলে ক্রমবৃদ্ধির হার বর্ধিত করা যায়, তাহা নির্বাচন করিতে পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষকে এই সূত্রটির দিকে নজর রাখিতে হয়। দেখা যায়, মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত বেশি হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত কম এবং মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত কম হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বেশি। যেমন, যদি মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত হয় ৪ : ১, তাহা হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বা $\frac{\text{উ}}{\text{মূ}}$ হইল $\frac{১}{৪}$। অপরপক্ষে, যদি মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত হয় ২ : ১, তাহা হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বা $\frac{\text{উ}}{\text{মূ}}$ হইল $\frac{১}{২}$। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কম মূলধন নিয়োগ করিয়া একই উৎপন্ন পাওয়া গেলে বা মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত কম হইলেই উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বেশি। আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাত সমান ও স্থির ধরিয়া লইলে যে পদ্ধতিতে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বেশি তাহারই প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতেই ক্রমবৃদ্ধির হার অধিক পাওয়া যাইবে। যেমন, $\frac{\text{সঞ্চয়}}{\text{আয়}}$ যদি $\frac{২০}{১০০}$ হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধির হার হইল প্রথম ক্ষেত্রে, $\frac{২০}{১০০} \times \frac{১}{৪} = \frac{১}{২০}$। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $\frac{২০}{১০০} \times \frac{১}{২} = \frac{১}{১০}$। অর্থাৎ, পরিকল্পনার সুরুতে জাতীয় আয় ৫০০ ধরিয়া লইলে পরিকল্পনার স্তরের শেষে প্রথম ক্ষেত্রে জাতীয় আয় ৫০০ $\times \frac{১}{২০}$ = ২৫ বৃদ্ধি পাইল ; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৫০০ $\times \frac{১}{১০}$ = ৫০ বৃদ্ধি পাইল।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে এই সূত্রটির তাৎপর্য

বাস্তবক্ষেত্রে, পরিকল্পনাকালে দেশের মধ্যে সর্বদাই আয়, সঞ্চয়, মূলধন ও উৎপাদন-পদ্ধতি প্রভৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে ; সুতরাং ক্রমবৃদ্ধির হার পরিমাপের উপযোগী কোন স্থির ও নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া যায় না। তবে ইহা হইতে অনেকে পরিকল্পনা-কালীন ক্রমবৃদ্ধির গড়হার (Average rate of growth within the plan period) বাহির করিতে চেষ্টা করেন এবং ইহার দ্বারা বৃদ্ধির রূপও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন।

কেন নির্দিষ্ট ক্রমবৃদ্ধির হার মাপা যায় না

এইরূপে পরিকল্পনার সময়ে (ক) সঞ্চয় বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং (খ) উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই দুই-এর ক্রমাগত বৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট, কারণ মূলধন বাড়িলেই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এবং উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি (তৎক্ষণাৎ মজুরী না বাড়াইলে) অধিক উদ্বৃত্ত ও সঞ্চয় সৃষ্টি করিতে পারে।

সঞ্চয় ও উৎপাদন-ক্ষমতা পরস্পরকে বাড়াইয়া তোলে

উভয়ের এইরূপ পরস্পর নির্ভরশীল সম্মিলিত অগ্রগমন জাতীয় আয়কে ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে থাকে। পরিকল্পনার সুরুতে উৎপাদন-ক্ষমতা মোটামুটি স্থির থাকে, তাই মূলধন নিয়োগ বাড়াইতে হয়। এই বর্ধিত নিযুক্ত মূলধন উৎপাদন-ক্ষমতা ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইয়া অগ্রগতির বেগ সৃষ্টি করিতে থাকে।

ব্যালান্সসহ অথবা ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি
(Balanced or Unbalanced growth)

অনুন্নত দেশসমূহে দেখা যায়, পরিকল্পনার প্রথম স্তরে মূলধনের পরিমাণ কম এবং সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত, মূলধন-গঠন সব কিছুর হার কম; ফলে উৎপাদন-ক্ষমতাও কম। এই সকল দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির

ব্যালান্সসহ বা ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রম-বৃদ্ধির পথ কাহাকে বলে

গতিবেগ সুরু করিতে হইলে, হয় বিদেশ হইতে মূলধন ঋণ করিয়া আনিতে হয়, অথবা ঘাটতি-ব্যয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াইয়া প্রথম দিকে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হারে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে হয়। প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শিল্পে ও ক্ষেত্রে অগ্রগতির হারে ভারসাম্য রক্ষা করা চলে না; দেশের উপাদান ও উপকরণসমূহ মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক অনুপাতে নিয়োগ করিতে হয়। এই পদ্ধতিকে ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি বলে।

বলা যায়, যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থি অর্থাৎ সকল শিল্প বা উৎপাদনক্ষেত্র একই অনুপাতে বাড়িতে থাকে, ফলে আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ সমান হারে বাড়ে, তাহাকে ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি (Balanced Growth) বলা হয়। কিন্তু ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির পথে পরিকল্পনার নির্ধারিত সময়ের

মধ্যে ভোগের তুলনায় আয় এবং আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বেশী হারে হইতে থাকে; ভোগ্য দ্রব্যোৎপাদনকে পিছনে ফেলিয়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন অধিক হারে অগ্রসর হইতে থাকে। উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িলেও মজুরীর হার সেই তুলনায় বাড়ান হয় না, অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও মূলধন-গঠন চলিতে থাকে। বিভিন্ন মূলধনী দ্রব্য একে অন্যের উৎপাদন বাড়াইয়া তোলে, একের বৃদ্ধি অন্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়া সকল মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া চলে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধি ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ায়, বর্ধিত ইস্পাত উৎপাদন বিদ্যুৎ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেয়। উভয়ে মিলিয়া সিমেন্ট ও রেলপথের উৎপাদন বাড়াইলে ইহাদের বর্ধিত উৎপাদনের ফলে বিদ্যুৎ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িতে থাকে। এইরূপে মূলধনী শিল্পসমূহের ত্বরান্বিত বৃদ্ধি (accelerated growth) পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগের বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে, সোভিয়েট রাশিয়ার অতি দ্রুত ক্রমবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষতঃ অনুন্নত দেশসমূহে গৃহীত হইতেছে। কিছুকাল পরে বর্ধিত মূলধনী দ্রব্যের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, উভয়ের বৃদ্ধির হারে ব্যালান্স আসিবে; সেই স্তর হইতে পরবর্তী ভবিষ্যৎ স্তরসমূহে ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি (Balanced Growth) চলিতে থাকিবে। সুতরাং, পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগের ব্যালান্সবিচ্যুতির পদ্ধতি (unbalancing method) গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির বর্তমান গতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গতি উভয়েরই বেগ দ্রুততর হয়।

কোন্ পদ্ধতি গৃহীত হইবে তাহা নির্ভর করে আকাঙ্খিত উন্নয়নের হারের উপর

এইরূপ ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির প্রধান বিপদ হইল মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা। মূলধনী দ্রবোৎপাদনে অধিকহারে বিনিয়োগ দেশে কর্মসংস্থান ও মোট আয় বাড়ায় বটে, কিন্তু ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন অধিক হারে না বাড়াইবার ফলে ব্যয়োপযোগী আয় (Disposable income) অধিক সৃষ্টি হইয়া মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (Inflationary gap) বাড়াইয়া দেয়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে সমাজে কম মূলধনের সাহায্যে (বা দেশে জন-সংখ্যাধিক্য থাকিলে শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা) প্রধান ভোগ্যদ্রব্যসমূহের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। তাহা ছাড়া, দাম-নিয়ন্ত্রণ (Price-control), রেশনিং (Rationing) প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা

ব্যালান্সবিচ্যুত পথের বিপদ কি এবং তাহা রোধের উপায় কি

মুদ্রাস্ফীতির প্রসার অবরোধ করার চেষ্টা করা হয়। আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করাইবার উদ্দেশ্যে প্রচার, স্বেচ্ছামূলক বা বাধ্যতামূলক ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন, পরোক্ষ করের পরিমাণ ও হার বাড়ান হয়।

মূলধন-গঠনের সমস্যা (Problem of Capital formation)

আয় হইতে সঞ্চয় বা ভোগব্যয় কমাইয়া উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়—সুতরাং উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রচার, ঋণ গ্রহণ, করস্থাপন প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে উদ্বৃত্ত সরাইয়া আনা চলে। রাষ্ট্রীয় শিল্প হইতে প্রাপ্ত মুনাফা নূতন মূলধন হিসাবে গৃহীত হয়। দেশে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যত বেশী থাকে এবং রাষ্ট্রের সহিত জনসাধারণ যত ঘনিষ্ঠ থাকে—এই সকল পদ্ধতি উদ্বৃত্ত সংগ্রহে তত অধিক সাফল্য লাভ করে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য জনসাধারণের তুলনায় একত্র-সংগঠিত সমবায়-সমিতি বা ধনীব্যক্তিদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা বিশেষ সুবিধাজনক। অনুন্নত দেশসমূহে সোনার গহনা প্রভৃতিতে উদ্বৃত্ত জমানো থাকে, উহাদের বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে টানিয়া লওয়ার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, দেশে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যাদির ক্রয় সংকুচিত করিয়া সেই অর্থকে সরাইয়া আনা সম্ভবপর। ইহা ব্যতীত সমাজে সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত (Potential Surplus) থাকিতে পারে। অনেকে বলেন যে, দেশে অব্যবহৃত জনশক্তিই সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের ন্যায়; (দেশে বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি থাকিলে বা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে গৃহকর্মে ভৃত্যাদির ন্যায় কাজে নিযুক্ত থাকিলে) শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করা এরূপক্ষেত্রে সুবিধাজনক এবং উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সহজ; যন্ত্রের কাজ অধিক পরিমাণে শ্রমিক খাটাইয়া করিতে পারিলে জনশক্তি নিজেই মূলধনরূপে কাজ করে এবং দেশে মূলধন-গঠন সম্ভব করিয়া তোলে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ

জনশক্তিই সম্ভাব্য আধার

এইরূপে যে সকল দেশে জনাধিক্য থাকে সেখানে জীবনধারণোপযোগী ক্ষেত্র (Subsistence Sector) উন্নত করিয়া স্তরে স্তরে মূলধন-গঠন করিতে হয়। পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে পূর্বাপেক্ষা অধিক জনশক্তিকে মূলধনীদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিতে হয়, এবং এইরূপে পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় প্রত্যেকটি পরবর্তী স্তরেই মূলধন-গঠন বেশি হারে হইতে থাকে।

স্তরে স্তরে পরিকল্পিত মূলধন গঠনের পথ

যেমন, দেশের জনসংখ্যা ১০০, সকলেই কৃষিতে নিযুক্ত, আয় হইতে সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত হয় না, দেশে দারিদ্র্য থাকায় সকল আয়ই ভোগে ব্যয় হইয়া যায়, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থায় কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশ নিছক জনশক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই মূলধন-গঠন সুরু করিল। ১০০ জন লোকে মিলিয়া, ধরা যাউক, ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করে। বাহির হইতে কিছু উন্নত ধরণের কৃষির যন্ত্রপাতি পাইলে সেই যন্ত্রের সাহায্যে যদি ৯০ জন লোক ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে এই ১০ জন লোককে সরাইয়া আনিয়া প্রথমে কৃষির উন্নতির উপযোগী মূলধন উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। ইহাদের সাহায্যে কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির উপযোগী মূলধনী দ্রব্য কিছুটা বাড়িলে ৮০ জন লোককে কৃষিতে নিযুক্ত রাখিয়া (তাঁহারাই এখন বর্ধিত যন্ত্রপাতির বা মূলধনের সাহায্যে ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করিতে পারে) আরও ১০ জনকে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা চলে। এইরূপে স্তরে স্তরে ক্রমশঃ অধিকতর হারে মূলধন-গঠন সম্ভবপর।

যদি বাহির হইতে প্রথমে কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া না যায় তাহা হইলে, অথবা, এই মূলধন-গঠনের ধারা দ্রুততর করিতে হইলে, অনেক সময় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন প্রথমদিকে কমিয়া যাইতে পারে। যেমন, প্রথমেই ১০ জন লোককে কৃষি হইতে সরাইয়া আনিয়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিয়োগ করা হইল। ৯০ জন পুরাণো পদ্ধতিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকায় উৎপাদন কমিয়া ৭২০ মণ অর্থাৎ ৮০ মণ ধান কম উৎপন্ন হইল। এই কম দ্রব্যই ১০০ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া

প্রথম দিকে ভোগ-সংকোচন করিতে হইতে পারে

দিতে হইবে, সকলের জীবন যাত্রার মান-ই পূর্বাপেক্ষা নামিয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সকলে এই ত্যাগ স্বীকারে রাজী হইবে, রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার দ্বারা যাহাতে সকলে ভোগ্য দ্রব্য পাইতে পারে, উহার ব্যবস্থা করা হইবে।

যতদিন না পর্যন্ত ১০ জন লোক কিছু মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ফেলে এবং এবং উহার অধিকাংশ কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হয়, ততদিন এই কৃচ্ছ্র সাধন চলিতে থাকিবে। যদি জনসাধারণ আরও অধিক কাল ত্যাগ স্বীকারে রাজী থাকে, তাহা হইলে পরবর্তীস্তরেও কৃষির উৎপাদন না বাড়াইয়া আরও অধিক শ্রমিককে, যেমন ৩০ জনকে সরাইয়া আনিয়া মূলধন-গঠনে নিয়োগ করা হইবে; এই ৭০ জন শ্রমিক ৩০ জনের দ্বারা উৎপন্ন যন্ত্রের দ্বারা অন্ততঃ ৭২০ মণ উৎপাদন বজায় রাখার চেষ্টা করিবে, নিজেদের এবং মূলধনী ক্ষেত্রে নিযুক্ত ৩০ জনের জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকিবে; জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে না বটে, কিন্তু মূলধন-গঠনের পরিমাণ ও গতি বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ, কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্বৃত্তই মূলধন-গঠন সম্ভব করিয়া তুলিবে। এই কারণেই অপূর্ণোন্নত দেশে কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম স্তর। তবে যে কোন উপায়ই গ্রহণ করা হউক না কেন, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কিছুটা অংশ (wage-goods) মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকা চাই, অথবা তাহারা নিজেরাই ভোগের পরিমাণ, অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান তৎক্ষণাৎ বাড়াইতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

ভোগ্যদ্রব্যের গুণক (Consumption—Goods Multplier)

কিছুকাল পূর্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক (ভকিল ও ব্রহ্মানন্দ)[১] এই বিশ্লেষণকে আরও কিছু দূর অগ্রসর করাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, গ্রাম বা কৃষি হইতে লোক সরাইয়া আনিতে গেলে এক বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। এই সকল লোকেরা প্রচ্ছন্ন বেকার—ইহাদের কৃষিকার্য হইতে সরাইয়া আনিলেও উৎপাদন কমিবে না, (অর্থাৎ তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা (বা Marginal Productivity শূণ্য। এই কথা ঠিকই, কিন্তু গ্রামে থাকিতে তাহারা যে পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য (wage-goods) ব্যবহার করিত, সহরে বা শিল্পে কাজ করিলে তাহাদের উহাপেক্ষা অধিক ভোগ্যদ্রব্য দরকার হইতে পারে। গ্রামে একবেলা

[১] *Vakil and Brahmananda*—Planning for an expending Economy,

খাইয়া, কোনমতে একখানা মোটা কাপড়েই তাহার চলিতে পারিত, কিন্তু সহরে আসিলে উহাপেক্ষা কিছু বেশী ভোগ্যদ্রব্য দরকার হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহারা পূর্বে কৃষিক্ষেত্রে যে পরিমাণ ভোগ করিত এবং বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যে পরিমাণ ভোগ করিবে, ইহাদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক দেখা যাইবে। ইহাকেই ভোগ্যদ্রব্যের ফাঁক (Consumption Goods Gap) বলে। এই ফাঁক ভরাট করার মত ভোগ্যদ্রব্য দেশে উৎপন্ন না হইলে জীবন ধারণের স্তর হইতে লোক সরাইয়া মূলধন-গঠন সম্ভব হইতে পারে না।

এইরূপ সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অসুবিধা—ভোগদ্রব্যের ফাঁক

প্রচ্ছন্ন বেকারটি, মনে করা যাউক, ৫০ টাকা মূল্যের ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করিত; মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিলে সে ১০০ টাকা মূল্যের ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার করিবে। মনে করা যাউক, দেশের বাহির হইতে কোন মতে একজন শ্রমিককে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করার উপযুক্ত ভোগ্য দ্রব্য (১০০ টাকা পাওয়া গেল। সেই ভোগ্যদ্রব্যের জোরে কৃষিক্ষেত্র হইতে একজন প্রচ্ছন্ন বেকারকে টানিয়া লওয়া হইল। পূর্বে সে যে ৫০ টাকার দ্রব্য ভোগ করিত তাহা এখন বাঁচিয়া যাইতেছে (যদি তাহার আত্মীয় স্বজনেরা নিজেদের ভোগ এখনই না বাড়াইয়া ফেলে)। এই ৫০ টাকাব ভোগ্য দ্রব্য হাতে লইয়া আর একজন নতুন প্রচ্ছন্ন বেকারকে সরাইবার সুবিধা আপনা আপনি সৃষ্টি হইল, কারণ তাহাকে সরাইলেও ৫০ টাকার ভোগ্য দ্রব্য বাঁচিয়া যাইবে। সুতরাং পূর্বের ব্যক্তির ৫০ টাকার ভোগ্য দ্রব্য এবং পরবর্তী ব্যক্তির ৫০ টাকার ভোগ্য দ্রব্য মিলিয়া আর একজন প্রচ্ছন্ন বেকারকে শিল্পে নিয়োগের মত রসদ পাওয়া গেল। অর্থাৎ ১ জন লোককে প্রথমে সরাইবার ফলে আরও একজনকে সরাইবার মত ক্ষেত্র সৃষ্টি হইল। প্রাথমিক কর্মসংস্থানের সহিত এইরূপে মোট বর্ধিত কর্মসংস্থানের অনুপাতই হইল ভোগ্য দ্রব্যের গুণক (বা Consumption Goods Multiplier)। যেমন, এই উদাহরণে, শিল্পক্ষেত্রে একজন শ্রমিক নিয়োগের উপযোগী ভোগ্যদ্রব্যের সংস্থান হইলে আমরা আর একজন নিয়োগ করিতে পারি।[১]

ভোগ্য দ্রব্যের গুণক কাহাকে বলে

এই তত্ত্ব অনেকাংশে সঠিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন ধারণের

[১] ভোগ্য দ্রব্যের গুণকের আয়তন নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্যের ফাঁকে বা Consmption Goods Gap-এর পরিমাণের উপর।

দ্রব্যোৎপাদন স্তর (Subsistence sector) বেসরকারী ছোট ছোট চাষীর মালিকানায় বা ফাটকাদার বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎচাষীর মালিকানায় বা মুনাফাকারী বৃহৎচাষীর নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত সমবায়-সমিতির হাতে রাখিয়া এই পদ্ধতি কার্যকরী করা যায় না। যেমন, একজন প্রচ্ছন্ন বেকার সরিয়া আসিলে তাহার ফেলিয়া আসা ভোগ্যদ্রব্য রাষ্ট্রের হাতে এই কাঠামোতে কিছুতেই চলিয়া আসিতে পারে না। কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার আত্মীয় স্বজন নিজেদের ভোগের পরিমাণ বাড়াইবেই, অথবা যেহেতু ছোট চাষী গরীব সেই কারণে বড় চাষী বা খাদ্য ব্যবসায়ীদের হাতে সেই দ্রব্য চলিয়া আসিবে। ইহারা খাদ্যের ফাট্‌কাদারী সুরু করিয়া দাম বাড়াইবে এবং মূলধন-গঠনের পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিবে।[৩]

এই তত্ত্ব কার্যকরী করার অসুবিধা

সুতরাং প্রচ্ছন্ন জনশক্তি খাটাইয়া সম্ভাব্য উদ্বৃত্তকে প্রকৃত মূলধনে রূপান্তরিত করার এই পদ্ধতির দুইটি প্রধান অসুবিধা আছেঃ (ক) প্রথমে কোথা হইতে একজন লোক সরাইবার মত ভোগ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, (খ) প্রচ্ছন্ন বেকারদের ফেলিয়া আসা ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা যায় কি উপায়ে। এই দুইটি অসুবিধাই দূর হইতে পারে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়; মিশ্র কাঠামো বা রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার দ্বারা নহে। প্রকৃত সমাজতন্ত্রেই অনুৎপাদক শ্রেণীর, সামন্ত তান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক, কাঠামোর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পরভোজী শ্রেণীর অতি-ভোগ (excess consumption) কমাইয়া প্রথমেই কিছুটা ভোগ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে সমবায় চাষ পদ্ধতির দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের উৎপাদন ও ভোগ পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে উৎসাহ আবেগ ও ত্যাগ সৃষ্টি হয়, ভোগ্য দ্রব্যের কম ব্যবহার ও রাষ্ট্রের হাতে জমা দেওয়া জাতীয় দেশপ্রেমমূলক কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কারণের ফলেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভোগ্য দ্রব্যের অভাব ঘটে না। একমাত্র সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর পরিবর্তন করিয়া সমাজতান্ত্রিক সংগঠন গড়িয়া তোলাই তাই মূলধন-গঠন দ্রুততর করার অন্যতম প্রধান পথ।

দুইটি মূল বাধা দূর হইতে পারে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়

একমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত পরিকল্পিত উদ্বৃত্তে পরিণত হইতে পারে

[৩] বর্তমানে ভারতের ক্ষেত্রে আমরা এইরূপ ঘটনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ নীতি
(Principle of allocation of Surplus)

উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় হইতেই ক্রমবৃদ্ধি ঘটে না, উহাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে (sector) বিনিয়োগ করা দরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি অনুপাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা হইবে, পরিকল্পনায় তাহা নির্ধারিত থাকে। মূলধনের এই বিনিয়োগ-বিন্যাস (Investment-pattern) কি নীতি অনুযায়ী করিতে হয় ?

প্রথমতঃ, ইহা সকলেই জানেন যে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য ও গতিবেগ অনুযায়ী বিনিয়োগ-বিন্যাস স্থির করিতে হয়। যদি ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধির

১। ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য ও গতিবেগ

পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সকল শিল্প বা উৎপাদন ক্ষেত্র যাহাতে সমহারে বাড়ে সেইরূপ বিনিয়োগ-বিন্যাস দরকার। যদি ব্যালান্স-বিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির পথ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্য ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি রাখিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বিন্যাস নির্ধারণ করার ব্যাপারে উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগতপদ্ধতি (technological method) পূর্বেই স্থির

২। যন্ত্রকৌশলের দিক

করিয়া লইতে হয়। মূলধন-প্রগাঢ়, জটিল ও উন্নত ধরণের যন্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে, অথবা শ্রম-প্রগাঢ় সরল পদ্ধতি উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইবে—ইহাই বিচার্য বিষয়। কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত ইহা নির্ভর করিবে (ক) কিরূপ অগ্রগতির হার বাঞ্ছনীয়, (খ) মূলধনের পরিমাণ, (গ) যন্ত্রজ্ঞানী শ্রমিকের পরিমাণ, প্রভৃতি বিষয়ের উপর।

তৃতীয়তঃ, পরিকল্পিত বিনিয়োগ আরও তিনটি বিষয়ের দিকে নজর রাখিয়া উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করিবেঃ (ক) জীবিকার দিক,

৩। জীবিকার দিক, সময়ের দিক, উৎপাদন অঞ্চলের দিক

(খ) সময়ের দিক এবং (গ) উৎপাদন অঞ্চলের দিক। (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে বহু নূতন ধরণের জীবিকা ও কাজকর্মের দরকার হয়, সমাজে সেই ধরণের জীবিকা ও কাজকর্মের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা মনে রাখিতে হইবে। (খ) পরিকল্পনা অগ্রসর হইবার প্রত্যেক স্তরেই বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি বদলাইতে থাকে। প্রথম হইতেই এই দিকে নজর রাখিতে হয়। প্রত্যেকটি

স্তর অতিবাহিত হইবার পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াইতে বা কমাইতে হইতে পারে বা বিনিয়োগের ধরণ বদ্‌লাইতে হইতে পারে বা একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগজাত দ্রব্য অপর ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত হইতে পারে—এইরূপ অবস্থায় বিভিন্ন বিনিয়োগের সময় বিচার করা খুবই প্রয়োজন। (গ) বিনিয়োগের অঞ্চল-বিচার দরকার এই কারণে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে বা শিল্পের ঘনসন্নিবেশের (Density) ত্রুটি দূর করার জন্য বা শত্রুর হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা করিতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
India's First Five Year Plan

১৯১৭সালের সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে রুশ জনসাধারণের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি—ইহারাই আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে আগ্রহ আনিয়া দিয়াছে। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত না হইলে পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী কথা সম্ভবপর হয় না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যাহাতে দেশের গরীব জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে এই জন্য জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন দলের নেতারা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা প্রচার করিতেন। জীবন যাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজনীয়, এইরূপ প্রচারের সাহায্যেই তাহারা উপযুক্ত জনসমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বে পরিকল্পনা ছিল রাজনৈতিক প্রচার

১৯৩৮ সালে ভারতের কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

---

[১] যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বাড়িলেও প্রধানতঃ যন্ত্রপাতির অভাবে (আমদানি প্রায় বন্ধ ছিল বলিয়া এবং দেশের মধ্যে উহা নাই বলিয়া) ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ব্যাহত ছিল। তাই বোম্বাই পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর ছিল। বোম্বাই পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আমদানী রপ্তানী ব্যবসাদাররাও তাই সমর্থন করিয়াছিলেন।

শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ণ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না থাকায় এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতন্ত্র বিরোধী বিভিন্ন ধরণের মতবাদ প্রচলিত থাকায় সেই কমিটি কোন সুগঠিত পরিকল্পনা গঠন করিতে পারে নাই, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা পর্যন্ত সেই কমিটির কাজ আবদ্ধ ছিল।

কংগ্রেসের পরিকল্পনা

ভারতে পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত বিকাশের জন্য মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ইহা বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ সালে বোম্বাই হইতে কয়েকজন পুঁজিপতি মিলিয়া বোম্বাই পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।[১] এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ১৫ বছরের মধ্যে ১০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাথা-পিছু আয় দ্বিগুণ করা। উহার পরে প্রকাশিত হয় এম্, এন্ রায়ের গণ পরিকল্পনা (People's Plan)। ১৫০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়া ১০ বছরের মধ্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটান-ই ইহার লক্ষ্য ছিল। এই সময়ে ওয়ার্ধা হইতে শ্রী এস, এন, আগরওয়ালা-র 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' (Gandhian Plan) প্রকাশিত হয়। যন্ত্রশিল্পকে বাদ দিয়া প্রধানতঃ কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়া বিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্য ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা এই পরিকল্পনায় বলা হয়। যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন ও পরিকল্পনা (Post-war economic reconstruction and development) সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ করেন। একমাত্র স্বাধীনতা পাইবার পরেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের উপযোগী সম্ভাবনা গড়িয়া উঠে। কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলি প্রবল থাকায় মূল্যবান কয়েকটি বৎসর বিনা পরিকল্পনাতেই কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে কংগ্রেস দল মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো স্থাপন করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ১৯৫০ সালে ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আলাপ আলোচনার জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা রচিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে গৃহীত হয়।

বোম্বাই পরিকল্পনা

অন্যান্য পরিকল্পনা

প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার
(Summary of the First Plan)

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ধরা হইয়াছিল। চূড়ান্ত পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে সরকারীক্ষেত্রে ২০৬৮'৮ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক ব্যয় ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকার নূতন বিনিয়োগ করা হইবে ইহা স্থির হইয়াছিল। পরে পরিবর্তিত করিয়া সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হইবে এইরূপ ধরা হইয়াছিল। সরকারীক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নের খাতে কত ব্যয় করা হইবে এবং তাহা মোট ব্যয়ের কত অংশ তাহা নিম্নে তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল ঃ

টাকার হিসাব

বিষয়	কোটি টাকা	শতকরা কত অংশ
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৩৫৪	১৪'৯
জলসেচ ও বিদ্যুৎ	৬৪৭	২৭'২
শিল্প ও খনি	১৮৮	৭'৯
পরিবহন ও সংযোজন	৫৭১	২৪'০
সমাজ সেবা ও পুনর্বাসন	৫৩২	২২'৪
বিবিধ	৮৬	৩'৬

কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যয় করা হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ জিনিসের উৎপাদন কতখানি বাড়াইতে হইবে তাহার হিসাবও চূড়ান্ত পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছিল। নীচে উহার তালিকা দেওয়া হইল ঃ

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
১। কৃষি		
খাদ্য শস্য (মিলিয়ন টন)	৫২'৭	৬১'৬
তুলা (লক্ষ বেল্)	২৯'৭	৪২'২
পাট (লক্ষ বেল্)	৩৩'০	৫৩ ৯
ইক্ষু (মিলিয়ন টন)	৫'৫	৬'৩
২। জলসেচ ও শক্তি		
জলসেচ (মিলিয়ন একর)	৫০'০	৬৯'৭
৩। শিল্প		
কাঁচা লোহা (লক্ষ টন)	৩'৫	৬'৬
ইস্পাত (লক্ষ টন)	৯'৮	১৩'৭
সিমেণ্ট (লক্ষ টন)	২৬'৯	৪৮'০
সূতা (মিলিয়ন পাউণ্ড)	১১৭৯	১৬৪০
মিল বস্ত্র (মিলিয়ন গজ)	৩৭১৮	৪৭০০

তাঁত বস্ত্র (মিলিয়ন গজ)	৮১৬	১৭০০
পাট শিল্প (হাজার টন)	৮৯২	১২০০
সাইকেল (হাজার)	১০১'০	৫৩০'০
যন্ত্র তৈল (মিলিয়ন গ্যালন)	৪'৭	১৮'০
৪। পরিবহন		
জাহাজী পরিবহন		
উপকূলীয় (হাজার টন)	২১১'০	৩১৫'৯
দূর সামুদ্রিক "	১৭৩'৫	২৮৭'০
রাস্তা		
জাতীয় রাজপথ (হাজার মাইল)	১১'৯	১২'৫
রাজ্য পথ (হাজার মাইল)	১৭'৬	২০'৬

বিভিন্ন বিষয়ে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন—এই কার্যসূচী সফল করার জন্য পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষভাবে সমাজের উপকরণগুলি সংগ্রহ না করিয়া, উহাদের দাম অনুযায়ী অর্থের সাহায্যে খোলা বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনে খাটান হইবে এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল। বস্তুগত পরিকল্পনার (Physical Planning) বদলে অর্থগত পরিকল্পনা (Fina cial Planning) রচনা করা হইয়াছিল। কোথা হইতে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ আসিবে, তাহা পরিকল্পনায় বলা হয় নাই, ১৭০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নীচে ইহা তালিকার আকারে দেওয়া হইল :

অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা

চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	৫৬৮ কোটি টাকা
রেলওয়ে উদ্বৃত্ত	১৭০ " "
জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১১৫ " "
স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি	২৭০ " "
সরকারের নিকট জমা প্রভৃতি	১৩৫ " "
বিদেশী সাহায্য	১৫৬ " "
ঘাটতি ব্যয়	২৯০ " "
	১৭০৪ " "

আরও ৬৭৪ কোটি টাকা কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে সেই সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা ছিল না। বলা হইয়াছিল যে আরও বিদেশী সাহায্য, আভ্যন্তরীণ কর-বৃদ্ধি বা ঋণ সংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয় হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইবে।[২]

[২] This gaps has to be met from further external resources, or in the absence of it, by additional taxation and borrowing and from deficit financing.—*First five year Plan.*

এইরূপ ব্যয় করিতে থাকিলে পাঁচ বছরে (১৯৫৬ সালের প্রথমে) ভারতের জাতীয় আয় ১০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ সালে ৯০০০ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০০০০ কোটি টাকায় পরিণত হইবে (অর্থাৎ ১১% বৃদ্ধি পাইবে)। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, বর্ধিত আয়ের ২০% যদি লোকেরা সঞ্চয় করে এবং বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করে, তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ অব্যাহত থাকিতে পারিবে। ফলে, মোট জাতীয় আয় বাৎসরিক ২% হারে বাড়িলেও সমাজের মোট ভোগব্যয় ততদূর বাড়িতে পারিবে না। তাহা ছাড়া, ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও কিছু বাড়িবে তাই মাথা-পিছু আয় ততটা বৃদ্ধি পাইবে না। তাই বলা হইয়াছিল, প্রথম পরিকল্পনাতেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান খুব বেশি উন্নত হইবে না, কিন্তু দেশের উৎপাদন-যোগ্যতা (production potential) বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় আয় ও মাথা-পিছু আয়ের উপর ইহার প্রভাব

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কৃষি (First Five year plan and Agriculture)

প্রথম পরিকল্পনার কার্যসূচীর অগ্রাধিকার তালিকা (scheme of priorities) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কৃষির উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। মোট ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ৩৫৪ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ ও সেচ খাতে ৬৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। অর্থাৎ মোট ১০০১ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ৪২·১%) বরাদ্দ হইয়াছিল কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। ভারতের কৃষি যাহাতে প্রকৃতির খেয়াল খুসীর উপর নির্ভর করিয়া না থাকে সেইজন্য মোট ব্যয়ের প্রায় ২১% জলসেচের কার্যে খাটান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, বলা হইয়াছিল যে, মোট জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রের (Irrigated area) পরিমাণ ৫ কোটি একর হইতে বাড়িয়া ৬·৯৭ কোটি একর হইবে।

কৃষির উপর গুরুত্ব—বরাদ্দের হিসাব

জলসেচ ছাড়াও প্রথম পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া প্রকৃত চাষীর

নিজের হাতে জমি ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছিল। বড় চাষীরা নিজেরা জমি চাষ করে না, তাই একজন চাষী কি পরিমাণ জমি নিজের মালিকানায় রাখিতে পারে তাহার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামাঞ্চলের জমিদারী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ দূর হইবে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের হার কমিয়া আসিবে, রাষ্ট্রের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। সমবায় সমিতি জোর করিয়া স্থাপিত হইবে না, তবে চাষীদের সমবায় সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়া হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল। নিম্নতম জমির পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলির একত্রীকরণ করিতে হইবে, স্বাধীন চাষী ৫ হইতে ১০ বৎসরের জন্য জমি চাষের পরোয়ানা পাইবে। শ্রমের উপযুক্ত মূল্য যাহাতে পায় এইরূপ খাজনার হার স্থির করা হইবে, উৎপন্ন ফসলের ¼ বা ⅕ ভাগের বেশি খাজনার হার হইবে না—ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সকল নীতি ঘোষিত হইয়াছিল।

ভূমি সংস্কারের নীতিসমূহ

পরিকল্পনা কমিশন কৃষির উন্নয়নের জন্য আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যেমন বড় ছোট মাঝারি জলসেচ ব্যবস্থা, গবেষণা কার্যের ফল প্রয়োগ করিয়া জমি উদ্ধার ও উহার প্রগাঢ়-চাষ করিতে হইবে। সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা গড়িয়া তুলিতে হইবে, গ্রামবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি ঘটাইতে হইবে। কৃষির জন্য ঋণ, কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজার প্রভৃতি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে; পশুপালন ও মিশ্র কৃষিকার্য (Mixed farming) সংগঠিত করিতে হইবে। বনাঞ্চলের প্রসারণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, এবং মৎস্য চাষকেন্দ্র (Fisheries) উন্নয়ন—এই সকল বিষয়ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল কার্যসূচী সফল হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৪% বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনও পরিকল্পিত লক্ষ্যে (Planned targets) পৌঁছাইতে পারিবে—এইরূপ বলা হইয়াছিল।

কৃষি উন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচী

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিকল্পনায় অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করার স্বপক্ষে কমিশন বহু যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, ভারতের

অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তিই হইল কৃষিকার্য, জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি হইতে আসে, শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক সরাসরি কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। গুরুত্বপূর্ণ সেই ভিত্তি সুদৃঢ় না করিয়া উহার উপরে বিরাট শিল্পের কাঠামো গড়িয়া তোলা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যের উৎপাদন না বাড়াইলে শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, গ্রামাঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীদের এবং নূতন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদাও মেটান দরকার। সুতরাং কৃষির উপর জোর দেওয়া খুবই প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম-কাঠামোর (Price-Structure) মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম-ই মুখ্য, উহার দামের পরিবর্তনের উপরেই (অন্ততঃ অপূর্ণোন্নত দেশে) অন্যান্য দ্রব্যের দামস্তরে উঠানামা নির্ভর করে। তাই খাদ্যশস্যের উৎপাদন না বাড়িলে উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে, আমদানী বাড়িয়া বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট বাড়িবে, এবং পরিকল্পনার ব্যয়-ভার বাড়িয়া যাইবে। চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো অংশে কিছুটা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি না হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বাড়ান সম্ভব হয় না। কৃষিতে কম মূলধনের সাহায্যে অল্প প্রচেষ্টাতেই কিছুটা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সম্ভব, শিল্পক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বাড়াইতে হইলে প্রথমে অধিক মূলধন দরকার। সর্বোপরি, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং সস্তায় মজুর পাইতে হইলে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

এইরূপ নীতির পক্ষে কমিশনের যুক্তি

অনেকে অবশ্য কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া সঠিক হইয়াছে এইরূপ মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের অভাব আছে—কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তাহার লক্ষণ। সুতরাং, ভারসাম্য ফিরাইয়া আনার জন্য শিল্পের দ্রুত বিস্তার বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, ভারতীয় কৃষির রূপ হইল জীবন-ধারণোপযোগী কৃষিকার্য (Subsistence farming), এই স্তর হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে হইলে ছোট খাট কৃষি সংস্কারের সাহায্যে সম্ভব হইবে না, ইহার জন্য দরকার যৌথখামার ব্যবস্থা, কৃষির যন্ত্রীকরণ, এবং মাটি ও মানুষের উৎপাদনক্ষমতা (productivity) বাড়ান। অল্প কিছু কৃষিসংস্কারের উপর জোর দিয়া তাই কোন লাভ নাই। সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

এই নীতি সঠিক হইয়াছে বলা চলে না, কারণ শিল্পের অল্প কিছু প্রসারই কৃষির উন্নয়ন ঘটাইতে পারে

ভিত্তিই হইল কৃষির উন্নতি, কিন্তু তাহার জন্য কৃষি-যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী শিল্পের বিস্তার প্রথমে করা দরকার। প্রথম পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ সাফল্য হইলেও দেশে দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি-প্রস্তুতি এই কারণেই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা ও শিল্প (The Plan and Industries)

বৃহৎশিল্প, খনি ও শিল্পগবেষণা কার্যের জন্য ১৩৯ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫.৮%) ধরা হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৪৯ কোটি টাকা (অর্থাৎ ২.১%) খরচ হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল। অর্থাৎ বৃহৎ ও কুটিরশিল্প সকল মিলিয়া মোট ১৮৮ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের ৮% ব্যয় হইবে এইরূপ ধার্য হইয়াছিল।*

সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ

সরকারী ক্ষেত্রে এই ব্যয় ছাড়াও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের জন্য ২৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে, কমিশন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। কমিশন আরও বলিয়াছিলেন যে, কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। দৈনন্দিন কাজ চালাইবার উপযোগী পুঁজি (working capital) ও অন্যান্য হিসাব ধরিয়া ৭৫০ কোটি টাকা বেসরকারী ব্যবসাদারেরা বিনিয়োগ করিবে এইরূপ মনে করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন মনে করিয়াছিলেন যে ইহার মধ্যে ৬০০ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যবসায়ীরা নিজেরাই সংগ্রহ করিবে এবং সরকার ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রকে সাহায্য করিবে।

বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ

পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার নীতি (Principle of Priority) স্থির করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে মূলধনী ও উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পগুলির প্রসার করিতে হইবে, যেমন লৌহ ও ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, সার উৎপাদনের কারখানা, ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও মেশিন টুল প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলি সম্বন্ধে (যেমন বস্ত্র, চিনি,

শিল্পক্ষেত্রের অগ্রাধিকার নীতি

* অগ্রগতির রিপোর্ট (Progress Report) হইতে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১০০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা, দরকারী যন্ত্রপাতি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং সরকারী দীর্ঘসূত্রতা—এই সকল কারণে শিল্পসম্প্রসারণের কার্যসূচী সফল হয় নাই।

সাবান, বনস্পতি, রং প্রভৃতি) স্থির হইল যে, নূতন কেন্দ্র স্থাপন না করিয়া বর্তমানের শিল্পগুলির অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার (unused capacity) পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, উৎপাদনের সেই সকল অংশে নূতন কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে উহাদের অভাব (rectifying the existing lacunae)। চতুর্থতঃ, যে সকল শিল্পে কিছুটা মূলধনী ব্যয় করা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর ভরসা

সরকারী ক্ষেত্রে বহু নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা করা হইয়াছিল। একটি নূতন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা, মহীশূর মেশিন টুল কারখানা, সিন্ধ্রী সার উৎপাদন কারখানা, বিশাখাপত্তনম্-এ জাহাজ নির্মাণ কারখানার উন্নতি, প্রভৃতি কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের ৮০% হইবে মূলধনী ও উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদনে, এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। এইরূপে শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেসরকারী শিল্পমালিকদের উপরই প্রধান ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ ৪২টি শিল্পের উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

শিল্প সম্প্রসারণের এইরূপ কার্যসূচী স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর প্রথম পরিকল্পনায় কোন জোর ছিল না। ইহার কারণ হিসাবে কমিশন বলেন, দেশে উদ্বৃত্ত বা মূলধন খুবই কম থাকায় কৃষি ও জলসেচের জন্য ব্যয় করিয়া শিল্পের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। শিল্পের উপর আরও জোর দিতে হইলে ঘাটতি ব্যয় অথবা করের হার, অথবা উভয়ই বাড়াইতে হইত। জনসাধারণের কষ্ট বাড়িয়া যাইত।

তাহাদের প্রসার ভালই হইয়াছে

প্রথম পরিকল্পনা কালের শেষে দেখা গিয়াছে, বেসরকারী শিল্প মালিকেরা পরিকল্পনা কমিশনের নীতি অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন। সরকারী ঋণ উঠান সত্ত্বেও বাজার হইতে তাঁহারা মূলধন তুলিয়া বিনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন। ১৯৪৬ সালকে ১০০ ধরিয়া ১৯৫০ সালে শিল্পোৎপাদনের সূচক ছিল ১০৫, ১৯৫৫ সালে উহা দাঁড়াইয়াছে ১৬১।

প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ (Financing the' First Five Year Plan)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। অর্থের হিসাবে দাম দিয়াই বিভিন্ন কার্যে জমি শ্রম ও মূলধন খাটান হয়, তাই অর্থের হিসাবেই এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযুক্ত এই ২৩৭৮ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? ঋণ করিয়া ও কর বাড়াইয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার মিলিয়া মোট ১২৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে। (ষ্টার্লিং ব্যালান্সের পরিবর্তে) ২৯০ কোটি টাকার নূতন নোট দেশে ছড়ান হইবে বা ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ৮৩০ কোটি টাকার ফাঁক (Gap) রহিয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে, বৈদেশিক সাহায্য অথবা আরও ঋণ অথবা আরও ঘাটতি ব্যয়—এই সকল উপায়ে এই ফাঁক পূরণ করা হইবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, ঋণ সংগ্রহ ও কর স্থাপন (অর্থাৎ budgetary sources) দ্বারা ১২৭৭ কোটি টাকা এবং ২০৩ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ফলে নির্ধারিত ২৯০ কোটি টাকার স্থলে ৫৩২ কোটি টাকার মত ঘাট্‌তি ব্যয় করিতে হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংগ্রহের সূত্রগুলি

কোনো দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্ম অর্থসংগ্রহের চারিটি উপায় আছে—ঋণগ্রহণ, করস্থাপন, ঘাট্‌তি ব্যয় ও বৈদেশিক সাহায্য। প্রথম পরিকল্পনায় উহাদের প্রত্যেকটি উপায় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা দরকার। (১) প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময়ে মূলধনের বা সঞ্চয়ের বাজার এত সংকুচিত ছিল যে, ঋণ সংগ্রহের ততটা সুবিধা দেখা দেয় নাই। পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে বাজার তেজী হওয়ায় পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণ হইতে মোট পাঁচ বৎসরে ৮৭ কোটি টাকা অধিক ঋণ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে; ১১৫ কোটির স্থলে ২০২ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের (প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রভৃতি) পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকার স্থলে ৩০৪ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় ঋণ গ্রহণ

(২) প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে করের সাহায্যে জাতীয় আয়ের ৬·৬%

রাষ্ট্র তুলিয়া লইত, পরিকল্পনার শেষে ৭% তোলা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ প্রভৃতি মিলিয়া করবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে বলিতে হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে কর হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৬২৬ কোটি টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার পরিমাণ হইল ৭৫০ কোটি টাকা; অর্থাৎ মাত্র ১২৪ কোটি টাকা কর-আদায় বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য করের সাহায্যে আরও অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল।

কর-আদায়

(৩) অপূর্ণোন্নত দেশের শ্রমশক্তি ও উপকরণসমূহ প্রধানতঃ অব্যবহৃত থাকে। এইরূপ অবস্থায় নূতন নোট ছাপাইয়া অর্থাৎ ঘাটতি ব্যয় করিয়া রাষ্ট্র নূতন নূতন শিল্প স্থাপন করিতে পারে। অব্যবহৃত উপকরণগুলির কর্মসংস্থান হয়, তাহাদের ব্যবহার হইতে থাকে, আয় সংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন একই সঙ্গে ঘটিতে থাকে।* সুতরাং অপূর্ণোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয় নীতি সীমাবদ্ধ-ভাবে সর্বদাই সমর্থনযোগ্য। এই ঘাটতি ব্যয় নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি আমাদের জানা দরকার। শাসনখাতে বা মূলধনীখাতে ব্যয়ের অপেক্ষা রাষ্ট্রের আয় যখন কম পড়ে, তখন কর, ঋণ প্রভৃতির দ্বারা সম্ভব না হইলে রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ নেয়, অথবা নূতন নোট ছাপাইয়া এই ফাঁক পূরণ করে। ইহাকেই বলে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি। দেশে নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও বাড়ে। যদি এই বিনিয়োগের দ্বারা বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়া যায় তবে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না, কিন্তু তাহা না হইলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিবে। তাই ঘাটতি ব্যয় নীতি খুব সাবধানের সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার, ইহাকে চালাইতে পারিলে ভালই, কিন্তু ইহা চালক হইলেই বিপদ।

ঘাটতি-ব্যয় কাহাকে বলে

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বিশেষ সাবধানতার সহিত ও সীমাবদ্ধ পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার

* বর্তমানে সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক বিনিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে নূতন আয় হইতে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইয়া পড়িবে।

উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ২৯০ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছিল, ঠিক এই পরিমাণ ষ্টার্লিং ব্যালান্স ইংলণ্ড হইতে ফেরত পাওয়া যাইবে স্থির ছিল, কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবার সম্ভাবনা ছিল না, পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত থাকিবে, এইরূপ ধরা হইয়াছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, (পরিবর্তিত হিসাবের) ৮৩০ কোটি টাকার ফাঁক পূরণ করিতে আরও কিছু ঘাট্‌তি ব্যয় করা দরকার হইতে পারে। 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর্যালোচনা-'তে বলা হইয়াছে যে, * প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৫৩২ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ

(৪) অপূর্ণোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৈদেশিক সাহায্য পাইলে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের দুইটি ফল: ইহার দ্বারা দেশে মূলধন আসে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবও কিছুটা মেটে। প্রথম পরিকল্পনায় বিদেশ হইতে মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি টাকা, উহার মধ্যে পাঁচ বৎসরে মোট ২০৩·২ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the First Five Year Plan):

প্রথম পরিকল্পনার শেষে পরিকল্পনা কমিশন একটি পর্যালোচনা (Review) প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াতে প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতির কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

১৯৫২ সালের প্রথমে স্থির হয় যে, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। পরে পরিকল্পনা বাড়াইয়া ও অনেক প্রকার সংশোধন করিয়া উহার আয়তন ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হইল।† ইহার মধ্যে মোট ২০১২ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।‡ প্রায় সকল খাতেই এইরূপ

মোট ব্যয় কত হইয়াছে

* Review of the First Five Year Plan

† ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় করার কথা ছিল ১৩৯০ কোটি টাকা এবং সকল রাজ্যসরকার মিলিয়া ৯৮৮ কোটি টাকা।

‡ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিয়াছেন ১,১১৫ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি ব্যয় করিয়াছেন ৮৯৭ কোটি টাকা।

ব্যয়ের পরিমাণ বিভিন্ন হারে কমিয়া গিয়াছে।* পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল খুবই কম (৮৭০ কোটি টাকা); তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুই বৎসরে মোট ব্যয়ের ৫৭% খরচ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় ১১% এর স্থলে ১৭.৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির অগ্রগতি সমান তালে হয় নাই। ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে, প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদন বাড়িবার দরুণই জাতীয় আয় অধিক হারে বাড়িয়াছে। তাহার পরের বৎসর বৃদ্ধির হার খুবই হ্রাস পাইয়াছে। পরিকল্পনাকালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ১০.৫% বাড়িয়াছে। মরসুম ভাল থাকায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে কতখানি পরিকল্পনার ফল বলা চলে তাহা বিচার করা দরকার।

জাতীয় আয় কিরূপ বাড়িয়াছে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির আলোচনায় প্রথমেই কৃষির কথা ধরা যাউক। ১৯৫১-৫৬ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন ১৮% এর উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যের উৎপাদন লক্ষ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে (৩০ লক্ষ টন অধিক); ৫ কোটি টন হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টনে পৌছিয়াছে। তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িয়া লক্ষ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। পাট ও চিনির উৎপাদন বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই। জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রভৃতি প্রায় লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছিতে পারিয়াছে।

কৃষিক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি

শিল্পের ক্ষেত্রে পাঁচবৎসরে উৎপাদন বাড়িয়াছে ৪০%। পরিকল্পনার শেষ দুইবৎসরে শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় (১৯৪৬ সালকে ১০০ ধরিলে) ১৯৫৫ সালে উহা ১৬১-তে পৌছিয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যের তুলনায় মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৪০ কোটি গজ বেশি হইয়াছে। চিনি, সেলাইকল, বাইসাইকেল, কাগজ ও কাগজের বোর্ড প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য ছাড়াইয়া গিয়াছে। উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন, যেমন সিমেন্ট, ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন অনেকখানি বাড়িয়াছে। বহু নূতন নূতন দ্রব্যের উৎপাদন সুরু হইয়াছে এবং নূতন নূতন অনেক শিল্প স্থাপিত হইয়াছে,

শিল্পের ক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি

---

* কৃষি ও জলসেচ খাতে ব্যয় ১২% কম হইয়াছে, সামাজিক সেবাকার্যে ৩১% কম, এবং শিল্প খাতে ৪৭% কম।

যেমন পেট্রল রিফাইনারি, জাহাজ, এরোপ্লেন,রেলওয়ে ওয়াগন, পেনিসিলিন, ডি ডি টি প্রভৃতি। সিন্ধ্রির সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, টেলিফোন শিল্প, রেলবগি কারখানা প্রভৃতির অগ্রগতি সন্তোষজনক। তবে পরিকল্পিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, কাগজের কারখানা ও বিহারের সুপারফস্‌ফেট কারখানা পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই।

প্রথম পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে পরিবহন ও সংযোজন খাতে মোট ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে স্থির হইয়াছিল। পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং ৪৩০ মাইল রেলপথের সংস্কার হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন রাজপথগুলির সংযোজনে ৬৩৬ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে, ৩০টি বড় বড় পুল গঠিত হইয়াছে, বর্তমানের ৪০০০ মাইল রাস্তার সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

পরিবহনের ক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি

এই সকল উৎপাদন বৃদ্ধির ফল দেখা দিয়াছে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর। পাইকারী দামস্তর ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ছিল ৪৫০, উহা কমিয়া ১৯৫৬ সালের মার্চমাসে হইয়াছে ৩৮৭। দেশে খাদ্য উৎপাদন বেশি হইয়াছে, পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর না দেওয়ায় যন্ত্রপাতির আমদানি বাড়াইতে হয় নাই—ফলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দেয় নাই। কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন, মোট ২৯০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ব্যালান্স খরচ করা হইবে। কিন্তু ১৩৮ কোটি টাকার বেশী ষ্টার্লিং ব্যালান্স ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই।

দামস্তর ও বাণিজ্য ব্যালান্স

প্রথম পরিকল্পনার বিচার (Appraisal of the First Plan)

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত অর্থনৈতিক বিশৃংখলা, খাদ্য ও শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব, সরকারের নীতি কি হইবে সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা, যন্ত্রপাতি পুনঃ সংস্কারের সমস্যা সকল কিছু মিলিয়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিল যাহাতে উন্নয়নের তীব্র গতিবেগ সুরু করা সম্ভব ছিল না। প্রথম পরিকল্পনাতে সকল বিষয়ের লক্ষ্য (targets) ছিল খুবই নীচুতে, স্বল্প আয়াসেই সেই লক্ষ্য-সমূহে পৌছান তাই সম্ভব হইয়াছে। দুইটি ভাল মরসুমী বৃষ্টিপাত, প্রচুর

সীমাবদ্ধ সাফল্য

বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়, উৎপাদন কাঠামোতে অব্যবহৃত শক্তির (কল-কারখানার) পূর্ণ ব্যবহার, সরকারী খাতে কম ব্যয়ের পরিমাণ—এই সকল কারণে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট বা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার এইরূপ সীমাবদ্ধ সাফল্য সত্বেও এই পরিকল্পনার কৌশল (technique) ও প্রয়োগ (execution) বহুবিধ সমালোচনার বিষয়।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, প্রথম পরিকল্পনা গঠন করার সময়ে দেশের উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে এই পরিকল্পনা রচনা করা হয় নাই।

কেবল অর্থের হিসাবে পরিকল্পনা হয় না

কেবলমাত্র অর্থের হিসাবে আয় ব্যয়ের তালিকা সাজাইলে তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা চলে না। অর্থের হিসাবে একটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নিখুঁত হইলেও দেশে বিভিন্ন উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও ব্যালান্স সঠিক হিসাব না করিলে পরিকল্পনা কখনই সফল হইতে পারে না। অনেকে তাই প্রথম পরিকল্পনাকে পাঁচ বৎসরে রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের তালিকা বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলেন না।*

দ্বিতীয়তঃ, অর্থের হিসাবে গৃহীত হইলেও এই পরিকল্পনা অর্থের আয় ব্যয়ের দিক হইতেও সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে নাই। ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ের স্থলে মাত্র ২০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। পরিকল্পনা কালের

বরাদ্দ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয় নাই

মধ্যে উদ্ভুত অতিরিক্ত আয়ের একপঞ্চমাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইবে, দেশের দুস্থ অবস্থার কথা মনে করিয়া পরিকল্পনা কমিশনের এতদূর আশা করা উচিত হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা, দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে বিশৃংখলা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে কমিশনের পূর্বে চিন্তা করা উচিত ছিল।

তৃতীয়তঃ, কৃষির উপর জোর না দিয়া যে সকল শিল্প কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে, তাহাদের উপর জোর দেওয়া উচিত

কৃষির উপর অল্প জোর দিয়া কৃষি-যন্ত্রের উপর অধিক জোর দেওয়া উচিত ছিল

ছিল। সেইরূপ যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় পরি-কল্পনায় কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারা কৃষিক্ষেত্র হইতে খাদ্য ও কাঁচামাল পাওয়া যাইত, কৃষি ক্ষেত্রের অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা হইত। ছোট ছোট কৃষি সংস্কারের ফলে

* "We had rather an easy time in the First Five Year Plan, because really we had not stretched ourselves. We had not made any particular effort. We just took what was there and called it a plan."—*Jaharlal Nehru*.

কৃষির উন্নতি উপযুক্ত পরিমাণে হয় নাই, অথচ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির যন্ত্রপাতিও তৈয়ারী হয় নাই।

চতুর্থতঃ, পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নতির প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর ছাড়িয়া দিয়া ভাল করেন নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার আরও দ্রুত হওয়া দরকার। কিন্তু কমিশন বেসরকারী ব্যবসাদারদের উপর ভার দিলেও বাজার হইতে নিজেরা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কার্যে বাধা দিয়াছেন। অনেক শিল্পপতির মতে ২৩৩ কোটি টাকার নূতন মূলধন এবং ক্ষয় ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫০ কোটি টাকা—ইহার সাহায্যে বেসরকারী শিল্পের পরিকল্পিত লক্ষ্যে (planned targets) পৌছান যায় না।

বেসরকারী ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা দরকার ছিল

সর্বোপরি, প্রথম পরিকল্পনার সর্বাধিক ত্রুটি হইল জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারা, তাহাদের মধ্যে উদ্দীপনা, চেতনা ও নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন কাঠামো গড়িয়া না তোলা। পরিকল্পনার কাজ হইল সমগ্র সমাজমানসকে একাগ্রভাবে সঞ্চালিত করা, যাহাতে পরিকল্পনার স্বয়ংচালিত গতি সৃষ্টি হয়, কর্মোদ্যোগের ধারক ও বাহক শক্তি নিজেই নিজেকে চালনা করিতে পারে। প্রথম পরিকল্পনায় এই গণ-উদ্যোগের গতিবেগ সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি হয় নাই

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৫৬—'৬১

The Second Five Year Plan, 1956—61

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার কার্যফল এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক উচ্চাকাঙ্খী ও সাহসী। ইহা আকারে বড় এবং প্রকৃতিতেও অনেকখানি বৈজ্ঞানিক। প্রথম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা তাহাকেই অগ্রসর করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। প্রধানতঃ মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া দ্রুত শিল্প বিস্তার না করিলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যাইবে না—এই সত্য স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি সাধারণ লক্ষ্য আছে: (ক) জাতীয় আয়ে প্রতি বৎসর ৫% বৃদ্ধি। (খ) পাঁচ বৎসরে ১ কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বেকারির পরিমাণ কমান। (গ) মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুত শিল্প বিস্তার। (ঘ) আয় বৈষম্য কমাইয়া অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল যাহাতে ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া তোলে ইহাই সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। দেশে অব্যবহৃত জনশক্তি থাকিলে জাতীয় সম্পদের উৎপাদন বাড়িতে পারে না, এইরূপ বেকারি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজও গড়িয়া তুলিতে পারে না। জাতীয় আয় বৎসরে ৫% হারে বাড়াইতে হইলে খনিজ দ্রব্য, মূল ও ভারী শিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে প্রভূত অর্থব্যয় করা দরকার, কেবলমাত্র কৃষির উৎপাদন বাড়াইয়া এই হারে জাতীয় আয় বাড়ান চলে না। সুতরাং এই সকল লক্ষ্য পরস্পরসংযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কৌশল (basic strategy) হইল কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং এইরূপ ভারসাম্যবিহীন ক্রমোন্নতির (unbalanced growth) পথে অগ্রসর হওয়া। শিল্পের মধ্যেও সকল প্রকার শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত হইবে না, ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের, অর্থাৎ মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইবে। মোট বরাদ্দের প্রায় শতকরা ১৮ ভাগই এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনে খাটান হইবে। বৃহৎ শিল্প, শিল্প গবেষণা ও খনিজ দ্রব্যের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইয়াছে ৬৯০ কোটি টাকা।

শিল্পের উপর গুরুত্ব

ভারসাম্যবিহীন ক্রমোন্নতির পথে (path of unbalanced growth) অগ্রসর হওয়ার মূল পদ্ধতিই হইল মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া। এই সকল শিল্পের উপর জোর দিলেই দেশে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী কলকারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে কৃষির পুনঃসংগঠন করা চলিবে, কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সরাইয়া আনা চলিবে। তাহা ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে প্রসারিত হইবে, কৃষি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে তাহা কৃষিজাত দ্রব্যের দামস্তর কমাইবে না।

মূল ও ভারি শিল্পের উপর

কিন্তু এই সকল মূল ও ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর মূলধন দরকার, সেই তুলনায় জনশক্তির নিয়োগ কম হয়। প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হইলে লোকের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়ে, ভোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিনিয়োগের ধরণই এমন যে, ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে না। তাই দেশে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার গুরুভার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদন বাড়াইতে তুলনামূলকভাবে মূলধন প্রয়োজন হয় কম, দরিদ্র দেশের পক্ষে তাই এই পদ্ধতি ভাল। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনপদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় (labour intensive) ; কম মূলধন খাটাইয়া অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা চলে। মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দিয়া দেশের শিল্প-

ভিত্তি (Industrial base) গড়িয়া তুলিতে কুটির শিল্প এইরূপে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে। ভারতের গ্রামগুলিতে অপূর্ণ নিয়োগের পরিমাণ বেশি, কৃষিকার্যের মধ্যে ও বাহিরে অন্তর্নিহিত শ্রমশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। সর্বদা কাজ নাই, যখন কাজ থাকে তাহার পরিমাণ কম, কৃষকের শারীরিক ও মানসিক শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাহায্যে এই সম্ভাবনাশীল সম্পদ উৎপাদনকারী শ্রম শক্তিকে (potential wealth-producing labour-power) খাটাইলে ভোগ্য দ্রব্যের অভাব মেটে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এই সকল অংশ হইতে সঞ্চয় বা বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে। অপূর্ণোন্নত ও জনবহুল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই মূল কৌশলের উপর ভিত্তি করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

দ্রুত শিল্প উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা

অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জড়তা নাশ করিয়া উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি করিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা নীচে আলোচিত হইল :

ব্যয় বরাদ্দ

	বিষয়	বরাদ্দ ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে)	মোট ব্যয়ের শতকরা কত অংশ
১।	কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১১·৮
২।	জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	৯১৩	১৯·০
৩।	শিল্প ও খনি	৮৯০	১৮·৫
৪।	পরিবহন ও সংযোজন	১৩৮৫	২৮·৮
৫।	সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন	৯৪৫	১৯·৭
৬।	বিবিধ	৯৯	২·১
	মোট	৪৮০০	১০০

এই ব্যয় বরাদ্দের খাতগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মোট ব্যয়ের অর্ধেক বরাদ্দ হইয়াছে শিল্প, খনি, পরিবহন ও সংযোজন-এর

উপর। প্রথম পরিকল্পনায় ইহাদের মিলিত অংশ ছিল .⅔ ভাগ। শক্তি উৎপাদনকে শিল্পের মধ্যে ধরিলে এই অনুপাত দাড়ায় ৫৭%। কৃষি ও জলসেচ খাতে ব্যয় হইতেছে ২১%।

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্বিগুণ। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ২০০০ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ

ইহার মধ্যে ১৫০০ কোটি টাকার মত উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ, আর ৫০০ কোটি টাকার মত বিভিন্ন সমাজ সেবা খাতে ব্যয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে—ইহার মধ্যে ৩৮০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ১০০০ কোটি টাকার মত চল্‌তি উন্নয়নের ব্যয়। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছিল ১৬০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ বিনিয়োগ হইবে ২৪০০ কোটি টাকা: সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হইবে ৬২০০ কোটি টাকা। ইহা প্রথম পরিকল্পনার ঠিক দ্বিগুণ।

পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন দিকে উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করিয়াছেন। কৃষির উৎপাদন বাড়িবে ১৮% ইহার মধ্যে খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ১৫%। জলসিঞ্চিত জমির পরিমাণ বাড়িবে ২ কোটি ১০ লক্ষ একর। জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ লোককে আনা হইবে। পূর্ণোৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ (Finished steel) ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইবে; কয়লার উৎপাদন ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ৬০ কোটি টন হইবে; সিমেণ্টের উৎপাদন ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ১ কোটি টনে পরিণত হইবে। এইরূপ বিভিন্ন দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ২৫% বাড়িবে; ১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৩৪৮০ কোটি টাকায় পৌছিবে। জাতীয় আয়ের সহিত বিনিয়োগের অনুপাত ৭% হইতে বাড়িয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১২% হইবে[১]। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ২৮০ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে বার্ষিক ৩৩০ টাকা হইবে,

বিভিন্ন দিকে উৎপাদনের বা অগ্রগতির লক্ষ্য

১ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বাদ দিলেও ইহা ১০ হইবে, দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা খুব কম নয়।

অর্থাৎ ১৮% বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহা বাড়িয়াছিল ১০%। যদি আগামী পরিকল্পনাকালসমূহে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৫% হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ হইতে পারিবে।

সরকারী ক্ষেত্রে এই ৪৮০০ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? নীচের তালিকাতে তাহা দেওয়া হইল:

উৎস	কোটি টাকার হিসাবে
১। চল্‌তি আয়ের উদ্বৃত্ত	৮০০
(ক) পূর্বেকার কর হার অনুযায়ী ৩৫০	
(খ) বাড়্‌তি কর হার অনুযায়ী ৪৫০	
২। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণ ৭০০	
(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ঋণ ৫০০	
৩। অন্যান্য বাজেটভুক্ত উৎস	৪০০
(ক) রেলওয়ে ১৫০	
(খ) প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ২৫০	
৪। বিদেশী সাহায্য	৮০০
৫। ঘাট্‌তি ব্যয়	১২০০
৬। অনির্ধারিত ফাঁক	৪০০

অর্থসংগ্রহের এই তালিকা বিচার করা দরকার বৈদেশিক ব্যালান্সের পরিপ্রেক্ষিতে। কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, পাঁচবছরে ১১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত বিলাতে মজুত আছে, বিদেশী বেসরকারী মূলধন আসিবে ১০০ কোটি টাকা এবং বাকী ৮০০ কোটি টাকা (উপরের তালিকার ৪নং) বিদেশী সাহায্যে পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা করা হইতেছে।

অর্থসংগ্রহ ও বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন

ইহাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মনে রাখা দরকার, তিনবৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা পূর্ণ কার্যকরী হইবার পথে

কতকগুলি বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, এবং পরিকল্পনার আকৃতি (Structure) ও প্রকৃতিতে (nature) অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। পরিকল্পনা পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব অবস্থার চাপে এই সকল পরিবর্তন দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কার্যফলের উপর বিপুল পরিবর্তন আনিয়া ফেলিয়াছে[২]।

পরিকল্পনায় পরিবর্তন

বিনিয়োগের ধরণ ও লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে অধিকতর বিশ্লেষণ (A closer examination of Investment pattern and targets)

মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৩৮০০ কোটি টাকা হইল বিনিয়োগ অর্থাৎ উৎপাদনশীল আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের সৃষ্টি আর ১০০০ কোটি টাকা হইল চল্‌তি উন্নয়নমূলক ব্যয়। এই দুই ধরণের ব্যয়কে পৃথক না করিলে পরিকল্পনার প্রকৃতি বোঝা যায় না। নীচে এই তালিকা দেওয়া হইল।

সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও চল্‌তি উন্নয়নমূলক ব্যয়

(কোটি টাকার হিসাবে)

বিষয়	বিনিয়োগ-ব্যয়	চল্‌তি-ব্যয়		মোট-ব্যয়
১। কৃষি ও সমাজউন্নয়ন	৩৩৮	২৩০	=	৫৬৮
২। জল সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	৮৬৩	৫০	=	৯১৩
৩। শিল্প ও খনি	৭৯০	১০০	=	৮৯০
৪। পরিবহন ও সংযোজন	১৩৩৫	৫০	=	১৩৮৫
৫। সমাজ সেবা	৪৫৫	৪৯০	=	৯৪৫
৬। বিবিধ	১৯	৮০	=	৯৯
মোট	৩৮০০	১০০০	=	৪৮০০

অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিভাগীকরণ সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বিনিয়োগ ব্যয় ও চল্‌তি ব্যয়—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরিকল্পনা রচনা করা খুবই দরকার। এখন পর্যন্ত তাই এই হিসাবকে মোটামুটি বা আনুমানিক বলিয়া মনে করা চলে[৩]।

২ ইহা পরে আলোচিত হইতেছে

৩ "The presentation of budgets at the Centre and in the States does not at present run in terms of a clearcut distinction between current expenditure and investment. There are in the Revenue account some items of an invest-

প্রথম পরিকল্পনাতে শিল্প প্রসারের জন্য কেবলমাত্র সুসংগঠিত বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের উপর নির্ভর (Organised private industrial sector) করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশের সমগ্র বেসরকারী ক্ষেত্রকেই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রের এক বিরাট অংশ (কৃষি বা অন্যান্য অংশ) সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তাহাদের কাজকর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ করাও শক্ত। তাই সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের ও লক্ষ্যের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় বেসরকারী কাজকর্মের লক্ষ্য ও ব্যয়বরাদ্দ অপেক্ষাকৃত অধিক আন্দাজী ধরণের; হিসাবগুলি ততটা সঠিক ও নিখুঁত হইতে পারে না। অতীতের অবস্থা ও গতির ভিত্তিতে বর্তমানের অভিজ্ঞতার দ্বারা বেসরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে হিসাব গৃহীত হইয়াছে, উহাকে সঠিকভাবে পরিকল্পনা বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ধরিয়া লইয়াছে যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় ২৪০০ কোটি টাকার মত হইবে। নীচে কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় হইবে তাহার তালিকা দেওয়া হইল:

বেসরকারী ক্ষেত্রকে আন্দাজী হিসাবে আনা হইয়াছে, কিন্তু আয়ত্তের বাহিরে রাখা হইয়াছে

	ক্ষেত্র	কোটি টাকার হিসাবে
১।	সংগঠিত শিল্প ও খনি (প্রথম পরিকল্পনায় ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল)	৫৭৫
২।	বাগিচা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল ব্যতীত অন্যান্য পরিবহন	১২৬
৩।	গৃহাদি নির্মাণ	১০০০
৪।	কৃষি এবং গ্রাম ও কুটির শিল্প	৩০০
৫।	মজুত	৪০০
	মোট	২৪০০ কোটি টাকা

ment character, and in the Capital account, it is necessary to distinguish between direct expenditure on Capital formation and loans expenditure which leads to the creation of productive assets elsewhere in the system. There are also transfers from time to time from Revenue account to Capital account and vice versa of certain types of expenditure, the precise import of which in national accounting terms is not readily recognisable. Nor have the projects and schemes included in the plan been worked out fully by the authorities concerned in terms of investment expenditure proper and current developmental expenditure *Second Five Year Plan*—P. 57.

এইরূপে দেখা যায়, সরকারীক্ষেত্রে ৩৮০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী-ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা—উভয়ে মিলিয়া ৬২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ-ব্যয় করা হইবে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কিছু অংশ ব্যয় করা হয় স্কুল, কলেজ, অফিস, গবেষণাগারের গৃহনির্মাণে, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণে—ইহারা সরাসরি আয় সৃষ্টি করে না। ইহাদের সামাজিক মূলধন (Social Capital) বলা চলে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আয়-সৃষ্টিকারী উৎপাদক মূলধন (Productive Capital) ইহা নয়। হিসাব করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশই হইবে এইরূপ সামাজিক মূলধন। সাধারণতঃ বেসরকারীক্ষেত্রের সকল বিনিয়োগেই উৎপাদক মূলধন সৃষ্টি হয়। সুতরাং সামাজিক মূলধনকে পৃথক করিয়া রাখিলে বলা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনা ৫০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সৃষ্টি করিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে।

সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকৃতি

এই উৎপাদক মূলধন কতখানি উৎপাদন বাড়াইবে তাহা নির্ভর করে এই মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার উপর (Productivity of Capital) অর্থাৎ মূলধন-উৎপন্নের অনুপাতের উপর (Capital-output ratio)। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত ধরা হইয়াছে ২·৩০ : ১। এই হিসাবে (৫০০০ কোটি টাকার উৎপাদক বিনিয়োগ হইতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ২৬৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় (১৯৫২-৫৩ সালের দামস্তরের হিসাবে) ১০৮০০ কোটি টাকা (১৯৫৬ সালে) হইতে ১৩৪৮০ কোটি টাকায় (১৯৬১ সালে) পরিণত হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে জাতীয় আয় ২৫% বাড়িয়া যাইবে, মাথা-পিছু আয় ১৮% বাড়িবে এবং মাথাপিছু ভোগ ১৬% বৃদ্ধি পাইবে।

মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত ও জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও উদ্বৃত্তের সংগ্রহ এবং উহার বিনিয়োগ সবই অর্থের হিসাবে ধরা হইয়াছে। এই অর্থ-ভিত্তিক বা অর্থ-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার (Financial planning) তুলনায় দ্রব্য-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা (Physical Planning) অনেক বেশি কার্যকরী। ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশে মূলধন ও বিনিয়োগ-যোগ্য উপকরণের স্বল্পতা দেখা যায়, এখানে দ্রব্য ও উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মজুরের হিসাব করিয়া তাহাদের কর্মে নিয়োগের

দ্রব্যভিত্তিক পরিকল্পনা রচিত হয় নাই

ভিত্তিতে দ্রব্যনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা (Physical Plan) তৈয়ারী করা দরকার। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন তাহা করেন নাই। অর্থের হিসাবের বাহিরে, পর্দার অন্তরালে (behind the veil of money) সমাজের আসল শক্তিসমূহের (real forces) যে গতিবিধি চলে তাহাদের হিসাব হইতে বাদ দিয়া প্রকৃত কোন পরিকল্পনা গঠন করাচলে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি (The Second Plan and Agriculture)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়া রচিত হইলেও কৃষি উন্নয়নে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ ও লক্ষ্য

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ২৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় জলসেচ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৮৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খরচ হইবে ৪৮৬ কোটি টাকা। যে সকল কাজ পূর্বে স্থরু হইয়াছিল তাহারা চলিবেই, উহা ব্যতীত ১৯৫টি নূতন জলসেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ হইল ১ কোটি টন, তুলা ১০ লক্ষ ৩০ হাজার বেল্; তৈলবীজ ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন; ১০ লক্ষ বেল্ পাট এবং ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইক্ষু (গুড়ের হিসাবে)।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ সাফল্য

কৃষিক্ষেত্রে কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িয়াছিল তাই শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির পূর্ণ নিয়োগ ও ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় বিনিয়োগ বাড়ান সম্ভব হইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া পরিকল্পনা ও ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বানচাল করিতে পারে নাই। কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়িয়াছিল, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হইয়াছিল, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে ইহা সাহায্য করিয়াছিল।

জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে (Subsistence sector) যত

দ্রুত হারে উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে পারা যায়, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে ক্রমবৃদ্ধির হার তত বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শিল্পে বা মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইবার জন্য সরিয়া আসিতে পারে। কৃষি উৎপাদন যদি প্রকৃতির খেয়াল খুশীতে উঠানামা করে তবে অধিক বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিকল্পনা ভাল বা খারাপ কোন মরসুমেই গ্রহণ করা চলে না। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনা খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনের খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছে। তাহা ছাড়া জনসংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের কথাও ভাবা দরকার।

কৃষিতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি

কৃষিতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে কেবল পতিত জমির উদ্ধার এবং জমিতে অধিক শ্রমিক নিয়োগের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, প্রগাঢ়-চাষ ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রচলন করা দরকার। প্রগাঢ় চাষ ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রধান বাধা তিনটি, (ক) জমিতে চাষীর ব্যক্তিগত মালিকানা, ফলে ইতস্ততঃ খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিগুলি, (খ) সমবায় চাষ সুরু করার উপযুক্ত মনোবৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অভাব, এবং (গ) উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা অর্থাভাবে উহা গ্রহণ করার অসুবিধা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অধিকতর জলসেচ, সার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সাহায্য করা ছাড়াও জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানায় জমি আনিয়া জমিহীন বা গরীব চাষীদের মধ্যে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি হইলেও সমবায় সমিতি গঠন করার কথা অন্ততঃ বলা হইয়াছে। উন্নত চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়নের জন্য দ্বিগুণের বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে[৪] এবং ১৯৬১ সালের মধ্যে সমগ্র দেশকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে।

কৃষি উন্নয়নের কার্যসূচী

৪ এই সকল কার্যসূচীর জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ৪৬ কোটি টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়নের কার্যসূচী যত অধিক হওয়া দরকার ছিল ততটা হয় নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালের স্তর হইতে খাদ্যোৎপাদন ১ কোটি টন (১৫.৫%) এবং খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য শস্যাদির উৎপাদন ২২৩% বাড়াইবার কথা হইয়াছে। খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হইয়াছে খুবই কম। যে হারে ও যে পরিধির শিল্পোন্নয়ন ঘটিবে, দেশের খাদ্যসম্পদের ভিত্তি ততটা সুগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। ভাল মরসুমে খাদ্য মজুত করিয়া রাখার নীতির উপর জোর দেওয়া হয় নাই, একমাত্র এইরূপ যথেষ্ট মজুত থাকিলেই খারাপ মরসুমে শিল্পোৎপাদনের গতি হ্রাস পাইবে না। তাহা ছাড়া, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতেও এই খাদ্যোৎপাদন বিশেষ সহায়তা করিবে না। বর্তমানের ২২০০ ক্যালোরির তুলনায় লোক ২৪৫০ ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু সকলেই জানেন যে ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্যের কম স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বজায় থাকিতে পারে না। এই জন্যই মনে করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের দরকার ছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির অনুন্নতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকেও বানচাল করিতেছে

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পরেই সরকার ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রভূত উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুণ খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়াছে তাই প্রায় সকল খাদ্যশস্যাদির উৎপাদন-লক্ষ্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি সম্ভব হয় তবে ইহা হইতে রপ্তানিও করা হইবে। অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১ কোটি ৫১½ লক্ষ টন; অতিরিক্ত তুলা উৎপাদন ২৩ লক্ষ বেল; অতিরিক্ত তৈলবীজের উৎপাদন ২১ লক্ষ টন; পাট উৎপাদন ১৫ লক্ষ বেল্ এবং (গুড়ের হিসাবে) ২০ লক্ষ টন ইক্ষু।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও শিল্প (The Second Plan and Industries)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহার প্রধান ভিত্তি হইল সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই মূল ও ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। মূল শিল্পের উপর জোর দিবার ফলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দ্রুততর হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ভার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া

শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি

হইতেছে, ইহাতে কম মূলধনে অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান ঘটান সম্ভব হইবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকল শিল্পে ৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ভারি শিল্পের[৫] জন্য বরাদ্দ হইল ৫৪৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯৭%। ব্যক্তি ক্ষেত্রে সকল শিল্পে[৬] বিনিয়োগ হইল ৫৩৫ কোটি টাকা—ইহার মধ্যে ভারি শিল্পের অংশ হইল ৩৬৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬৮·৮%।

উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ নীতি সঠিক সন্দেহ নাই

অপূর্ণোন্নত কোনো দেশ যখন উন্নয়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিতে চায় তখনই তাহার সম্মুখে এইরূপ নির্বাচনের সমস্যা উপস্থিত হয়, ভোগ্য দ্রব্যের শিল্প অথবা উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প—কিসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। দেশে মূলধনের পরিমাণ কম, তাই এই নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনকে বহন করিতে হয়। অপরিকল্পিত শিল্পোনয়নের দেশে প্রধানতঃ ব্যক্তি-উদ্যোগী শিল্পপতিরা যে শিল্পে অধিক মুনাফা পাওয়া যাইবে সেই শিল্পে বিনিয়োগ করেন, তাঁহাদের নির্বাচন হইল মুনাফামুখী। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিনিয়োগের ধরণ নির্বাচনে মুনাফা প্রধান বিচার্য বিষয় নয়; এক্ষেত্রে বিনিয়োগের ধরণ নির্বাচিত হয় ভবিষ্যতে কিরূপ ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নয়নের হার দরকার সেই অনুযায়ী। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের হার অধিক চাহিলে বর্তমানে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে গুরুত্ব কম হইবে, উৎপাদক দ্রব্যের শিল্প অধিক

---

৫ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রধান শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা হইল: 3 Steel Plants—Rs. 350 crores; Heavy Structurals—Rs. 20 crores; Heavy Electrical Plant—Rs. 20 crores; Heavy foundry cum forge shops—Rs. 12 crores; Lignite project—Rs. 52 crores; Fertilisers—Rs. 37 crores; Railway coaches—Rs. 10 crores; Shipyard—Rs. 9·8 crores; Engineering shops for spare parts—Rs 7 crores. ইহাদের সকলে মিলিয়া বরাদ্দ হইল ৫০৭·৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের ৯০%।

৬ বেসরকারী-ক্ষেত্রে প্রধান শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা হইল: Iron & Steel—Rs. 115 crores; Industrial machinery—Rs. 21·6 crores; Automobiles and anciliary industries—Rs. 18 crores; Heavy chemicals—Rs. 32·5 crores; Petroleum refining—Rs. 10 crores; Paper and Newsprint—Rs. 50 crores; Cement—Rs. 80 crores; Sugar—Rs. 50 crores: Cotton textiles—Rs. 30 crores; Light Engineering industries—Rs. 15 crores; Aluminium—Rs. 22 crores; Ferro-manganese—Rs. 9·5 crores. ইহাদের সকলে মিলিয়া বরাদ্দ হইল ৪৪৮·৬ কোটি, অর্থাৎ শিল্পে পরিকল্পিত বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের ৮০%।

পরিমাণে প্রসারিত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারি শিল্পের উপর এই গুরুত্ব আরোপ খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, কারণ একমাত্র এই পথেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ জনসংখ্যার বেগকে ছাপাইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে।

অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথমে হাল্কা ধরণের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলি স্থাপিত হইতে থাকে, কারণ উন্নয়নের প্রথম যুগে (ক) মূলধনের পরিমাণ কম, (খ) উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ও ঝুঁকি বেশি, ও (গ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব। প্রথমে

ভোগ্য দ্রব্য না উৎপাদক দ্রব্য, ব্যালান্স বিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির পথ

ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প স্থাপিত হইয়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়িলে, উৎপাদক দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে ও যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে পরে উৎপাদক-দ্রব্যের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পায়নের এই ধারা অন্যরূপ হইতে পারে। এখানে দেশে শিল্প-কাঠামোর (Industrial structure) মধ্যে ভোগ্যশিল্প ও উৎপাদকশিল্পের অনুপাত প্রথম হইতে এমনভাবে স্থির করা চলে যাহাতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িতে পারে; ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলে। এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপাদক শিল্পের উপর জোর দিয়া নূতন আয় সৃষ্টি করিয়া ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করান যাইতে পারে এবং পরবর্তী পরিকল্পনাকাল-সমূহে (time-periods) ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প গড়িয়া তোলা চলে। তাই ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া ঠিকই হইয়াছে বলা চলে।

তাহা ছাড়া ভারতের প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদ মূল ও ভারি শিল্পের উৎপাদনের পক্ষে খুবই উপযোগী ইহাতে সন্দেহ নাই। লোহা, ম্যাঙ্গানীজ বক্সাইট ও মাইকা সবই এই দেশে আছে। অন্যান্য অনেক দেশকেই

তাহা ছাড়া, শিল্প প্রসারের সম্ভাবনাও প্রচুর

বিদেশ হইতে এই সকল মূল খনিজদ্রব্য আমদানি করিয়া ভারি শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। সেই তুলনায় ভারতের অবস্থা খুবই ভাল বলিতে হইবে। যুদ্ধের সময়ে বা বর্তমানের ভারি শিল্পগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকদের উন্নত কর্মক্ষমতা ও যন্ত্রদক্ষতার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। উৎপাদক

দ্রব্যের বাজারও কম বড় নয়; ভারতের নিজস্ব আয়তন এবং প্রতিবেশী অনুন্নত দেশগুলির বাজার ইহারা মিলিয়া বৃহৎমাত্রায় উৎপাদক দ্রব্য স্বরু করা মোটেই অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতিজনক নয়।

অবশ্য অনেকে বর্তমানে উৎপাদক দ্রব্যের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা পছন্দ করিতেছেন না। তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে অনেক ধরণের যুক্তি প্রদর্শন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ভারিশিল্পের উন্নতি কত দ্রুত করা দরকার তাহা স্থির করার জন্য দুইটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন; প্রথমতঃ, দেশের মধ্যে যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের যোগান কিরূপ, এবং দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভারিশিল্পের উপর জোর দিলেও উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রদক্ষতা সৃষ্টি করার মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করেন নাই। তাহা ছাড়া, অনেক ভারিশিল্পের দ্রব্য দেশে প্রস্তুত না করিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিলে খরচ কম পড়িত। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা ছিল সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন, তাই সকল প্রকার উৎপাদকশিল্প নিজেকেই বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া গুরুতর ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এত ত্যাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। ইহারা তাই বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল (ক) বিদেশ হইতে কিছুটা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি আমদানি করা, (খ) (চীনের মত) দেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সাহায্যে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা যতদূর সম্ভব উৎপাদক দ্রব্য উৎপন্ন করা।

অন্য পন্থা ছিল কি না

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি (Progress of the Second Five Year Plan):

১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর শেষ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার কার্যসূচী স্বরু হইতেই দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার বেগ প্রথম হইতেই অনেক বেশি। শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বহুপ্রকার চাপ প্রথম হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। তিন বৎসরে দ্বিতীয় পরিকল্পনা বিভিন্ন দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিনিয়োগের পরিমাণ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে জাতীয় আয়ের ৭% বিনিয়োগ হইতেছিল, ইহা ১০.৭% -এ তুলিতে হইবে এইরূপ লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছিল। সরকারী হিসাবপত্রে দেখা যায় যে, পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছে[৭]।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন

এই বিনিয়োগের ফলস্বরূপ ১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্বের বৎসরের তুলনায় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন ৬% বৃদ্ধি পাইয়াছে। (১৯৫০ সালে জুন মাসের উৎপাদনকে ১০০ ধরিলে ১১৫.৯ হইতে ১২৩ পর্যন্ত উঠিয়াছে)। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন তুলনামূলক ভাবে কম বাড়িয়াছে (৫.৩%), অন্যান্য ফসলের পরিমাণে একটু বেশি বৃদ্ধি হইয়াছে (৭.৫%)। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্যের ও পাটের উৎপাদন পূর্বের বছরের তুলনায় কমিয়াছে, ধানের উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন কম।

শিল্পোৎপাদনের গতি

১৯৫৭ সালে শিল্পের উৎপাদনও বাড়িয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধির হার একটু কমিয়া গিয়াছে। শিল্পোৎপাদনের সূচক ১৯৫৭ সালের পূর্বের দুইবৎসর ৮% হারে বাড়িয়াছে কিন্তু ঐ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩.৫% হারে। প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাওয়াতেই এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। দেশে ও বিদেশে বিক্রয় হ্রাস পাইয়া গুদামে অবিক্রীত মালের পরিমাণ বস্ত্রশিল্পে বাড়িয়াছে। সিমেণ্ট ও কয়লার উৎপাদন বেশ বাড়িয়াছে। সাধারণভাবে শিল্পোৎপাদনের গতি কমিয়া যাওয়ার দুইটি কারণ আছে বলা যায়ঃ (ক) পূর্বের ন্যায় যন্ত্রপাতিতে অব্যবহৃত শক্তি এখন আর পড়িয়া নাই, (খ) আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের স্বল্পতা দেখা দিতেছে।

জাতীয় আয়ের গতি

জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় (১.৯%) জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার অনেক বেশি (৫.১%); ১০৪০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ইহা ১১,০১০ কোটি টাকাতে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ে এই হারে বৃদ্ধি হইতে পারে নাই ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ কৃষি উৎপাদনের

৭ সরকারী ক্ষেত্রে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৬৬০ কোটি হইতে ৭২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের পরিকল্পিত ৯৬৫ কোটি টাকার মধ্যেও ৮০০-৮৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যেও এই দুই বৎসরে প্রায় ২৮০ কোটি টাকার সমত বিনিয়োগ হইয়াছে।

পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির গতিবেগও অপেক্ষাকৃত কম।

দামস্তরের দিকে তাকাইলে দেখা যায় ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৩·৮%, তাহার পরেও ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা আরও ৮·৩% বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে দামস্তরের গতির তিনটি স্তর দেখা গিয়াছে—১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি, ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ক্রমাগত হ্রাস এবং উহার পরে আবার বৃদ্ধি। পূর্বের বছরের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালের গড় দামস্তর ১·২% বাড়িয়াছে। দামস্তরে এই ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রধানতঃ দুইটি কারণ (ক) বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ আয়স্রোতে বৃদ্ধি এবং, (খ) তুলনামূলক ভাবে কৃষি-উৎপাদন কমিয়া যাওয়া। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে বা বড় চাষীদের অবস্থা একটু ভাল হওয়ায় নিজের টাকায় খাদ্যশস্য মজুত করা—প্রভৃতিও দেশের দামস্তর বাড়িতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বিদেশে দামস্তরে বৃদ্ধিও দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

দামস্তরে বৃদ্ধির গতি

মূল ও ভারি শিল্পের উপর বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং ফলে আয়স্রোতে বৃদ্ধি—ইহাদের ফলে দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাটতি বাড়িয়া গিয়াছে। ষ্টার্লিং জমার পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতে এই ঘাটতি বাড়িবার প্রধান কারণ হইল বিপুল পরিমাণে আমদানি বৃদ্ধি। আমদানি বাড়িবার কারণ হইল সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হওয়া এবং খাদ্যের আমদানি বাড়িয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া আমাদের রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া গিয়াও এই সমস্যা তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকাতে মৃদু অর্থনৈতিক অবনতি, সুয়েজ সমস্যার দরুণ ইংলণ্ডে মালপত্র মজুত করার পরিমাণে (stock piling) হ্রাস এবং দেশের মধ্যে ভোগের পরিমাণে বৃদ্ধি—এই সকল মিলিয়া রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া গিয়াছে।

বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাটতি

স্থির হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে মোট ২৪৫৬ কোটি টাকা (অর্ধেকের অল্প কিছু বেশি) ব্যয় হইবে, অবশিষ্ট ২৩৪৪ কোটি টাকা শেষ দুই বৎসরে ব্যয় হইবে। করবৃদ্ধির দ্বারা পরিকল্পিত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইতেছে না, ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও আর বেশি করা উচিত নয় (৯১৭ কোটি টাকা তিনবৎসরে

অর্থ-সংগ্রহের অসুবিধা

করা হইয়াছে), সুতরাং প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধির উপরই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইতে পারে, এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রধানতঃ কোন্ ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে। খাদ্যের উৎপাদনে ও কৃষিজ উৎপাদনের স্বল্পতা দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও বৈদেশিক ব্যালান্সের ঘাটতি বাড়াইয়া দিয়াছে। অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয়ের দরুণ এবং স্বল্পকালের মধ্যে ফলপ্রসূ (short fruition lags) বিনিয়োগ না থাকায় দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামস্তরে বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনার ব্যয়ভার বাড়িয়া গিয়াছে, পূর্বের পরিকল্পিত হিসাবে আর পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব হইতেছে না। করভার বৃদ্ধি সত্ত্বেও চল্‌তি আয় হইতে উদ্বৃত্ত বেশি তোলা যাইতেছে না। ঋণ হইতে ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে বেশি অর্থাগম হইতেছে না। বৈদেশিক সম্বলের গুরুতর অভাব ঘটিতেছে।

কোন্ ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধন (Revision of the Second Plan)

এই সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল (National Development Council) এবং ভারত সরকার মিলিয়া পরিকল্পনাকে কিছুটা ছাঁটকাট (pruning) করিয়াছেন। পরিকল্পিত প্রায় সকল কার্যসূচীই সুরু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কাটছাঁট করার সুবিধাও অপেক্ষাকৃত কম। পরিকল্পনাকে তাই 'ক' ও 'খ' দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল কার্যসূচী সফল করা নিতান্তই দরকার অথবা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের 'ক' অংশের (Part 'A') অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অংশের জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেই হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই সকল কার্যসূচীকে বলা হইয়াছে পরিকল্পনার অন্তঃস্থল (hard core of the plan)। এই অংশের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যসূচী, ইস্পাত কারখানাগুলি, রেলপথ, প্রধান বন্দর, কয়লা এবং কয়েকটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র—প্রভৃতি বিষয় ধরা হইয়াছে। 'খ' অংশের (Part 'B') মধ্যে ৩০০ কোটি টাকার অবশিষ্ট পরিকল্পিত কার্য-

অন্তঃস্থল রক্ষার নীতি

সূচীগুলিকে ধরা হইয়াছে। সম্বলে কুলাইলে ইহাদের কার্যকরী করা হইবে বলা হইয়াছে।

১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনা কমিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন[৮] যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ৪২৬০ কোটি টাকার বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, পূর্বের তুলনায় ৫৪০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িতেছে। তবুও যে কোন উপায়ে ৪৫০০ কোটি টাকার 'ক' অংশকে সম্পূর্ণ করিতেই হইবে। নীচে সংশোধিত অর্থ-সংগ্রহের উৎসগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল :

উৎস	পূর্ব পরিকল্পিত লক্ষ্য	সংশোধিত হিসাবে—কতখানি পাওয়া সম্ভব
(১) চল্‌তি আয়ের উদ্বৃত্ত	১২০০*	৮৯৯
(২) রেলপথ	১৫০	২৫০
(৩) ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়	১২০০	১০৪৪
(৪) ভাসমান ঋণ ও সরকারী খাতে বিবিধ জমা	২৫০	৬৯
(৫) বৈদেশিক সাহায্য	৮০০	১০৫৮
(৬) ঘাট্‌তি ব্যয়	১২০০	১২০০
	৪৮০০	৪২৬০

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলা হইয়াছিল যে 'ক' অংশের কার্যসূচী সফল করিতে হইলেই (জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায়) আরও অন্তত ১৫০ কোটি টাকা নিতান্ত দরকার, এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ (৪৫০০+ ১৫০) ৪৬৫০ কোটি টাকায় তুলিতে হইবে[৯]।

---

৮ Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan, May 1958.

* ইহার মধ্যে পরিকল্পিত ৮০০ কোটির সহিত ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক যোগ করা হইয়াছে, কারণ উহাও অতিরিক্ত কর দ্বারা তোলা হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল।

৯ পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই ১৫০ কোটির মধ্যে ১৪০ কোটি টাকা রাজ্য-সরকার-গুলিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের বাকী সময়ের মধ্যেই তুলিতে হইবে। অতিরিক্ত করের দ্বারা ৬০ কোটি টাকা, ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয়ের দ্বারা ৫০ কোটি, ও পরিকল্পনার বহির্ভূত খরচ বাঁচাইয়া ৩০ কোটি টাকা জোটাইতে হইবে, ইহাই পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত। রাজ্য-সরকারগুলির বাজেটের বর্তমান অবস্থায়, রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে, দেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থার দরুণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিজেদের প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের ফলে রাজ্য-সরকারগুলি কতদূর এই অর্থ উঠাইতে পারিবে তাহা চিন্তার বিষয়।

পরিকল্পনার সংশোধনের ফলে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের যে নূতন তালিকা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া হইল।

বিষয়	পরিকল্পনার পূর্ব বরাদ্দ	শতকরা কত অংশ	সংশোধিত হিসাব (পরিকল্পনার 'ক' অংশ)	শতকরা কত অংশ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১১.৮	৫১০	১১.৩
২। জলসেচ ও বিদ্যুৎ	৯১৩	১৯.০	৮২০	১৮.২
৩। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প	২০০	৪.২	১৬০	৩.৬
৪। শিল্প ও খনি	৬৯০	১৪.৪	৭৯০	১৭.৫
৫। পরিবহন ও সংযোজন	১৩৮৫	২৮.৯	১৩৪০	২৯.৮
৬। সমাজ সেবা	৯৪৫	১৯.৭	৮১০	১৮.০
৭। বিবিধ	৯৯	২.০	৭০	১.৬
মোট	৪৮০০	১০০	৪,৭০০	১০০

উপরের তালিকাতে দেখা যাইতেছে, বিদেশী যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্প ও খনি খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াইতে হইয়াছে। সকল খাতেই ব্যয় কমাইতে হইয়াছে, ইহার মধ্যে সমাজসেবামূলক কার্যাদিতে হ্রাসের পরিমাণই সর্বাধিক। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে, সঠিক হিসাবের ভিত্তিতে এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান হয় নাই, অনেকটা আন্দাজের ভিত্তিতে করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এত বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াও কমিশন নিছক অর্থভিত্তিক পরিকল্পনার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং দ্রব্য ও উপকরণের ভিত্তিতে নিখুঁত পরিকল্পনা গড়িয়া তোলেন নাই।

সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের সমালোচনা

পরিকল্পনার প্রথম হিসাবে কৃষির বাহিরে ৭৯ লক্ষ এবং কৃষিতে ১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলা হইয়াছিল। বিভিন্ন কার্যসূচীর জন্য খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় হিসাব করা হইয়াছিল, ৪৮০০ কোটি টাকার সরকারী ব্যয় ও হিসাব মত বেসরকারী ব্যয়ের দ্বারা অতিরিক্ত ৭০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে। সরকারী ক্ষেত্রে সংশোধিত ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের ফলে বর্তমান হিসাবে অতিরিক্ত ৬৫ লক্ষ লোকের বেশি কর্মসংস্থান হইতে পারিবে না।

কর্ম-সংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছান যাইবে না

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি দিক সম্পর্কে সমালোচনা (Critical evaluation of some of the aspects of the Second Plan)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা বহু দিক হইতেই করা হইতেছে। অধ্যাপক মহলানবীশ যে কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন সেই কাঠামোকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিয়া বহুপ্রকার স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে নিছক অর্থের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা এবং সদিচ্ছা ভারত সরকারের নাই। আট বছর পরিকল্পনার পরেও শেয়ার বাজারের ফাট্‌কাদারীর সাহায্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাদার যদি দেশে শিল্পসাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে তবে তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। যদি পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিকদেব দ্বারা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তবে পরিকল্পনায় জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরিকল্পনার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ত্রুটি তিনটি ; (ক) দ্রব্যভিত্তিক পরিকল্পনা গঠন না করা (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রের আরও সঙ্কোচন না করা, এবং (গ) শ্রমিক কৃষকের সহযোগিতায় উৎপাদন ও বণ্টনকাঠামো গড়িয়া না তোলা। ইহারাই মূল ত্রুটি ; পরিকল্পনা কৌশলের ছোটখাটো বিচ্যুতিসমূহ দেশের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা নহে।

পরিকল্পনার মূল তিনটি ত্রুটি উহার ভুল দর্শন হইতে উদ্ভূত

পরিকল্পনা কৌশলের বহু ত্রুটির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পরিকল্পনার বৃহৎ কার্যসূচীগুলিতে (যেমন, ইস্পাত কারখানা) কত পরিমাণ আমদানি করা দরকার তাহার হিসাবে ত্রুটি ছিল। সেই সকল আমদানি পরিকল্পনাকালের প্রথম দিকেই করিতে হইবে তাহা ধরিয়া লওয়া উচিত ছিল। ভোগ্যবস্তুর আমদানি আরও কমাইলে চলিত। পরিকল্পনা কমিশনের নীতি আমদানি নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষ মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দগুলির হিসাব খুবই সঠিক হওয়া দরকার। যদি হিসাবগুলি বেঠিক হয় তবে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরণের ভারসাম্যবিহীনতা দেখা দিতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুমিত হিসাব অপেক্ষ বাস্তবে ব্যয় বেশি হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ, অনেকে মনে করেন

আমদানির হিসাবে গলদ

অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা সকল ক্ষেত্রেই বাস্তব ব্যয় বেশি

যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা উচ্চাভিলাসী (ambitious) হইয়াছে। এই সমালোচনা সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার।

উচ্চাভিলাষিতার অভিযোগ ঠিক নহে

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথাই হইল দেশে শিল্প প্রসার। শিল্প বাড়াইতে হইলে প্রথম দিকে মূল ও ভারি শিল্প বাড়ান প্রয়োজন, কারণ ইহারাই যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে পারে। দেশে মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারির ভিত্তি যত শক্ত ও প্রশস্ত (strengthened and broadened) হয়, ততই দেশটিতে শিল্প প্রসারের গতি দ্রুত হইবার সম্ভাবনা। সেই দিক হইতে বিচার করিলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছাপাইয়া উন্নয়নের হার রক্ষা করিতে হইলে এইরূপ বৃহৎ ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া নিশ্চয় সঠিক হইয়াছে।

কথা হইল কার্যকরী করা

এইরূপ পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়: (ক) ভারি শিল্প প্রসারের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রকৃত উপকরণ (real resources) দেশে আছে কি না, এবং (খ) ভারি শিল্পে বিনিয়োগের দরুণ দেশে যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চারিত হইবে তাহার চাপ সহ্য করার মত ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িবে কি না। এই দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করা হইলে বহুবিধ অসুবিধা দেখা দিতে থাকে।

প্রকৃত উপকরণের অভাব নাই

ভারতে ভারি শিল্প প্রসারের উপযুক্ত উপকরণের অভাব নাই, কেবল যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক এবং কতিপয় যন্ত্র ও কাঁচামাল বিদেশ হইতে আনা দরকার। সুতরাং, সেই দিক হইতে পরিকল্পনা কমিশন কোন ভুল করেন নাই এবং জনসংখ্যার গতি বিচার করিলে বর্তমানের প্রকৃত উপকরণগুলিকে মূল ও ভারি শিল্পে নিয়োগের প্রস্তাব খুবই গ্রহণযোগ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বৈজ্ঞানিক যুগে কুটির শিল্পের সাহায্যে উৎপাদন কতখানি বাড়ান যায়, তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহাতে খরচও বেশি পড়ে। তাহা ছাড়া, মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইলে উহাদের সাহায্যে ভবিষ্যতে ভোগ্য দ্রব্যের কলকারখানা গড়িতেই হইবে, তাহা না হইলে উহারা কি গুদামজাত হইয়া নষ্ট হইবে? ইহাদের উৎপাদনে খাটাইতেই হইবে। তখন এই সকল কুটির শিল্প কি উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে অথবা কেবলমাত্র সংস্কারের

বশে এই সকল প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক ব্যয়বহুল উৎপাদনপদ্ধতি চালু রাখার জন্য রাষ্ট্র উহাদের সাহায্য করিতে থাকিবে? সুতরাং কুটির শিল্পের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ না করিয়া উহার সাহায্যে কয়েকটি ভোগ্য দ্রব্যের শিল্প স্থাপন করিলেই ভাল হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের জনসাধারণ দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট ভবিষ্যতে উন্নতির সঠিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে তাহারা নিশ্চয় কষ্ট স্বীকারে রাজি হইত। সকলের কষ্টের পরিমাণ সমান না হইলে লোকে ত্যাগ স্বীকারে রাজি হয় না, কেবলমাত্র দেশ-প্রেমের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে চাহে না। সুতরাং রেশনিং-এর সাহায্যে ভোগ্য দ্রব্যের সমান বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দরকার ছিল, তাহা করিলেই মূল ও ভারি শিল্পের উৎপাদন কৌশল সাফল্য লাভ করিতে পারে, উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ান দেশপ্রেমিক কাজ বলিয়া গণ্য হয়, মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে না, বা হইলেও সহ্য করার মত মনোবল গড়িয়া উঠে। খাদ্যবস্ত্র ও ভোগ্য দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থা বেসরকারী ফাট্‌কাদার ব্যক্তিদের হাতে ছাড়িয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব নয়, জনসাধারণও ধনীকে আরও ধনী করার এবং গরীবকে আরও গরীব করার এইরূপ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসে না। ইহা অতি নিষ্ঠুর সত্য যে, এই পথে চলিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিবে না; খাতায় পত্রে হিসাবে তথ্যে সফলতা দেখান গেলেও দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ সম্ভব হইবে না।

কুটির শিল্পের উপর অপব্যয় না করিয়া

জনসাধারণের সহযোগিতায় ভোগ্য দ্রব্যের বণ্টন রাষ্ট্রের হাতে তোলা উচিত

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনা (Comparison of the two Plans)

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য নাই। উভয় পরিকল্পনাতেই বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, বিভিন্ন খাতে কত ব্যয় হইবে তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থের হিসাবেই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই আকৃতিগত মিলের অন্তরালে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যই বেশি চোখে পড়ে। ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ, কোন্ বিষয়ের উপর কতখানি গুরুত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে

আকৃতিতে মিল থাকিলেও প্রকৃতিতে গরমিল

ভারসাম্য স্থাপনের পদ্ধতি, জনসাধারণের ত্যাগের পরিমাণ, ক্রমবৃদ্ধির হার এই সকল বিষয়ে ভারতের এই দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্যই গভীর।

এই দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দুই দিক হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। দুইটি পরিকল্পনার রচনাকালীন ভারতীয় বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা (objective conditions) পৃথক ছিল, ফলে উহাদের প্রকৃতি পৃথক। তাহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনা হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দৃষ্টিভংগির (attitude) পরিবর্তনও কম নয়, প্রথম পরিকল্পনা ছিল সাধারণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে (Subjective Condition) ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে।

এই গরমিলের দুইটি কারণ: (১) বাস্তব অবস্থা (২) দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

বাস্তব অবস্থার পার্থক্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধোত্তর ও দেশবিভাগজনিত অর্থনৈতিক বিশৃংখলা পার হইতে পারে নাই। সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর ও কৃষিজাত কাঁচামালের অভাব ছিল। খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব মিটাইবার জন্যই কৃষি ও জলসেচের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার দরকার ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির যুগে—বর্ধিত কৃষিজ উৎপাদনই তাহার অগ্রগমনের ভিত্তি। তাই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচের জন্য মোট ব্যয়ের ৩৫% বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইল ২২%। শিল্পের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৭৬%; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইল ১৮·৫%।

বাস্তব অবস্থা বিচারানুযায়ী দুইটি পার্থক্য (১) কৃষি ও শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্ব

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে কাঁচামালের স্বল্পতা, বাজারের অভাব এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধের দরুণ ভারতের প্রায় সকল শিল্পই স্বাভাবিক শক্তির তুলনায় কম উৎপাদন করিতেছিল। প্রথম পরিকল্পনায় অব্যবহৃত উৎপাদন শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করাই ছিল প্রধান কার্যসূচী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন উৎপাদনী-ক্ষমতা সৃষ্টি করার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, শিল্প-প্রসারের ভিত্তি প্রশস্ত করার জন্য মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

(২) বর্তমান উৎপাদন শক্তির ব্যবহার ও নূতন উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিস্থাপন

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শের উপর জোর দেওয়ায় দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বহুভাবে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের ভার ছিল প্রধানতঃ বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে।[১০] দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রায় বেশির ভাগই স্থাপিত হইবে সরকারী ক্ষেত্রে এবং সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারই হইবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি।[১১] কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, প্রথম পরিকল্পনায় দেশে মোট বিনিয়োগের অর্ধেকের কিছু কম ছিল সরকারী ক্ষেত্রে (৩১০০ কোটির মধ্যে ১৫০০ কোটি)। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের অধিকাংশই (প্রায় ৬০%) সরকারী ক্ষেত্রে (৬২০০ কোটির মধ্যে ৩৮০০ কোটি টাকা)।

ভাবাদর্শের বিচার অনুযায়ী পার্থক্য
(১) বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের অধিকতর প্রসার

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের ভাবাদর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় তাই এই লক্ষ্যের অনুরূপ কার্যসূচী ছিল না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার বহুবিধ সাহায্য করিবে এরূপ বলা হইয়াছে, সমবায় প্রথার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ব্যক্তির হাতে জমির ও আয়ের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ও এই সকল কার্যসূচী এত সুস্পষ্ট ছিল না।

(২) অর্থনৈতিক শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের উপযোগী কার্যসূচীর

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বড় এবং ইহার প্রচেষ্টাও অনেক ব্যাপক। উভয় পরিকল্পনার বিনিয়োগের পরিমাণের দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল ২৪০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ হইল ৪৮০০ কোটি টাকা। দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণও দ্বিগুণ করা হইয়াছে (৩১০০ কোটি হইতে ৬২০০ কোটি টাকা)।

(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বড় ও ব্যাপক

---

১০ প্রথম পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারে ব্যয় হইয়াছে ৬০ কোটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইয়াছে ৩৩৩ কোটি।

১১ দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে ৬৯০ কোটি টাকা (খনিসহ এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বাদ দিলে), বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে ৭২০ কোটি টাকা।

কর্ম সংস্থানের প্রসার ঘটান প্রথম পরিকল্পনার কোন লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হয় নাই ; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মনিয়োগের প্রসার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

(৪) ইহাতে কর্ম সংস্থান

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাট্‌তি ব্যয় পদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার ২৯০ কোটি টাকা ঘাট্‌তি ব্যয়ের লক্ষ্য ছিল (মোট ব্যয়ের প্রায় ১/৮ অংশ), কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাট্‌তি ব্যয়ের লক্ষ্য হইল ১২০০ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ১/৪ অংশ)। তাই প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্যতা অনেক বেশি।

(৫) ঘাট্‌তি ব্যয়ের উপর অধিক জোর

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ (Financing the Second Five Year Plan)

প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও প্রধানতঃ অর্থের হিসাবে রচনা করা হইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে তাহা কোন্ কোন্ উৎস হইতে কিরূপে পাওয়া যাইবে পরিকল্পনা কমিশন তাহা আলোচনা করিয়াছেন। নীচে তাহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল :

উৎস		কোটি টাকার হিসাবে
১। **চল্‌তি আয়ের উদ্বৃত্ত**	... ...	৮৮০
(ক) পূর্বেকার করহার অনুযায়ী ৩৫০ (খ) বাড়্‌তি কর বা করহার অনুযায়ী ৪৫০		
২। **জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ**	...	১২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণ ৭০০ (খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ঋণ ৫০০		
৩। **অন্যান্য বাজেটভুক্ত উৎস**	... ..	৪০০
(ক) রেলওয়ে ১৫০ (খ) প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদি ২৫০		
৪। **বিদেশী সাহায্য**	... ...	৮০০
৫। **ঘাট্‌তি ব্যয়**	... ...	১২০০
৬। **অনির্ধারিত ফাঁক**	... ...	৪০০

উপরের এই তালিকা হইতে দেখা যায়, সরকারী বাজেট ও ঋণ প্রভৃতি সূত্র হইতেই মোট ২৪০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১২০০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ⅙ অংশ) ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা পাওয়া যাইবে; বিদেশ হইতে সাহায্যের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা। ইহাতেও মোট ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক থাকিয়া যাইবে, ইহাও আভ্যন্তরীণ উপায়ে তুলিতে হইবে।

১। **কর আদায় (Taxation)**

অপূর্ণোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার বেশির ভাগ অংশ ক্রমশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লইয়া আসিতে পারিলে উন্নয়নের গতিবেগ ক্রমশ বাড়িতে পারে। কর ধার্য করা হইল এই সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইয়া আসার প্রধান অস্ত্র। পরিকল্পনাকালে জনসাধারণের হাত হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি তুলিয়া লওয়া যায়, ততই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে ও বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। এই কথা মনে করিয়াই ভারতীয় কর কাঠামোকে সংস্কার করা দরকার। যাহাতে কর-ভিত্তি (Tax-base) গভীরতর এবং প্রশস্ততর হয় (deeper and wider), সেই চেষ্টা করাই ভারত সরকারের কাজ। তাহা ছাড়া, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে লোকের হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন তৎক্ষণাৎ বাড়িতে পারে না। কম পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্যের উপর অধিক অর্থ চাপ দিতে থাকে, ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায় ও কালক্রমে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি সমগ্র পরিকল্পনাটিকেই বানচাল করিয়া দিতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ধার্যের দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে এই অর্থ তুলিয়া লওয়া তাই খুবই দরকার। সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করিতেও করব্যবস্থা যথেষ্ট সাহায্য করে। আয়-বৈষম্য কমাইয়া ধনীর হাত হইতে অধিক অর্থ সরাইয়া বিনিয়োগের বা সমাজ সেবামূলক কার্যাদির মাধ্যমে গরীবদের হাতে সেই অর্থ পৌছাইয়া দেওয়া কর-ব্যবস্থার কাজ।

উন্নয়নমূলক কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর-আরোপের উপর বেশ জোর দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের কর-হার অনুযায়ী যে ৫০০০ কোটি

টাকা এই পাঁচ বছরে পাওয়া যাইবে তাহা হইতে ৪৬৫০ কোটি টাকা অনুন্নয়নমূলক (non-developmental) ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় (maintenance expenditure) হিসাবে বাদ দিয়া এই ৩৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এইরূপ ধরা হইয়াছে। নূতন কর আরোপ করিয়া বা পুরাতন করগুলির হার বাড়াইয়া কমপক্ষে ৪৫০ কোটি টাকা তুলিতেই হইবে। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি উভয়ে ২২৫ কোটি করিয়া তুলিবে। এইরূপে পাওয়া মোট ৮০০ কোটি টাকাকেও পরিকল্পনা কমিশন পর্যাপ্ত মনে করিতেছেন না। যে ৪০০ কোটি টাকার অনির্ধারিত ফাঁক আছে তাহাও কর ধার্যের দ্বারা তুলিলে ভাল হয়, ইহাই পরিকল্পনা কমিশনের মত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে বিভিন্নপ্রকার নূতন নূতন কর ধার্য করা হইলেও কর আদায়ের পরিমাণ ততটা বৃদ্ধি পাইতেছে না।

কর-আদায়ের পরিমাণ

প্রথম পরিকল্পনাকালের সুরুতে ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের ৬৬% কর আদায় হইত, পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা ৭.৯% হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া পরিকল্পনাকালের শেষ বৎসরে ১০% করার কথা বলা হইয়াছে। এই পরিমাণ কর উঠান কতদূর সম্ভবপর তাহাতে সন্দেহ আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কর আরোপের ফলে ব্যক্তিক্ষেত্র হইতে সঞ্চয় রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সরিয়া আসিয়া বিনিয়োগযোগ্য সরকারী মূলধনে পরিণত হয় ইহা ঠিকই। কিন্তু করব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাহাতে (ক) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ কম না পড়ে, এবং (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক্ষতিজনক হইয়া না পড়ে। ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষমতা ইচ্ছা বজায় রাখিয়া উন্নয়নমূলক করব্যবস্থার (developmental taxation) এইরূপ কাঠামোই গড়িয়া তোলা দরকার।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত আয়ের অনেকাংশই সৃষ্টি হইবে কৃষির ক্ষেত্রে। কর অনুসন্ধানী কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, সহরাঞ্চলে করপাতের (incidence of Taxation) পরিমাণ (৬.৫%) গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৫.১%)। তাহা ছাড়া সহরে কলকারখানায় তৈয়ারী জিনিস গ্রামের লোকেরা কমই ব্যবহার করে, তাই দ্রব্যাদির উপর উপজ কর (excise duties) তাহারা

আয় বাড়িবে কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু কর বাড়িবে শিল্পক্ষেত্রে

অনেকটা এড়াইয়া যাইতে পারে। তাই পরোক্ষ-কর আরোপ না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে কৃষি আয়করের উপর জোর দিয়াই গ্রামাঞ্চল হইতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ান দরকার।

২। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Borrowings from the Public)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ সফল করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয়কে বিনিয়োগের কাজে লাগান যায়। যদি এমন ধরণের বিনিয়োগে উহাকে নিয়োগ করা হয় যে তাহা হইতে রাষ্ট্রের আয় ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তবে সেইরূপ ঋণ গ্রহণ করা ভালই।

ঋণের সুবিধা ও বিপদ

ঋণ গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ঋণ করিয়া যদি বিনিয়োগের ধরণ সঠিক না হয়, তবে সেই ঋণের ভার দেশের সাধারণ লোকের উপর চাপিয়া বসে। তখন সুদ ও ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে গরীবশ্রেণীর নিকট হইতে টাকা ঋণদানকারী ধনীশ্রেণীর নিকট চলিয়া আসে। সর্বোপরি, ঋণদানের পথ উন্মুক্ত থাকিলে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের শিল্পে অর্থবিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া যাইতে পারে, সাধারণভাবে ঝুঁকিবিহীন সরকারী ঋণপত্রে মূলধন খাটাইবার ইচ্ছা বাড়িতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঋণের স্থান

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল খুব কম, তাই পরিকল্পনায় ১১৫ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ৮৯ কোটি টাকা অধিক ঋণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসাধারণের নিকট হইতে ৭০০ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করা হইবে বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে ইহাকে খুব বেশি বলা চলে না, তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্বের ৪৩০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ-যোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে, ফলে স্থূল ঋণ ১১৩০ কোটি টাকা হইবে। ইহা কম নয়।

ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫০০ কোটি টাকা। এই উপায়ে আরও অধিক অর্থ তোলা চলিতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। লোকে কর দেওয়া অপেক্ষা নিশ্চয়ই ঋণ

দেওয়া অধিক পছন্দ করে। বর্তমানে পরিকল্পনার দরুণ যে আয় বাড়িতেছে, তাহা সবই রাষ্ট্র যদি ঋণ হিসাবে তুলিয়া লয় এবং সুদসহ ভবিষ্যতে শোধ দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা হইলে স্বল্প আয়কারীদের ঋণ দিতে বাধা থাকিবে না। বরং তাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা এবং অধিক আয়কারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর আদায় করিলে আয়বৈষম্য কমিতে পারে।

৩। **অন্যান্য উৎস (Other sources)**

সরকারীক্ষেত্রে পরিচালিত রেলপথ হইতে পাওয়া যাইবে ১৫০ কোটি টাকা (কিন্তু এই রেলপথ উন্নয়নের জন্য খরচ হইবে ৯০০ কোটি টাকা)। প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রেলবোর্ড ১১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় তাহাদের দেয় ১৫০ কোটি টাকা খুবই কম বলিতে হইবে।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও অন্যান্য জমার খাত হইতে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে, এই হিসাব বর্তমানের ধারা অনুযায়ী গণনা করা হইয়াছে (Projection of the current trend)। সুতরাং ইহা কম কি বেশি তাহা কিছু বলা যায় না।

৮০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে বলা হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য (ঋণ ও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে ২৯৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৮৮ কোটি টাকা পাঁচবৎসরে ব্যবহৃত হইয়াছে, বাকী ১০৮ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হইবে বলিয়া রাখা হইয়াছে। বৎসরে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা (৮০০ ÷ ৫) বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে, ইহা খুবই বেশি বলিয়া মনে করা চলে।

৪। **ঘাট্‌তি ব্যয় (Deficit Financing)**

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৪২০ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১২০০ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওয়া সম্ভব হইবে, তাই ভারতের অর্থনৈতিক দেহে এই কারণে মোট ১০০০ কোটি টাকার মত অর্থ বৃদ্ধি করা হইবে বলা হইতেছে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কগুলিতে জমার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় উঁহারা ঋণের পরিমাণ

বাড়াইয়া দিবে। ইহা ছাড়া অনির্ধারিত ৪০০ কোটি টাকা কোথাও হইতে না পাওয়া গেলে ঘাট্‌তি ব্যয়ের চেষ্টা করা হইবে এরূপ বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ৭০২ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইয়াছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ২১৫ কোটি টাকা করা হইবে ঠিক হইয়াছে। ফলে মোট ৯১৭ কোটি টাকার মত ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইয়াছে, বলা চলে। সুতরাং বাকী দুই বৎসরে অন্ততঃ ২৮৩ কোটি টাকার ঘাট্‌তি ব্যয় করা হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানের উঠ্‌তি দামস্তর বিচার করিয়া এতটা ঘাট্‌তি ব্যয় করা উচিত কি না, তাহা বিচারের বিষয়। তাহা ছাড়া, কৃষির ও শিল্পের উৎপাদনে কিছুটা হ্রাসের ফলে আরও অধিক অর্থ বাজারে ছাড়া উচিত কি না তাহাও সন্দেহজনক, আরও বেশি ঘাট্‌তি ব্যয় করার আগে সরকারের উচিত (ক) কৃষি উৎপাদন বাড়ান, (খ) শিল্পের উৎপাদন বাড়ান, ও (গ) বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা। তবেই মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে।

পরিশিষ্ট

ঘাট্‌তি ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (A short note on deficit financing)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা অর্থের পরিমাণতত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন, কারণ তাঁহারা সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান আছে ধরিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র যদি সমাজে নূতন অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবেই। সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের শিক্ষানুযায়ী ঘাট্‌তি ব্যয় পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে কেইন্‌সের যুগান্তকারী বই-এর (General theory of Employment, Interest & Money) পরে এইরূপ ধারণাতে পরিবর্তন আসিয়াছে।

ক্লাসিকাল ও নব্য মত

যে সকল দেশে বেকারি থাকে, সেখানে ঘাট্‌তি ব্যয়ের দ্বারা কর্মসংস্থান বাড়ান যাইতে পারে, ইহাই কেইন্‌সের মত। দেশে প্রভূত উপকরণ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে এবং রাষ্ট্র ঘাট্‌তি ব্যয় করিলে এই সকল উপকরণগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ

বাড়াইয়া দেয়।" সমাজে যতক্ষণ বেকার উপকরণ থাকে ততক্ষণ ঘাটতি ব্যয় কর্মসংস্থান বাড়ায়, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে বা উহার কাছাকাছি পৌছিয়া আরও ঘাটতি ব্যয় করিলে তাহা দামস্তর বাড়াইয়া তোলে।

অপূর্ণোন্নত দেশের অবস্থা ক্লাসিক্যাল মত গ্রহণের উপযোগী

অনেকে মনে করেন, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে কেইন্সীয় তত্ত্বের তুলনায় ক্লাসিকাল বিশ্লেষণ অধিকতর প্রযোজ্য। এই সকল দেশে অতি নিম্ন আয়ের স্তরে হইলেও এক ধরণের পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা বজায় থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় কৃষিতে অধিক লোক নিযুক্ত থাকে এবং এইরূপ "প্রচ্ছন্ন বেকারি" বাদ দিলে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর আছে বলিয়াই মনে করা চলে। এই সকল দেশে, তাই, তাঁহাদের মতে ঘাটতি ব্যয়ের, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা খুবই বেশি।

আধুনিক কালে অপূর্ণোন্নত দেশগুলির উন্নয়নতত্ত্বে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য লওয়া প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সরকার যদি নোট ছাপাইয়া কাজ চালান তবে অব্যবহৃত উপকরণগুলির নিয়োগ সুরু হইবে, আয়; সঞ্চয়, মূলধন গঠনের ধারা সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, (কর, সরকারী শিল্পসমূহ হইতে আয়, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, জমা ও অন্যান্য উৎস হইতে) সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যতটা বেশি তাহাকে ঘাটতি ব্যয় বলে।

ভারতীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন

প্রশ্ন হইল, ভারত সরকারের পক্ষে এত বেশি ঘাটতি ব্যয় করা উচিত কি না। ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও-এর মতে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে স্বল্প কালে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবেই, কিন্তু এই সকল বিনিয়োগ হইতে যখন দীর্ঘকালে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে থাকিবে, তখন এই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইবে। অধ্যাপক শেনয়-ও এইরূপ মনে করেন। ডাঃ অমিয় দাশগুপ্তের মতে অপূর্ণোন্নত দেশের পক্ষে ঘাটতি ব্যয় নীতি অবশ্য প্রয়োজনীয়, কারণ এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে মূলধন গঠন ও কর্মসংস্থান—দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতে ১৩০০ কোটি টাকার নোট প্রচলিত আছে, ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করিলে এবং ২০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত ভারতে আসিলে মোট ১০০০ কোটি টাকার নোটের পরিমাণ বাড়িবে,

অর্থাৎ প্রায় ৭৭% বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের মোট উৎপাদন বাড়িবে প্রায় ২৫%। পরিকল্পনাকালে অর্থের প্রচলন বেগ (Velocity of circulation) সমান থাকিলে (গ্রামের লোকজনের হাতে বেশি অর্থ যাইবার দরুণ উহা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল) এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসৃষ্টি খুব বেশি না বাড়িলে তাঁহার মতে প্রতি বৎসর ৯% হইতে ১১% এর বেশী দামস্তর বাড়িতে পারে না। এই পরিমাণ দামস্তর বাড়িলে চিন্তার কোন কারণ নাই বলিয়াই তিনি মনে করেন।

যাহাতে ঘাটতি ব্যয়ের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি দেখা না দেয় সেইজন্য পরিকল্পনা কমিশন নিজেরাই কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষায় বলিতে গেলে:

"A major safeguard is building up of sufficiently large stocks of foodgrains in order to counteract inflationay pressures that may emerge from time to time. No amount of prudence in financial management can by itself eliminate completely the risk of inflation in an economy attempting to develop rapidly. The best defence against inflation is, in a sense, to keep clear of it, but a policy of playing safe is not always conducive to development. A measure of risk has to be undertaken, and the most effective insurance against this risk is command over reserve stocks of foodgrains—and a few other essential commodities—which can be used to augment the supplies in the market as and when necessary. Prices of food and cloth occupy a strategic position in the Indian economy, and a sharp rise in these prices has to be prevented by the use of all available devices. So long as these prices can be maintained at a reasonable levels, the cost of living of the large bulk of the population can be kept under contiol, increases in prices of other commodities would be a matter of comparative unimportance, although any excessive rise in prices anywhere in the system does carry the danger of drawing away of resources into low-priority uses. Corrective action can, however, take care of such a situation. A further defence against inflation is discriminating but prompt use of the instrument of taxation to prevent exesive increases in consumption in certain lines and to mop up the excess profits or windfall gains that deficit financing tends to generate. Finally, physical controls, including rationing and allocations, can be used to prevent consumption from increasing beyond a particular level and for economising scarce materials, or scarce productive resources. But experience of the past suggests that physical controls especially on essential and staple consumer goods are not a device that can be relied upon to function effectively or euuitably for any great length of time. This makes it all the more necessary to utilise to the full all the other available safeguards and correctives, for a curtailment of the plan itself can, in the nature of things, be thought of only in a situation of extreme difficulty." —*Second Five Year Plan*

নবম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

Third Five Year Plan

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইবে ও তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল আরম্ভ হইবে। সুতরাং ইতিমধ্যেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে দূরকালীন পরিকল্পনা বিভাগ (Perspective Planning Division) ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তি হিসাবে একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই খসড়া হইতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি জানা না গেলেও মোটামুটি উহার পরিধি ও কাঠামো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হইতে পারে। বর্তমান ঘটনাসমূহের গতির দিক ও বেগের উপর ভিত্তি করিয়াই এইরূপ খসড়া রচনা করা চলিতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। নিছক অর্থের হিসাবে পরিকল্পনা রচনার সে প্রথা ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেক পরিমাণে বর্জন করা দরকার। আসল দ্রব্যসামগ্রী বা উপকরণই পরিকল্পনার ভিত্তি, কারণ কলকারখানায় বা চাষের ক্ষেতে টাকার সাহায্যে সরাসরি উৎপাদন হয় না; দেশের মাটি, মানুষ আর মেশিন মিলিয়াই সম্পদ সৃষ্টি করে। টাকার সাহায্যে ইহাদের কিনিয়া একটি উৎপাদন কেন্দ্রে জড়ো করা চলে, উৎপাদনের কাজ চালাইবার সময় ইহাদের পাওনা টাকার অঙ্কে হিসাব করা হয়, মোট উৎপাদনের মূল্যও আমরা অর্থেরই হিসাবে পরিমাপ করি। কিন্তু দেশের আসল উপকরণসমূহের পরিমাণ (volume) ও প্রকৃতি-ই (nature) বড় কথা। নিছক টাকার সাহায্যে পরিকল্পনা রচনা করিলে বহু অসুবিধা

অর্থের পর্দার অন্তরালে আসল শক্তির হিসাবই পরিকল্পনার ভিত্তি হওয়া দরকার

দেখা দেয়। আসল উপকরণের (real resources) সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের আসল লক্ষ্য (real targets) স্থির করা দরকার, তাহাতে জনসাধারণের আসলআয় (real income) কিরূপ বাড়িবে তাহা জানিতে পারা যায়। জনচিত্তে যদি পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হয় এবং এই পরিকল্পনায় তাহাদের সহযোগিতা পাইতে হয়, তাহা হইলে টাকা-আনা পাই-এর হিসাব ভেদ করিয়া, টন-মাইল-একরের হিসাবে পৌছান দরকার।

যাহারা এই পরিকল্পনা সফল করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব অনেকাংশে দেওয়া দরকার

পরিকল্পনার সহিত জনচিত্তের সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে উপর হইতে পরিকল্পনা রচনা করিয়া জনসাধারণকে দিয়া উহা কার্যকরি করিয়া লওয়ার পদ্ধতি ও এইরূপ মনোবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। যদি এই পরিকল্পনাকে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই বলা হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক পথেই ইহা রচনা হওয়া উচিত। প্রতিটি কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে ও গ্রামে পঞ্চায়েত বা সমবায় সমিতির হাতে আগামী পাঁচ বছরে সরকারী পরিকল্পনার কর্মসূচী নির্মাণ তুলিয়া দেওয়া দরকার। উৎপাদন বাড়াইবার সেই নীতি অনুযায়ী শ্রমিকেরা ও চাষীরা—যাহারা সত্যসত্যই উৎপাদন করে—ঠিক করিবেন যে নিজ নিজ ক্ষেত্রের উৎপাদন কতখানি বাড়াইতে হইলে তাঁহাদের কোন ধরণের উপকরণ কখন দরকার। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের সাহায্য করিবেন, নূতন যন্ত্রপাতি লইয়া গবেষণার ফল ও উহার উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রভৃতি তাহাদের নিকটপৌছাইয়া দিবেন,পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের রচিত বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনা জোড়া লাগাইয়া সামগ্রিক এক কাঠামো দাঁড় করাইবে। ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে দেশের সুদূর অঞ্চলেও যে সংগঠন, প্রস্তুতি ও উৎসাহ দেখা যায়, ৫ বৎসর অন্তর পরিকল্পনা রচনার সময়েও সেইরূপ সচেতনতা ও সক্রিয়তা নিশ্চয় সৃষ্টি করা সম্ভব। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ উৎপাদনের স্থান কাল পাত্র হইতে দূরে থাকিয়া যে পরিকল্পনা রচনা করেন সেই পরিকল্পনা হইতে অধিক ভুল এই গণপরিকল্পনায় থাকিবে না; আর ভুল থাকিলে শ্রমিকেরা ও কৃষকেরা নিজেদের দায়িত্বে ও অভিজ্ঞতার আলোকে উহা পূরণ করিয়া লইবে। পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে, নিজেদের পরিকল্পনা সফল করার আগ্রহে প্রতিপদে নিজেদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইবার পথ

নিজেরাই খুজিয়া বাহির করিবে। তাহাদের এই নিজস্ব তাগিদ যদি ছাড়া না পায়, তবে ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো গড়িয়া উঠিবার বেগ সৃষ্টি হইবে না। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিবেগ কখন উপর হইতে চাপান যায় না।[১]

উপরের এই সাধারণ নীতি দুইটি মানিয়া লইলে তৃতীয় পরিকল্পনা বহু পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে এবং উহা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই দুইটি নীতি অবলম্বন করিলে তৃতীয় পরিকল্পনার যে রূপ দাঁড়াইবে তাহাই সত্যকার পরিকল্পনা এবং তাহাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সঠিক পথে ও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারিবে।

দূর-প্রসারী পরিকল্পনাকারীগণ (Perspective planners) যে খসড়া রচনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার[২]। ১৯৬০-৬১ সালের মোট জাতীয় আয় ধরা হইয়াছে ১২,৫০০ কোটি টাকা, পাঁচ বছরে ১৯৬৫-৬৬ সালে উহাকে ১৭০০০ কোটি টাকায় তুলিতে হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া লক্ষ্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে কর্মসংস্থানে বৃদ্ধি। পরিকল্পনাকালের মধ্যে অতিরিক্ত যে পরিমাণ জনসংখ্যা কাজে যোগদানের বয়সে পৌঁছিবে তাহাদের সকলকে কাজ দেওয়া এই পরিকল্পনার লক্ষ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য পরিকল্পনা-কার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১০০০০ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ৬৭০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে এবং ৩৩০০কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে।

দূরপ্রসারী পরিকল্পনা দপ্তরের খসড়া

বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ব্যয় কিরূপ হইবে খসড়াতে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। নীচে তালিকার আকারে উহা দেখান হইল:

---

১ তাহা হইলে বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া সরকারী পরিচালিত সমবায় অন্দোলন বিফল হইত না।

২ এই খসড়া পরিকল্পনা নিতান্তই প্রাথমিক, অসম্পূর্ণ—কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের চিন্তাধারা কোন পথে প্রবাহিত তাহার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে বলিয়া ইহা আলোচিত হইল। এই খসড়া নিতান্ত নমুনামাত্র, তবে গৃহীত পরিকল্পনা ইহা হইতে খুব বেশি পৃথক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(কোটি টাকার হিসাবে)

	বিষয়	মোট বরাদ্দ	শতকরা কত অংশ
১।	বৃহৎ শিল্প	২০০০	২০%
২।	পরিবহন ও সংযোজন	১৭০০	১৭%
৩।	শক্তিউৎপাদন	৭০০	৭%
৪।	খনি ও খনিজ তৈল	৩০০	৩%
৫।	ক্ষুদ্রশিল্প	৩০০	৩%
৬।	কৃষি ও জলসেচ	১৫০০	১৫%
৭।	বাসযোগ্য গৃহনির্মাণ	১৮০০	১৮%
৮।	স্কুলকলেজ হাসপাতাল	৬০০	৬%
৯।	অন্যান্য নির্মাণ কার্য	৪০০	৪%
১০।	মজুত ও বিবিধ	৭০০	৭%
		১০,০০০	১০০%

ইহার মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিভাগ খসড়াতে কিরূপ করা হইয়াছে তাহা নীচের তালিকাতে দেওয়া হইল :

	বিষয়	(কোটি টাকার হিঃ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র	(কোটি টাকার হিঃ) ব্যক্তিক্ষেত্র
১।	বৃহৎ শিল্প*	১৩০০	৭০০
২।	পরিবহন ও সংযোজন	১৬৫০	৫০
৩।	শক্তি উৎপাদন	৬৫০	৫০
৪।	খনি ও খনিজ তৈল	২০০	১০০
৫।	ক্ষুদ্রশিল্প	২০০	১০০
৬।	কৃষি ও জল সচ	১১০০	৪০০
৭।	বাসযোগ্য গৃহনির্মাণ	৬০০	১২০০
৮।	স্কুল কলেজ হাসপাতাল	৫০০	১০০
৯।	অন্যান্য গৃহনির্মাণ	১০০	৩০০
১০।	মজুত ও বিবিধ	৪০০	৩০০
		৬৭০০	৩,৩০০

* ইহার মধ্যে মুল ও ভারি শিল্পে সরকারী ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

কিরূপে এই অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহার সম্বন্ধেও খসড়াতে উৎস-নিরূপণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ন্যায় কোনরূপ অনির্ধারিত ফাঁক এই পরিকল্পনায় রাখা হয় নাই। নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল :

(কোটি টাকার হিসাবে)

উৎস	মোট আদায়
১। কর	৯,৫৫০
২। সরকারী শিল্পসমূহ হইতে উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ লাভ)	১,০০০
৩। খাদ্যশস্যের ব্যবসা হইতে আয়	৮৫০
৪। সঞ্চয় ও ঋণ	৫০০
	১১,৯০০

সরকারী শাসন চালান এবং চল্‌তি উন্নয়নের কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে ৬২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ধরা হইয়াছে ; ফলে বিনিয়োগের উপযুক্ত ৫,৭০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বাকী ১০০০ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সাহায্য বা ঋণ হিসাবে আসিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

খসড়াতে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৮% কর আদায় হইতেছে, এই হারে পাঁচ বছরে পাওয়া যাইবে মোট ৬০০০ কোটি টাকা। বস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের উপর তাহাদের মূল্যের ১০% হারে অতিরিক্ত কর বসাইয়া পাওয়া যাইবে ৪৫০ কোটি ; অতিরিক্ত কোম্পানী কর, সম্পদ কর, আয়কর প্রভৃতি হইতে ৪০০ কোটি ; কৃষি উৎপাদনের উপর কর এবং ভূমিরাজস্ব হইতে ২৭০০ কোটি টাকা। সরকারী শিল্পসমূহ হইতে ১০০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্তের মধ্যে ধরা হইয়াছে, রেল হইতে ৩৫০ কোটি টাকা, ইস্পাতশিল্প হইতে ৪৫০ কোটি টাকা, সারের কারখানা হইতে ৫০ কোটি টাকা এবং কয়লা, তেল, ঔষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অন্যান্য সরকারী শিল্প হইতে ১৫০ কোটি টাকা। খাদ্যশস্যের ব্যবসা হইতে পাওয়া যাইবে ৮৫০ কোটি টাকা ; এই হিসাবের ভিত্তি হইল যে, পরিকল্পনাকালে প্রতিবৎসরে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত হইবে।

অর্থসংগ্রহের সূত্র

পরিকল্পনাকালে মোট ১,৮৮৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ঘটিবে (মোট ব্যয়ের প্রায় ৯%)।

এই সময়ের মধ্যে ভারতকে ১৮৯০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি, ৩০০০ কোটি টাকার শিল্পের কাঁচামাল এবং ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যদ্রব্য —মোট ৫,৩৯০ কোটি টাকার আমদানি করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে ভারত রপ্তানি করিয়া পাইবে ৪,৩৭৫ কোটি টাকা। রপ্তানি হইতে এই পরিমাণ আয় এবং ১০০০ কোটি টাকার বিদেশী ঋণ বা সাহায্য উভয়ে মিলিয়া মোট আমদানির কাজ চলিয়া যাইবে।

বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা

খসড়াতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আগামী ১০ বছরে জনসংখ্যা বাৎসরিক ২% হারে বৃদ্ধি পাইবে, সহরাঞ্চলে ৪% হারে এবং গ্রামাঞ্চলে ২% এর কিছু কম হারে। গ্রামাঞ্চলে বৎসরে ৫৬ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ৪০% (প্রায় ২৪ লক্ষ) প্রতি বৎসর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপযোগী হইবে। কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির হার ধরা হইয়াছে প্রতি বৎসর ৫%, এইরূপ বর্ধিত কৃষি -উৎপাদনের কর্মযজ্ঞে গ্রামাঞ্চলে বর্ধিত শ্রমিক সংখ্যার কর্ম সংস্থান হইয়া যাইবে। গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান বা মাথাপিছু আয় কিছুটা বাড়িবে, কারণ ২% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় ৫% উৎপাদন বাড়িতে থাকিবে।

জনবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান

সহরাঞ্চলে, জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ৩·৫% হারে বাড়িবে এবং ইহার $\frac{১}{৩}$ অংশ, অর্থাৎ মোটামুটি ১১ লক্ষ লোক বৎসরে শ্রমের বাজারে হাজির হইবে। ইহাদের হয় চাকুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে নতুবা নিজে আয় করার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারসাম্যের সহিত উন্নতি করিতে হইলে ৪০% কর্মসংস্থান খনি ও বৃহৎশিল্পে হওয়া দরকার—খসড়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে।

অনুশীলনী

1. The first Five Year Plan has accorded the highest prio-ity to agriculture How do you think this emphasis on agriculture is justified ? (B. A. '54, '55)

2. Give a brief outline of the main features of the First Five Year Plan as prepared by the Planning Commission. (B. A. '58)

3. What are the proposals of the Planning Commission for the development of agriculture and industries in India ?

4. How the First Five Year Plan is proposed to be financed ?

5. What is meant by deficit financing ? What role is assigned to it in the financing of the Five Year Plan ?

6. How far do you think that the policy of deficit financing adopted by the Government of India in implementing the first five year Plan is justified ?

7. "Deficit financing in underdeveloped Countries is essentially inflationary finance"—Explain. (B. A. '59)

8. "The Indian Economy has made remarkable progress under the First Five Year Plan"—Examine. (B. Com, '56. B. A. '57)

9. Examine the financial strategy of the Second Five Year Plan.

10. "There is no difference between the First and the Second Five Year Plans of India, so far as the outward form is concerned. But behind this formal similarity there are important differences in substance."—Discuss the statement.

11. "The major problems that have arisen in the first few years of working of the Second Five Year Plan should have been recognised as necessary manifestations of the growing pains of a developing economy."—Discuss.

তৃতীয় খণ্ড

উপকরণ ও জাতীয় আয়

Resources and National Income

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার

Natural Resources & its Utilisation

প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Natural Resources and economic development)

প্রকৃতিদত্ত উপকরণসমূহ লইয়াই কোন দেশের মানুষ নিজস্ব অর্থনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলে এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই নিজস্ব জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি হয়। মানুষের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হইল সাধারণভাবে দ্রব্যোৎপাদন এবং এই উৎপাদনসংক্রান্ত কাজ-কর্মের রূপ ও কাঠামো প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারাই প্রাচীনকালে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইত। বলা চলে, প্রাচীনকালে অনেক সময় প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা বা উহার ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে উহার গতিবেগ রুদ্ধ করিয়াছে। বর্তমানে প্রকৃতির নিকট হইতে ক্ষমতা আহরণ করিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে বশ মানাইয়াছে, মানুষের অর্থনৈতিক, কাজ কর্মে ও সমাজগঠনে প্রকৃতির প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে এখনও প্রকৃতির শক্তি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে: জলবায়ুর দ্বারা নির্ধারিত হয় খাদ্যবস্ত্রপরিধেয়, উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যাদি, শ্রমের ক্ষমতা; মাটির গুণ বা উর্বরতাশক্তি দ্বারা স্থির হয় শস্যের প্রকার-ভেদ; অরণ্য ও পর্বতের ফলে বৃষ্টিপাতের সময় পরিমাণ ও বণ্টন নির্ধারিত হয়; সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির উপর বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য নির্ভর করে।

প্রাচীনকালে একটি দেশের অর্থনীতি প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল

মনে রাখা দরকার যে, কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। অবশ্য কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয় না। বহু প্রকার ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ মিলিয়া একটি দেশে উন্নয়ন সুরু হওয়ার

পরিবেশ সৃষ্টি হয়*। তখন যে শিল্পবিপ্লব ঘটে তাহার ফলেই অন্যান্য উৎপাদক উপকরণের (যেমন মূলধন, শিল্পদক্ষতা প্রভৃতি) দ্বারা প্রাকৃতিক উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার হইতে থাকে এবং এই ব্যবহার শিল্পবিপ্লবের গতিবেগ, চরিত্র ও দিক অনেকাংশে প্রভাবিত করে। নিজের দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে বহির্মুখী করিয়া তুলিয়াছে। সে ঔপনিবেশিক শোষণের পথে অগ্রসর হইয়াছে, নিজের দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের প্রাচুর্য আমেরিকার শিল্পপ্রসারকে অন্তর্মুখী করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন না করিয়াও শিল্পসমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছে।

বর্তমানকালে মূলধনই প্রধান, উহারই উপর প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে সম্ভাবনা নির্ভর করে

ভারতের আয়তন ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Size and Physical Features of India)

বর্তমানের ভারতবর্ষ মোটামুটি নদী ও পর্বত দ্বারা সমগ্র এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে (পাকিস্তানকে বাদ দিলে) এরূপভাবে পৃথক যে, এই ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট

* It is, of course, the case that prosperous nations either possess some valuable natural resources in their own territories or directly concerned in the exploitation of such resources in other countries or have access to them. But in most cases they have largely raised the value of these resources by discovering and developing them through the application of Capital, Organising and technical skills and labour. The necessary and previously lacking cooperant factors of production have been supplied, and the natural resources clothed with, economic usefulness and value. The vast natural resources of the United States were *in situ* for many centuries, but that did not enable the Indians to pass beyond a most primitive level of economic achievement. The development of these resources in the nineteenth and twentieth centuries is only one example of the interrelationship between production techniques, the size and quality of the population and the value of material resources; it also indicates clearly that the value of available natural resources is often function of the supply of the former factors. In large measure, the prosperity of a nation as well as the active development of its natural resources can both be seen as results or aspects of the operation of other causes, though the presence of the natural resources may serve to stimulate and reinforce their operation.

Bauyer & Yamey—**Economics of underdeveloped countries** P. 47.

প্রকার ভৌগোলিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ মাইল এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১৭০০ মাইল, ইহার আয়তন হইল বর্তমানের হিসাবে ১২,৫৯,৭৬৫ বর্গ মাইল। ইহার ভূমিসীমান্তের দৈর্ঘ্য হইল ৯৩০৯ মাইল এবং ইহার উপকূলভাগ ৩৫৩৫ মাইল বিস্তৃত। আয়তনের দিক হইতে ইহা পৃথিবীতে সপ্তম, গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ১৩ গুণ, জাপানের আটগুণ, কানাডার এক-তৃতীয়াংশ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার এক সপ্তমাংশ।

ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন

প্রাকৃতিক ভাবে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল

পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত তিনটি পর্বতমালার সমষ্টি হইল হিমালয়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ মাইল হইতে ২০০ মাইল এবং পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে অনেক মালভূমি ও উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থে এই অঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হইলেও এখানে উত্তোলন কার্য এখনও আরম্ভ হয় নাই।

নগাধিরাজ হিমালয় বহুভাবে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক কাজকর্ম, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার আড়ালে থাকিয়া আমরা তিব্বতের তীব্র তুষার-শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে রক্ষা পাই, ইহারই বরফগলা জলে অসংখ্য নদ নদীর উৎপত্তি। ইহারই অরণ্যাঞ্চল মৌসুমীবায়ু ও অন্যান্য বায়ু প্রবাহের নিয়ামক। হিমালয় নিঃসৃত জলধারাই পর্বতগাত্র হইতে সারবান মৃত্তিকা বহন করিয়া ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে, ইহার উপত্যকায় প্রচুর ফলমূল ও কৃষিশস্যাদি উৎপন্ন হয়, ইহার পর্যটন বা অতুলনীয় সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশীরা ভারতে আসে ও আমাদের বিদেশী মুদ্রাগমের পথপ্রশস্ত করে। সংক্ষেপে বলা চলে, বৃষ্টি, বাতাস, গ্রীষ্ম, শীত, আর্দ্রতা ও কৃষিশস্যাদি প্রভৃতির উপর ইহার প্রভাব অর্থনৈতিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হিমালয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি

উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্র সমভূমি; নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি (অর্থাৎ সমগ্র বিহার, হিমালয় অঞ্চল বাদ দিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল); পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের সমভূমি; এবং পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমি—দৈর্ঘ্যে ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১৫০ হইতে ২০০ মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চলই সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি নামে পরিচিত। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদী সমূহ লইয়া গঠিত এই অঞ্চল খুবই পলিমাটি সম্পন্ন এবং মোটামুটি সকল প্রকার কৃষিদ্রব্যই এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদেও এই অঞ্চল বিশেষ সম্পদশালী।

আর্যাবর্ত্ত

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মৈকাল এবং অজন্তা প্রভৃতি পর্বতমালার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি উত্তরের সমভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল; এবং ইহার পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল। উড়িষ্যার উপকূল ভাগ, মাদ্রাজের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল লইয়া ইহার পূর্বদিক গঠিত। সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, বোম্বাই-এর কিছু অংশ, কুর্গ ও কেরল প্রভৃতি লইয়া ইহার পশ্চিমদিক গঠিত। এই পশ্চিমাঞ্চলে লবণ, তুলা, তৈলবীজ, ভুট্টা, ও ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পূর্বাঞ্চলেও ধান, তৈলবীজ, বাজরা ও জোয়ার প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। লোহা, চুনাপাথর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্য

ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India):

দেশের সকল অঞ্চলেই প্রায় চারিপ্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়: পলিমৃত্তিকা (Alluvial Soil) কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black Soils , গৈরিক মৃত্তিকা (Red Soils), ও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা (Laterite Soils)।

পলিমাটি প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজের কোন কোন অংশ, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে। এই মাটিতে বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন পরিমাণে আছে এবং বহুপ্রকার শস্য উৎপাদনের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী।

কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রধানতঃ তূলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের অধিক অংশে; মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের কিছু কিছু অংশে এইরূপ কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, এই সকল মাটিতে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের কিছুটা অভাব আছে।

গৈরিক মৃত্তিকা প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায় মাদ্রাজ, মহীশূর, দক্ষিণপূর্ব বোম্বাই, হায়দরাবাদের পূর্বদিক, বিহারের সাঁওতাল পরগণার কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায়। এই জমি সর্বত্র একপ্রকার নয় এবং ইহার রাসায়নিক সম্পদও বিশেষ নাই তবে উপযুক্ত জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে এইরূপ মাটিতে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায়।

প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাতে সাধারণতঃ পটাশ, ফস্‌ফরিক্‌ এসিড ও চুনের অভাব দেখা যায়। উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে, বোম্বাই, মালাবার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উর্বরতা শক্তি নাই। অবশ্য প্রচুর জলসেচ বা বৃষ্টিপাত হইলে কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।

স্বাধীনতার পরে বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের মাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য চালাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ভারতের মাটির প্রধান সমস্যা হইল ইহারা বিশেষ শুষ্ক; সুতরাং জল-সেচের সুবন্দোবস্ত এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা।

জলবায়ু (Climate)

ভারতের আয়তন ও অবস্থানের দরুণ ইহার সকল অংশের জলবায়ু ঠিক একরূপ নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপরই নির্ভর করে এবং সেই অনুযায়ী ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা চলেঃ (ক) বাৎসরিক ৮০″ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল যেমন পশ্চিম উপকূল, বাংলাদেশ ও আসাম; (খ) ৪০″ ইঞ্চি হইতে ৮০″ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন উত্তর পূর্ব উপত্যকা এবং মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা; (গ) ২০″ ইঞ্চি হইতে ৪০″ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন মাদ্রাজ, দক্ষিণ ও

বৃষ্টিপাত অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগ

উত্তরপশ্চিম দাক্ষিণাত্য এবং উচ্চ-গাঙ্গেয় সমভূমি। ইহাদের সহিত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এরূপ হিমালয়ের অঞ্চলসমূহকে যোগ করা চলে।

ভারতের জলবায়ুর ও অর্থনৈতিক দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল **মৌসুমী বায়ু**। যে সকল মরসুমী বায়ুপ্রবাহ বৎসরে দুইবার দিক পরিবর্তন করে এবং যাহাদের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটে সাধারণতঃ তাহাদের মৌসুমী বায়ু বলা হয়। মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তির কারণাবলী খুবই জটিল। তবুও ইহার উৎপত্তির প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ভারত-সাগরের জলের তুলনায় গ্রীষ্মকালে ভূমি অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠা এবং শীতকালে অধিক ঠাণ্ডা হওয়া। গ্রীষ্মকালে উত্তরের পর্বতমালা অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে সেখানে বায়ুর চাপ কমিয়া যায় অর্থাৎ উত্তপ্ত বাতাস উর্ধে উঠিয়া যায়। হিমালয় অঞ্চলে এইরূপ তুলনামূলক শূন্যস্থান পূরণের জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে আরব সাগরের উপর দিয়া প্রবহমান বৃষ্টিগর্ভ আর্দ্র বায়ুস্রোত হিমালয়ের দিকে আসিতে থাকে। ইহাই দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু। দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়া ইহা ভারতে প্রবেশ করে : বঙ্গোপসাগর-স্রোত (Bay of Bengal current) এবং আরবসাগর-স্রোত (Arabian Sea current)। শীতকালে ভারতের জমি সমুদ্রের জলের তুলনায় অধিকতর শীতল হওয়ায় হিমালয়ের দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ু। জমির উপর ইহার উদ্ভব বলিয়া জলকণার অংশ এই বাতাসে কম এবং ফলে উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুতে বৃষ্টি কম হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরই প্রত্যাবর্তন। উত্তর পশ্চিম ভারতের শীতকালীন শস্যাদির পক্ষে এই প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে ইহাদের কালিদাসবর্ণিত পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ বলিয়া মনে করেন।

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

ভারতের অধিবাসীর ৬৯.৮% জন কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের জাতীয় আয়ের ৪৮% ভাগই কৃষিজাত উৎপাদন হইতে আসে। আমাদের জমিও শুষ্ক এবং জল বিনা অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় ঠিক সময়মত, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত পরিমাণে (Time, Place, and Quantity) বৃষ্টিপাত না হইলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় এবং ঠিক পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে কৃষিজাত

মৌসুমী বায়ুর অর্থনৈতিক ফলাফল

শস্যসামগ্রীর উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপন্ন শস্যের বৃহদংশ আত্মভোগে (Self-Consumption) ব্যবহৃত হয়, অল্প অংশই বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত হয়। সুতরাং, কৃষির অবনতির ফলে প্রথমেই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং কৃষকের আয় কমিয়া যায়। তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে না পারায় শিল্প-জাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন (যেমন, তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি) কমিয়া যাওয়ায় উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, অথচ উহাদের প্রধান ক্রেতাগণ অর্থাৎ চাষীদের হাতে ক্রয়শক্তি থাকে না। কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি কমিয়া যায়, এবং আমদানি বাড়ে, ফলে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলিরও বিশেষ অসুবিধা হয়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারী ব্যয় বাড়িতে থাকে; কিন্তু ভূমিরাজস্ব, আয়কর, বিক্রয় কর, আবগারী, আমদানি রপ্তানি, বাণিজ্য শুল্ক সবই কমিয়া যায়, ফলে সরকারী আয় হ্রাস পায়। এইরূপে বাজেটে ঘাটতি পড়িতে থাকে। রেলপথে কম যাত্রী ও মাল চলাচল করে, সুতরাং উহারও আয় কমে। এই কারণে বলা হয় যে, ভারতীয় বাজেট বৃষ্টি লইয়া জুয়াখেলা।

আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্যান্য দিকের উপরও মৌসুমীবায়ুর যথেষ্ট প্রভাব আছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রধানতঃ ইহার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে অবশ্য শিল্পসম্প্রসারণের দরুণ জনবসতির ঘনত্ব নির্ধারণে বৃষ্টিপাতের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, মৌসুমী বায়ুর দরুণ ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতার মনোবৃত্তি খুবই প্রবল। আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা এবং উদ্যমহীনতার মনোভাব জাগাইতেও ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য।

কৃষি সম্পদ (Agricultural Resources)

ভারতে বহুপ্রকার জলবায়ু ও ভূমি থাকায় এখানে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার কৃষিপণ্যই উৎপন্ন হয়। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতের আর্থিক সম্পদের প্রধান উৎস হইল কৃষিজাত পণ্য। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকই (৪৮ %) হইল কৃষিজাত শস্যসামগ্রী। জনসাধারণের মধ্যে প্রায় ৭০% জন প্রত্যক্ষভাবে কৃষিতে নিযুক্ত এবং ৭৫%-এর বেশি

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের বেশীর ভাগই কৃষিজাত পণ্য। দেশীয় শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল প্রধানতঃ আমাদের কৃষিজাত পণ্য হইতেই পাওয়া যায়।

কৃষিজাত পণ্য দুই শ্রেণীর: খাদ্যশস্য (Food crops) ও বাণিজ্যিক শস্য (Commercial crops)।

(ক) খাদ্যশস্য: খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে ধান্য, গম, জোয়ার, বাজ্‌রা, বার্লি, ডাইল, ভুট্টা ও ইক্ষু। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট কর্ষিত জমির ৮০% অংশেই খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, এবং বাকী ২০% অংশে বাণিজ্যিক শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে (Revised estimate of the Second Five Year Plan) খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ৮ কোটি ৫ লক্ষ টন ধার্য করা হইয়াছে।

(১) **ধান্য**—খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউলই প্রধান, সুতরাং মোট কর্ষিত জমির শতকরা ৩০ ভাগে ধান উৎপন্ন হয়। অধিক ফলনের হিসাব অনুসারে তালিকাবদ্ধ করিলে মাদ্রাজ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম ও বোম্বাই খাদ্য উৎপাদনের প্রধান এলাকা। বাংলা আসাম, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ভাতই প্রধান খাদ্য। ভারতে প্রায় ৪০০০ ধরণের ধান দেখা যায়। একর প্রতি গড় ধান্যোৎপাদন ভারতে কম, একর-প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৭২২ পাউণ্ড আর জাপানে একর প্রতি উৎপাদন ২৩৫০ পাউণ্ড। অবশ্য মোট ধান উৎপাদনের বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বিদেশে বসবাসী ভারতবাসীর খাদ্যের জন্য, বিদেশের পশুখাদ্য হিসাবে এবং মদ চোলাই-এর জন্য কিছু চাল রপ্তানিও হইয়া থাকে।

(২) **গম:** ধানের পরেই গমের স্থান। উত্তর ভারতে গমই প্রধান খাদ্য। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মায়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মৃত্তিকা ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া গম উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। মোট কর্ষিত জমির ১০ ভাগ অংশে গমের চাষ হয় এবং সমগ্র পৃথিবীর গম উৎপাদনের ১০% আমরা উৎপাদন করি। অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, কানাডা, রুশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষে

গম আমদানী হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৯০ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। গম উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ।

মোট কর্ষিত জমির ৯% অংশে **জোয়ারের** চাষ হয় এবং ৫% অংশে **বাজ্‌রার** চাষ হয়। মানুষ এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে **যব** ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে **ডাইল, ভুট্টা, ছোলা, বহুবিধ ফল, শাকসব্জী, মশলা** প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৩) **ইক্ষু:** ভারতের মোট কর্ষিত জমির মাত্র ২ ভাগে ইক্ষুর চাষ হয়। প্রচুর জল ও উষ্ণ আবহাওয়া ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিহার ও উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫৮ লক্ষ টন ইক্ষু ও ইক্ষুজাত গুড় প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৮ লক্ষ টন পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তখন বিদেশ হইতে আমদানি করার প্রয়োজন হইবে না এবং ভারত ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

(খ) বাণিজ্যিক শস্যাদি (Commercial Crops)

যে সকল শস্য খাদ্য হিসাবে সরাসরি ভোগকার্যে আসে না, যাহা বিক্রয় করিয়া কৃষকের হাতে নগদ অর্থ আসে এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় উহাদের বাণিজ্যিক শস্য বলা হয়। ইহাদের আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যেমন, (ক) আঁশজাতীয় (Fibres) অর্থাৎ তূলা, পাট প্রভৃতি; (খ) তৈলবীজ (Oilseeds), যেমন সরিষা, তিসি, রেড়ি প্রভৃতি, (গ) ঔষধ ও পানীয় জাতীয় (Drugs and beverages), যেমন, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি।

(১) **তূলা:** গুজরাট, পাঞ্জাব, বিহার ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তূলার চাষ হয়। পূর্বে ভারত তূলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরে এখন আর ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত ভাল তূলা বা পরিমাণে বেশী তূলা উৎপাদন হয় না। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে তূলা উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৪২ লক্ষ গাঁইট। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ গাঁইট উৎপাদনের লক্ষ্য হিসাবে ধরা হইয়াছে। ভারতে একর-পিছু তূলা উৎপাদনের হার আমেরিকার অর্ধেক এবং মিশরের এক-পঞ্চমাংশ।

(২) **পাট:** ভারত বিভাগের পূর্বে পাট ছিল ভারতের একচেটিয়া

পণ্য ; বর্তমানে পাকিস্তান গঠিত হওয়ায় ভারতের পাটকলগুলির প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও পূর্বাপেক্ষা উন্নত আঁশযুক্ত পাট প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গেই উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে পাটের উৎপাদন হইয়াছে ৪০ লক্ষ গাঁইট ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন বাৎসরিক ৫৫ লক্ষ টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আসাম ও উড়িষ্যাতেও অল্প পরিমাণে পাটের চাষ হইয়া থাকে।

(৩) **রেশম** : গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত ভারতের একটি প্রধান শিল্প। প্রধানতঃ কাশ্মীর, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূম জিলায় ও উত্তর প্রদেশে প্রতাপগড় জিলায় এই শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা, সাহায্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, কৃত্রিম রেশমের প্রতিযোগিতা ও গুটিপোকার নানারূপ ব্যাধি এই শিল্পের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিয়াছে।

(৪) **তৈলবীজ** : সরিষা, রেড়ি, নারিকেল, চীনাবাদাম, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজের অন্তর্ভুক্ত। তিসি বীজ প্রচুর রপ্তানি হয়। চীনাবাদাম প্রধানতঃ মাদ্রাজে এবং তিসি প্রধানতঃ বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিলের চাষ হয়। সরিষা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হইল উত্তর-প্রদেশ ও বিহার। যুদ্ধ পূর্বকালে তৈলবীজ প্রচুর রপ্তানি হইত, অর্থাৎ তেল এবং চাষের কার্যে ব্যবহৃত খইল উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। সেইজন্য অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলিতেন যে, "তৈলবীজ রপ্তানি জমির উর্বরতা শক্তি রপ্তানির ন্যায়ই ক্ষতিকারক।" ১৯৫৫-৫৬ সালে তৈলবীজের মোট উৎপাদন হইল ৫৫ লক্ষ টন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৭৬ লক্ষ টন।

(৫) **চা** : পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সর্বাধিক পরিমাণ চা উৎপাদন করে। উহার মধ্যে একা আসামই অর্ধেক। অবশিষ্ট অংশ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল, পাঞ্জাবের কাঙ্গারা উপত্যকা ও উত্তর প্রদেশের দেরাদুন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। যে অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল মোটেই জমে না এরূপ আর্দ্র অঞ্চলে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও আসামে অধিক চা উৎপাদন হইয়া থাকে। ভারতে উৎপন্ন চা-এর ৮০% ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন চা

উৎপাদন হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ৭০ কোটি টনে পৌছান যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ইহা ছাড়া ভারতে **তামাক ও নীলেরও** প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহারের ত্রিহুত জিলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রচুর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। উহার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ টন। পৃথিবীতে তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়, আমেরিকা ও চীন ভারতের উপরে। কৃত্রিম রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ প্রায় অবলুপ্ত। বর্তমানে বিহারে ও উত্তর প্রদেশে কিছু কিছু নীলের চাষ হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত দক্ষিণ ভারতে কফির চাষ উল্লেখযোগ্য। দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে **সিন্‌কোনার** চাষ হয়। উত্তর প্রদেশে সরকারী পরিচালনায় আফিমের চাষ হয়, ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে আফিমের চাষ একেবারেই কমাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। মহীশূর, মাদ্রাজ ও কুর্গে রবারের চাষ হয়।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)

ভারতের খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব ও তথ্যালোচনা এখনও হয় নাই। বর্তমানে ভারত সরকার জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার হস্তে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়াছেন।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোন কোন খনিজ দ্রব্য ভারতে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ উপকরণ ভারতে কম, যেমন তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা, চীনামাটি প্রভৃতি। সুতরাং ভবিষ্যতে শিল্পোন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্ত খনিজ উপকরণ থাকিলেও বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ খনিজ দ্রব্য আমদানি আমাদের করিতেই হইবে।

আমাদের খনিজ সম্পদকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি : (১) ধাতব খনিজ দ্রব্য, যেমন লোহা, তামা, সোণা প্রভৃতি, (২) অধাতব খনিজ দ্রব্য, যেমন লবণ, অভ্র, গন্ধক প্রভৃতি, (৩) জ্বালানি বা শক্তি-সম্পদ, যেমন কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি।

(১) ধাতব খনিজ সম্পদ

(ক) লোহাঃ শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু হইল লোহা। পশ্চিম বাংলার বরাকর অঞ্চলে, বিহারের সিংভূম পরগণায়, উড়িষ্যার বোনাই, ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝর অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে উৎকৃষ্ট ধরণের লৌহ-মাক্ষিক (Iron-ore) পাওয়া যায়। উড়িষ্যার উত্তরে পর্বত-মালায় এবং বিহারের সিংভূম জিলায় আরও লোহা আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও মাঝারি ও নীচু শ্রেণীর লৌহ-মাক্ষিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে, সালেম, মহীশূর, রত্নগিরি এবং কুমায়ুনে। ভারতের মোট লৌহ-মাক্ষিকের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার অধিক হইবে।

ভারতের বর্তমান পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, সুতরাং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে তিনটি ইস্পাত কারখানা চলিতেছে; জামসেদপুরে, বার্নপুরে এবং মহীশূরে। আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণের কার্য সুরু হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালের মধ্যেই উহাতে উৎপাদন সুরু হইবে স্থির হইয়াছে। উহারা হইল ব্রিটিশ এক কোম্পানীর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, জার্মান কোম্পানীর সহায়তায় উড়িষ্যার রুরকেলায় এবং রুশীয় সরকারী সহযোগিতায় মধ্য প্রদেশের ভিলাই-তে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ৪৩ লক্ষ টন লৌহ-মাক্ষিক প্রস্তুত হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদন ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(খ) ম্যাঙ্গানীজঃ ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়া প্রথম এবং ভারত তৃতীয় স্থানের অধিকারী। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর; উড়িষ্যা ও সিংভূম জেলায় প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে খাদ হিসাবে ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন হয়, ইহাকে তাই গাঠনিক ধাতু (Structural metal) বলা চলে। অনুমান করা যায়, ভারতের মাটিতে প্রায় ১½ কোটি হইতে ২ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। পূর্বে অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইত, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, ইস্পাতের উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশের ভিতরে ইহার ব্যবহার তত বাড়িবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ১৫'৮ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হইয়াছে।

(গ) **বক্সাইট**: বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ ও বিহারে বক্সাইট পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে ও ত্রিবাংকুরে এলুমিনিয়াম কারখানা আছে। ১৯৫৫—৫৬ সালে প্রায় ৭০ হাজার টন বক্সাইট উৎপন্ন হইয়াছে।

(ঘ) **তাম্র**: সিংভূম, গারওয়াল, আলমোরা ও মাদ্রাজে তামা পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ টন তামা উৎপন্ন হইয়াছে।

(ঙ) **স্বর্ণ**: ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের ৯৫% অংশই মহীশূরের কোলার খনি হইতে উত্তোলিত হয়। হায়দরাবাদে হাটি নামক খনি হইতে এবং কোন কোন নদীর বালি হইতে অতি অল্প পরিমাণ সোণা পাওয়া যায়। বর্তমানে স্বর্ণের উৎপাদন প্রায় আড়াই লক্ষ আউন্স।

(২) **অধাতব খনিজ**: ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল লবণ, গন্ধক ও জিপ্‌সাম ও অভ্র।

(ক) লবণ: ভারতবর্ষে লবণ পাইবার প্রধান তিনটি উৎস হইল: (১) পাঞ্জাবের কোহাট খনি হইতে প্রাপ্ত সৈন্ধব লবণ, (২) রাজপুতানার লবণাক্ত হ্রদের জল হইতে প্রাপ্ত লবণ, ও (৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজ উপকূলে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া প্রাপ্ত লবণ। লবণের উৎপাদন বর্তমানে ২৬ লক্ষ টনের অধিক, ভারত এখন লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

(খ) **গন্ধক ও জিপসাম্**: গন্ধকের সাহায্যে সাল্‌ফিউরিক্ এসিড তৈয়ার হয়। বালুচিস্তানে অল্প পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় জিপ্‌সাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে গন্ধক উৎপন্ন হয়।

(গ) **অভ্র**: অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, মোটরযান, বৈদ্যুতিক শিল্প ও বেতার যন্ত্র প্রভৃতিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। এই সকল ব্যবহার মিটাইয়াও প্রভূত পরিমাণ অভ্র প্রতি বৎসর রপ্তানি করা হয়। সমগ্র ভারতে উৎপন্ন অভ্রের ৯০ ভাগ বিহারের হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্গের, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজের নেলোর জেলাতে ও রাজপুতানায় অভ্র পাওয়া যায়।

(৩) **জ্বালানি-খনিজ**:

(ক) কয়লা: শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইল

কয়লা। বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্র চালাইবার কার্যে কয়লার প্রয়োজন খুবই বেশি। ইহার শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম বাংলা ও বিহারের রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি ও ডালটনগঞ্জ অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয়; ইহাকে 'গণ্ডোয়ানা কয়লা অঞ্চল' বলা হয়। আসাম, মধ্য ভারত, পাঞ্জাব ও হায়দরাবাদে কিছু কিছু কয়লা আছে। ১৯৪৬ সালের কয়লা খনি কমিটির মতে আমাদের মোট ৭০ বা ৮০ কোটি টন কয়লা মজুত আছে। সাধারণ গুণবিশিষ্ট কয়লার যোগান প্রচুর হইলেও উৎকৃষ্ট কয়লার সরবরাহ খুবই কম, আমাদের তাই কয়লা ব্যবহারের ব্যপারে সাবধান হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া দেশের সমস্ত অঞ্চলে কয়লা সমভাবে বণ্টিত নাই, পূর্ব ভারতেই কয়লা পাওয়া যায়; উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়লার খনি নাই। ভারতবর্ষে প্রায় ১০০০টি কয়লা খনি আছে। ১৯৫৫ সালে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ হইল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার লক্ষ্য বার্ষিক ৬ কোটি টন উৎপাদন করা।

(খ) পেট্রোলিয়ম: আসামের ডিগ্‌বয়ে ও পাঞ্জাবের আটক জিলায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। বিদেশী কোম্পানীর সহায়তায় ভারত সরকার বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তৈল অনুসন্ধানের কার্য সুরু করিয়াছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের হাজার ভাগের এক ভাগও ভারতে উৎপাদন হয় না। বৎসরে তাই প্রায় ৩০ কোটি গ্যালন তৈল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

কয়েক বৎসর হইল ভারত সরকার আমেরিকার তিনটি কোম্পানীর সাহত (ষ্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম, ক্যালটেক্স ও বার্মা শেল) পৃথকভাবে তিনটি চুক্তি করিয়া তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যপ্রাচ্য হইতে অপরিশ্রুত তৈল লইয়া আসিয়া ভারতে পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাদের সহিত ভারতের মাটিতে তৈল অনুসন্ধানের কার্যও আরম্ভ হইয়াছে। দুইটি তৈল শোধনাগারের কার্যও সুরু হইয়া গিয়াছে, তৃতীয়টি এখনও স্থাপিত হয় নাই।

সরকারী খনিজ-নীতি (Mineral policy of India government):

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ্ সম্পর্কে কোন 'জাতীয় নীতি' ছিল না—একমাত্র নীতি ছিল যথেচ্ছ মুনাফা লাভ। ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়ন

বা জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে না তাকাইয়া যে কোন উপায়ে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা ও বিদেশে রপ্তানি করা, ইহাই ছিল বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু তাহাই নহে, উত্তোলন পদ্ধতি ছিল অতি প্রাচীন ধরণের। আধুনিক যন্ত্রপাতি বা শ্রমিকদের জীবন হানি না ঘটে এইরূপ সাবধানতার ব্যবস্থা—খুব কমই ব্যবহার করা হইত।

স্বাধীনতার পূর্বে

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় স্বার্থ ও শিল্পোন্নয়নের কথা বিবেচনা করিয়া 'জাতীয় খনিজ নীতি' (National Mineral policy) গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের গুণ, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রভৃতি নিরূপণের জন্য খনিজ দ্রব্য গবেষণা সংক্রান্ত ব্যুরো এবং জ্বালানি খনিজের গবেষণাগার (Indian Bureau of Mining Research and National Fuel Research Laboratory) স্থাপিত হয়। ১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ভারত সরকার এই সম্পর্কে ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া, (Geological survey of India), ভারতীয় খনি ব্যুরো (Indian Bureau of Mines), জাতীয় ধাতু নিষ্কাশন গবেষণাগার (National Metallurgical Laboratory) এবং আরও বহু সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যের জন্য বিদেশী-কোম্পানী-সমূহের সহিত ভারত সরকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Natural Resources and Scientific Research) স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার অধীনে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি টাকা খনিজ সম্পদের খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে।

স্বাধীনতার পরে

বনসম্পদ ও বননীতি (Forest Resources and Forest Policy):

দেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হইল অরণ্য। দুর্ভাগ্যবশত,

ভারতের আয়তনের তুলনায় উহার অরণ্য-সম্পদ তত বেশি নহে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ভারতে মোট বনভূমির পরিমাণ হইল ২ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল অর্থাৎ মোট জমির ২১%। রাশিয়া, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে মোট জমির প্রায় ৪০% অংশে অরণ্য দেখা যায়।

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার বন দেখা যায়, জমির উচ্চতা, বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বনের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। (১) শুষ্ক বন (Arid Forests)—এই প্রকার বন রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। (২) পর্ণমোচীবন (Deciduous Forests)—ইহারা প্রতি বৎসর পত্র ত্যাগ করে, যেমন, হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি। (৩) চিরহরিৎ বনভূমি (Evergreen Forests)—যে সকল বনাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় বনভূমি চিরহরিৎ থাকে যেমন, বাঁশ, ফার্ন, পাম প্রভৃতি। (৪) পার্বত্য বনভূমি (Hill Forests)—হিমালয়ের উচ্চতর অংশে অবস্থিত দেওদার, পাইন, ফার, ওক, অ্যাস প্রভৃতি বৃক্ষবিশিষ্ট বনভূমি। (৫) উপকূল অঞ্চলের বনভূমি (Coastal Forests)—যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমি।

সরকার অরণ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) সংরক্ষণশীল অরণ্য (Protective Forests)—যাহা বন্যা ও মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করে। (২) কাষ্ঠ উৎপাদনকারী অরণ্য (Timber Forests)—যে অরণ্য হইতে সরকারের প্রচুর আয় হয়। (৩) ছোটখাট বন (Minor Forests) --যাহা হইতে জ্বালানি, জীবজন্তুর খাদ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং (৪) গোচারণ ভূমি (Pasture Lands)—জীবজন্তুর খাদ্য মিটাইবার উপযোগী জঙ্গল। আর একটি উপায়ে বনভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: (ক) সংরক্ষিত বন (Reserve Forest)—ইহার ব্যবহার জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। (খ) রক্ষিত বন (Protected Forest)—জনসাধারণ কর্তৃক ইহার ব্যবহার সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (গ) সাধারণ বনভূমি (Public Forest)—ইহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে।

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে অরণ্যের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। বনভূমি হইতে আমরা জ্বালানি কাঠ, ঘরবাড়ী বা আসবাবপত্র নির্মাণের কাঠ পাইয়া থাকি। বিভিন্ন শিল্পের জন্য কাঁচামাল অরণ্য হইতে সংগৃহীত হয়, যেমন কাগজ

তৈয়ারীর উপযুক্ত ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি, চামড়া তৈয়ারীর উপযুক্ত বাবুল প্রভৃতি, দিয়াশলাই-এর উপযুক্ত কাঠ, রজন প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, লাক্ষা, তারপিন, মধু, বহুপ্রকার ফলমূল, গবাদির খাদ্য ও নানা প্রকার তৈল অরণ্য হইতে পাওয়া যায়। বহু ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়। গোচারণের সাহায্য করে। এই সকল প্রত্যক্ষ (direct) উপযোগিতা ছাড়াও অরণ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ (Indirect) উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। "পরোক্ষভাবে ইহা ভারতের প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থার অঙ্গ স্বরূপ"। মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করিয়া, ভূমির উর্বরতাশক্তি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করে। বনের পাতা পচিয়া সারের সৃষ্টি হয়। অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। বায়ুর প্রাবল্য, শীতাতপের আধিক্য—ইহাদের হাত হইতে ফসল রক্ষা পায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ভারতের বনভূমির প্রধান ত্রুটি হইল : (ক) ইহার পরিমাণের স্বল্পতা, (খ) দেশের সমগ্র ভূভাগে ইহার অসম বণ্টন (uneven distribution), এবং (গ) পশ্চিমী দেশগুলির বনভূমির তুলনায় সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, দ্রুত নগরীকরণ, রেলপথ প্রসার ও ব্যবসায়ীদের নীতিহীন ভাবে জঙ্গল কাটা—এই চারিটি বিষয় মিলিয়া আজ ভারতের বনভূমি ধ্বংসপ্রায়।

বনের গুরুত্ব থাকায় এই সকল ত্রুটিসমূহ দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে জাতীয় অরণ্যনীতি প্রস্তাবে (National Forest Policy Resolution) বলা হয় যে, মোট জমির ৩৩% অংশে অরণ্যাঞ্চল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে ; পার্বত্য অঞ্চলে ৬০% এবং সমতল ভূমিতে ২০%। এই সালেই বন্য জীবজন্তুর জন্য ভারতীয় বোর্ড (Indian Board for wild life) স্থাপিত হয়। বনমহোৎসব, বিভিন্ন বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার, বনকে রক্ষা করা অথচ উৎপাদনশীল করিয়া তোলা প্রভৃতি কার্যে রাজ্য সরকারসমূহ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে ৭৫০০০ একর জমিতে বৃক্ষ রোপণের বন্দোবস্ত হইয়াছে, দিয়াশলাই কাঠ উৎপাদনের উপযোগী গাছ প্রতি বৎসর ৩০০০ একর জমিতে বাড়ান হইতেছে, ৩০০০ মাইলের উপর অরণ্য পথ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ও তত্ত্বাবধান হইতে মোট ২০ লক্ষ একর অরণ্য রাষ্ট্রের মালিকানায় লইয়া আনা হইয়াছে।

অরণ্য-নীতি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ

Population Resources and Social Forces

প্রকৃতি ও মানুষ, অর্থাৎ জমি ও শ্রম-ই উৎপাদনের দুইটি মৌলিক উপাদান। প্রাকৃতিক উপকরণ অপর্যাপ্ত থাকিলেই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে না, সেই প্রাকৃতিক উপাদানের সহিত শ্রম মিশাইতে হয়, শ্রমের দ্বারাই সেই উপকরণসমূহকে সম্পদে পরিণত করা চলে। সম্পদ উৎপাদনে প্রকৃতির দান বেশী ঠিকই, কিন্তু শ্রমই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, কারণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। দেশে সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ তাই শ্রমিকের সংখ্যা ও দক্ষতার উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। জনসম্পদ শুধু উৎপাদনের উপায় নয়, সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মের সর্বশেষ লক্ষ্যও বটে। কারণ ইহাদের অভাব মিটাইবার জন্যই সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

চারিটি দিক হইতে ভারতীয় জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার বিচার করা চলে: (ক) জনসংখ্যার পরিমাণ ও উহাতে বৃদ্ধি (Size and increase), (খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density) (গ) জীবিকা অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন (Occupational distribution), (ঘ) জনাধিক্য সমস্যা (Problem of Overpopulation)

জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধি (Size and Increase in Indian Population)

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা হইল ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার। জনসংখ্যায় পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়। এই হার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কম; দুর্ভিক্ষ, মহামারীর দরুণ দ্রুত জনসংখ্যা বাড়িতে পারে নাই, খাদ্যোৎপাদনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু উহার পর হইতে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে, খাদ্যোৎপাদনও পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯৪১

জনসংখ্যার বৃদ্ধি

সাল হইতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে, জনসংখ্যা ১৩'৪% বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ গত দশবৎসরে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাড়িয়া গিয়াছে।

জনসংখ্যার এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধির উপর তিনটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে: (ক) জন্মহার, (খ) মৃত্যুহার, ও (গ) যৌন-অনুপাত।

আমাদের দেশে জন্মহার খুবই বেশী, প্রতি হাজারে ৪০। এত অধিক জন্মহারের কারণ হইল ভারতে প্রায় সকলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ না করিলে আত্মা নরকগামী হইতে পারে এই ভয়ে সকলেই বিবাহ করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিবাহ অল্প বয়সেই ঘটে। ফলে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁহারা অধিক সময় পায় (longer span of reproductive period) এবং অল্প বয়সে অধিক সন্তানবতী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তৃতীয়তঃ, ভারতবাসীর অসীম দারিদ্র্যই জন্মহারবৃদ্ধির কারণ। দারিদ্র্য অধিক থাকায় আরও সন্তান হইলে জীবনযাত্রার মান কমিবে এইরূপ চিন্তাও তাহাদের মনে আসে না। অধিক সন্তান হইলে পারিবারিক আয় বাড়িবে বহু ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাও করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, যৌথ পরিবার প্রথাজনিত দায়িত্বহীনতা, বহুবিবাহ প্রথা এবং সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নীচু থাকাও জন্মহার বৃদ্ধির কারণ। কৃত্রিম জন্মনিরোধ ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব, বাসগৃহে স্থানের অভাব, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপনে অজ্ঞতা, উচ্চ জীবন যাত্রার মান বজায় রাখার আকাংখার অভাব প্রভৃতি জন্মহার বাড়াইয়া রাখিয়াছে।

জন্মহার বেশি কেন

আমাদের মৃত্যুহারও বেশি, প্রতি হাজারে ২৭। সাধারণতঃ এই হার শিশু ও প্রজননশীল বয়সের স্ত্রীলোকের মধ্যেই অত্যধিক। ইংলণ্ডে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ১ বছর বয়সের মধ্যে ৬৫টি ও সুইডেনে ৫১টি মারা যায়, ভারতবর্ষে গড়ে ২০০টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, জীবন যাত্রার নিম্নমান, জীবন সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা, অবহেলা ও হতাশা, অশিক্ষা কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতা, নারীজীবনের প্রতি ঔদাস্য, বাল্য বিবাহজনিত জীবনীশক্তির অপচয়, স্ত্রীরোগ, উপযুক্ত ধাত্রীর অভাব এই সকল বিষয় মিলিয়া মৃত্যুহার বাড়াইয়া রাখিয়াছে।

মৃত্যুহার বেশি কেন

জনসংখ্যার গতিশীলতা (Dynamics of Population) নির্ধারণে জন্মহার ও মৃত্যুহার ছাড়া আরও বিষয় দেখা যায়, তাহা হইল জনসংখ্যার বয়স ও স্ত্রীপুরুষ অনুপাত (age and sex composition of Population) এবং স্ত্রীলোকের সন্তান-উৎপাদনের উর্বরতা (Fertility)। শিল্পোন্নত দেশসমূহে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সন্তান উৎপাদনশীল বয়সের স্ত্রীলোকের অনুপাত কম এবং ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। ভারতে কিন্তু এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর সন্তান উৎপাদনশীল বয়স ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে প্রতি দশ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কের সংখ্যা ছিল ১৬৯৬; কিন্তু ১৯৩১ সালে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৯২৩।

নীট প্রজনন হার কিরূপ

আমাদের নীট প্রজনন হার (Net Reproduction Rate) বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

হিসাব করা হইয়াছে যে, ভারতের নীট প্রজনন হার হইল ১.৩০ অর্থাৎ প্রতি ১০০০ স্ত্রীলোক সন্তান প্রজননের বয়স পার হইয়া আসিয়া ১৩০০ স্ত্রীলোক রাখিয়া আসে। ফলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তি প্রসারিত হয়।

মনে হয় যে, আগামী কয়েক বৎসরে ভারতে জনসংখ্যা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ হইল (ক) শিল্পসম্প্রসারণের প্রথম যুগে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, (খ) উন্নত চিকিৎসা শাস্ত্রের ও ব্যবস্থার দরুণ মৃত্যুহার কমিয়া যায়, (গ) মৃত্যুহার কমিবার দরুণ সন্তান প্রজননশীল স্ত্রীলোকের সংখ্যা এবং তাহাদের বয়সে বৃদ্ধি, (ঘ) বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা রমণীদের ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বিবাহ প্রভৃতি।

ভবিষ্যতে কোন্ শক্তি-সমূহ কার্যকরী

জনসংখ্যা কমাইবার দিকে কয়েকটি শক্তি প্রধানতঃ কাজ করিবে; (ক) অধিক বয়সে বিবাহ; (খ) বৃহৎপরিবার প্রতিপালনে অনিচ্ছা; (গ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগ্রহ; (ঘ) স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি অবহেলা হ্রাস; (ঙ) অধিকতর নগরীকরণ (urbanisation) অর্থাৎ পরিবার হইতে বাধ্য হইয়া পৃথক থাকা, এবং সর্বোপরি (চ) কৃত্রিম জন্মনিরোধ পদ্ধতির বিপুল প্রসার, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে।

জনঘনত্ব (Density of Population)

দেশের প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কি পরিমাণ লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তাহাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বা জনঘনত্ব বলা হয়। শিল্পপ্রধান দেশে সহর ও কারখানার অধিকসংখ্যক লোক কাজ করে, সেখানে অধিক লোকই নগরে বাস করে—সেইরূপ দেশে জনঘনত্ব সমৃদ্ধির পরিচালক। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশে জনসংখ্যা অধিক ঘন হইলে উহা অনুন্নতিরই প্রকাশ ; কারণ কম জমিতে চাষীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রত্যেক চাষীর মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম পড়ে, তাহার আয় ও জীবনযাত্রার মান কম থাকে। আমাদের দেশে অধিক জনঘনত্ব প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ প্রকাশ করে ; ইহা হইতে দেশের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও জীবনযাত্রার ধরণ ও মানও বুঝিতে পারা যায়।

জনঘনত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বহুকারণের উপর জনঘনত্ব নির্ভর করে : (ক) অঞ্চলের ভৌগোলিক কাঠামো (configuration) বারিপাতের পরিমাণ, শিল্পের প্রসার, সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা, নদনদীর উপত্যকার উর্বরতা, রাজধানীর নিকটবর্তিতা, রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা, জীবনধারণের নিরাপত্তা প্রভৃতি।

ঘনত্ব নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব হইল ৩১২। ইংলণ্ডে গড় ঘনত্ব হইল প্রায় ৬০০, বেলজিয়ামে ৬৫৪ এবং জার্মানীতে ৪৪৯। ভারতের এক এক রাজ্যে ঘনত্ব এক এক প্রকার। সর্বাধিক ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হইল কেরল (৯০১), উহার পরেই পশ্চিমবাংলা (৭৭৫), বিহার (৫৭২), সর্বনিম্ন ঘনত্ব হইল আন্দামানে (১০)।

জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ধরণ (Occupational pattern of Population)

দেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ কোন ধরণের জীবিকাতে নিযুক্ত আছে তাহা দেখিয়া দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর পরিমাপ করা চলে। মিঃ কলিন্ ক্লার্ক সকল প্রকার জীবিকাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন : প্রথম স্তরের জীবিকাশ্রেণী (Primary occupations), দ্বিতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণী (Secondary occupations), ও তৃতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণী

কলিন ক্লার্কের শ্রেণীবিভাগ

(Tertiary occupations)। প্রথম স্তর বলিলে বোঝা যায়, কৃষি, ফল-মূল আহরণ, মৎস্যশিকার প্রভৃতি ; দ্বিতীয় স্তর হইল কলকারখানার সাহায্যে উৎপাদন ; তৃতীয় স্তরের মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি, যেমন পরিবহন, কেরাণীগিরি, গৃহকর্মাদি, দোকানপাট করা বা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা প্রভৃতি। তাঁহার মতে, দেশের অধিকাংশ লোক প্রথমস্তরের জীবিকাতে নিযুক্ত থাকিলে সেই দেশ শিল্প ও ব্যবসাতে অনুন্নত, উহা কৃষিপ্রধান এবং সমৃদ্ধ নহে। যত অধিক লোক তৃতীয় স্তরের জীবিকা-শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকে, ততই সেই দেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমৃদ্ধ বলা চলে।

অপূর্ণোন্নতির প্রকাশ জীবিকা-কাঠামোতে

আমাদের জনসংখ্যার জীবিকানির্বাহের কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেই ভারতবর্ষের অনুন্নতির রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, পূর্বের তুলনায় গত কিছুকাল যাবৎ কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার বা অনুপাত বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, কুটির শিল্পের ধ্বংস অথচ কারখানা শিল্পের প্রসার না হওয়া, অর্থাৎ অনমনীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির দরুণই এইরূপ জীবিকা-কাঠামোর রূপ দেখা দিয়াছে। দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেকারির (Disguised unemployment) অবস্থিতি-ও ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভারতের ভবিষ্যৎ

বর্তমানে ভারতের শতকরা ৬৯.৮ জন ব্যক্তি কৃষিতে নিযুক্ত আছেন, শিল্পে ১০.৫%, এবং অপরাপর জীবিকাতে (বিশেষতঃ, গৃহকর্মাদিতে) নিযুক্ত আছেন ১২%। সুতরাং ভারতের শিল্পোন্নয়ন অত্যন্ত দ্রুত হারে না হইলে এইরূপ জীবিকা-কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে শিল্প ও ব্যবসা বৃদ্ধি পাইলেই জীবিকা-কাঠামোতে উন্নতধরণের পরিবর্তন আসা সম্ভবপর। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখান হইয়াছে তাহাতে কৃষিতে আরও অধিক লোক নিয়োগের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেও এইরূপ কাঠামোতে বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন আশা করা যায় না।

ভারত কি অতি জনাকীর্ণ ? (Is India over-Populated ?)

ভারতের মত অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নতির ও অচলাবস্থার

(economic backwardness and stagnation) কারণ হিসাবে অনেকেই জনসংখ্যার আধিক্যকে দেখাইয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাই বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু করার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক, ইহাও অনেকে বলিতে চান। উন্নয়নের কাজ সফল হইলে জাতীয় আয় বাড়ে, কিন্তু ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বাড়িয়া যায় বলিয়া মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে না, তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনিয়া লাভ নাই, সমাজের উৎপাদনশক্তিকে সর্বাধিক দ্রুত গতিতে বাড়াইয়া উন্নয়নের বেগ বাড়াইয়া লাভ নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ জীবনযাত্রার মান কিছুতেই বাড়িবে না সুতরাং পরিবার পরিকল্পনাই প্রাথমিক কাজ—এইরূপ কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। যাহাতে ভারতবাসী সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে, সেই চিন্তাই আজ ইহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।[১] এই ধরণের প্রচারই জনাধিক্যের সমস্যাকে যুক্তিসহ বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় ও মূলতঃ আবেগপ্রধান করিয়া তুলিয়াছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আবেগ এই সমস্যার প্রকৃত বিশ্লেষণে বাধা দিতেছে

বর্তমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে মূলতঃ বজায় রাখিয়া উহারই মধ্যে কতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কতকগুলি বিষয় বিচার করিলে আমাদের নিশ্চয় মনে হইবে যে, ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। যেমন আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ১$\frac{১}{৪}$% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের জন্মহার বেশী, মৃত্যুহারও বেশী। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই, জীবনযাত্রার মানও খুবই নীচু। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান; মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে ইহা ছিল ১.১১ একর; ১৯৩১

চলিত উন্নয়নের হারে জনাধিক্য কেন মনে হইতে পারে

১ "Of late, the population problem of India and other countries of South-East Asia has become a part of world tensions and a number of Americans—some of them in high places—regard checking the growth of population in this area as a necessary dyke against the menace of communism. The gloomy line of Malthusian view is being revived and poverty of the people in this area is taken to be due mainly to over-population.……and the fact that our syndicated press and the interests behind it are in favour of family planning, is largely due to the fact that they regard it as an alternative to social revolution or rather as a protection against it." *Dr. Gyanchand*—**Some aspects of the Population problem in India.** P. 4—5.

সালে ১'০৪ একর ; ১৯৪১ সালে '৯৪ একর ; ১৯৫১ সালের আদম স্থমারীর হিসাবে ইহা হইল '৮৪ একর। এই সকলই জনাধিক্যের লক্ষণ, স্থতরাং ভারতে এই সমস্যা আছে বলা চলে।

তবুও কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ্ বলেন যে, ভারতে এখনও জনাধিক্যের সমস্যা দেখা দেয় নাই। তাঁহাদের মতে, প্রথমতঃ আমাদের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় অনেক দেশ হইতে কম। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক ইউরোপীয় দেশ হইতে কম। তৃতীয়তঃ, খুব ধীরে হইলেও মাথাপিছু আয় আমাদের দেশে ক্রমে বাড়িতেছে। চতুর্থতঃ, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপকরণ আছে, এরূপ অনেক দেশেই নাই। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখিয়া উহাদের সঠিকভাবে উন্নয়ন করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থায় বণ্টন করিতে পারিলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। পঞ্চমতঃ, অনুন্নত দেশসমূহে জনাধিক্য থাকিলে উহা ভবিষ্যৎ মূলধন-গঠনের (Capital formation) পক্ষে খুবই উপকারী ; সেইরূপ দেশে কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে সরাইয়া আনিয়া শ্রমপ্রগাঢ়-পদ্ধতির সাহায্যে মূলধনী-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন হ্রাস পায় না। স্থতরাং ভারতে প্রকৃতপক্ষে জনাধিক্যের সমস্যা নাই—ভারতের জনশক্তিকে "অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত" (Potential surplus) বলিয়া গণ্য করা উচিত।

কেন অনেকে ইহাকে জনাধিক্য বলিতে চাহেন না

কিন্তু সামন্ততন্ত্র ব্যক্তিভিত্তিক ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র মিশ্রিত বর্তমানের অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সকল যুক্তি সম্পূর্ণ ঠিক নহে। প্রথমতঃ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাব কোন কোন দেশের তুলনায় কম হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার পরিমাণই এত বেশী যে বৃদ্ধির হার অল্প হইলেও মোট জনসংখ্যা প্রতি বৎসর অনেকখানি বাড়িয়া যায়। ফলে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হয়। ফিস্কাল কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ৩০ হইতে ৩৫ লক্ষ লোকসংখ্যা ভারতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতিবৎসরই আরও বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতেছে। ইউরোপীয় দেশের বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিয়া লাভ

নাই, কারণ আমাদের তুলনায় তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বেশি, খাদ্য-উৎপাদনও দ্রুততর হারে বাড়িতে পারে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় এত দ্রুত বৃদ্ধিকে ভারতের ক্ষেত্রে জনাধিক্য নিশ্চয়ই বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পোন্নত দেশে জনঘনত্ব বেশি থাকিলে ক্ষতি নাই, আমাদের মত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে বর্তমান ঘনত্বই জনাধিক্যের পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ, মাথা পিছু আয় বাড়িলেও উহা আর্থিক আয়, প্রকৃত আয় খুব বেশি বাড়ে নাই। তাহা ছাড়া, জনবৃদ্ধির হার কম হইলে মাথাপিছু আয় আরও বাড়িতে পারিত। চতুর্থতঃ, অব্যবহৃত অনেক উপকরণ আছে, সুতরাং জনাধিক্য ঘটে নাই, ইহা বলা চলে না। বর্তমানে যে হারে উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে সেই অনুযায়ী বর্তমানে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্বশেষে, উদ্বৃত্ত জনশক্তি মূলধন-গঠনের প্রচ্ছন্ন আধার মানিয়া লইলেও জনাধিক্য অস্বীকার করা চলে না[২]।

বর্তমান কাঠামোর মধ্যে উন্নয়ন—এই দৃষ্টিতে নিশ্চয় জনাধিক্য

কিন্তু দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে জনাধিক্যের সমস্যা নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। বর্তমান সমাজের কাঠামো ডিঙাইয়া নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ফল সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদনী শক্তি খুবই বাড়ান যায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যেই দেশের সকল জনশক্তিকে পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারা যায় ইহা আমাদের মনে রাখা দরকার[৩]।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে পারিলে এবং সামান্য বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাহায্যেই খাদ্যের অভাব মিটান কতখানি সম্ভবপর সে বিষয়ে কলিন ক্লার্ক বলিতেছেন: "পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ১% হারে বাড়িবে বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু কৃষি-উৎপাদন কৌশলের উন্নতি বৎসরে ১½% হারে উৎপাদন বাড়াইবে মনে করা চলে, (কোন কোন দেশে বৎসরে ২% হারে)।

২ তাহা ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কৃষিকাঠামো ছাড়া কৃষির উৎপাদনীশক্তি বাড়াইয়া প্রচ্ছন্ন বেকারদের শিল্পে নিযুক্ত করার মত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়—তাই বর্তমান কাঠামো বজায় রাখার দৃষ্টিভংগিতে জনাধিক্য স্বীকার করা চলে।

৩ মার্ক্স তাই অস্বীকার করেন যে, "the law of population is the same at all times and at all places." তিনি স্পষ্টই বলেন "every stage of development has its own law of population." ~~Capital Vol. I (author's preface~~ to the 2nd Edn).

কোনরূপ ম্যালথুসীয় বিচক্ষণ হতাশাবাদ তাই সম্পূর্ণভাবে নিন্দিত—একমাত্র বিজ্ঞানের উন্নতিই পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাধান করিতে পারে[৪]।”

সুতরাং, সাধারণ ভাবে ভারতে “জনাধিক্য” ঘটিয়াছে এবং এখন জনবৃদ্ধি রোধ করাই সর্বাগ্রগণ্য কাজ এইরূপ বলা চলে না। জনসংখ্যা কিসের তুলনায় অধিক তাহা বলা দরকার। ভারতে কি প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে? তাহা কেহই বলিতে চাহেন না। বলা চলে যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান স্তরে উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের পরিমাণ এবং ব্যবহারের তুলনায় জনাধিক্য দেখা যাইতেছে (relative overpopulition)[৫]।

ইহাকেই আপেক্ষিক জনাধিক্য বলে

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে জন নিয়ন্ত্রণ ঘটিবে কি ঘটিবে না, এই সম্পর্কেও তাই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না; দেশের ও জাতির অবস্থা বিচার করিয়াই এই নীতি স্থির হইবে। এইরূপ পরিকল্পনার মধ্যে জন পরিকল্পনার স্থান কিছুতেই কম নয়। সকল বিষয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে আর জনসংখ্যার উপর পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইবে না, তাহা ঠিক নয়। লর্ড কেইনস্ বলিয়াছিলেন যে, অধিক জন্ম হারের দরুণই রাশিয়ায় বিপ্লব হইয়াছে[৬]। ১৯১৭ সালের এই বিপ্লবের পরে রাশিয়ার জন্মহার অনেক বেশি বাড়িয়াছিল। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুণ সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান আজ খুবই উন্নত। সেখানে জমি ছিল প্রচুর, জনঘনত্ব ছিল কম। তাই জনসংখ্যার

সমাজতান্ত্রিক দেশেও জননিয়ন্ত্রণ দরকার হইতে পারে

৪ Quoted in Josue de Castro, The Geography of Hunger P. 286.

৫ Englos-এর ভাষায় বলা চলে "the pressure of population is not upon the means of subsistence but upon the means of employment"—*Letter to Lange*: **Marx-Engles Selected Correspondence.**

৬ "The great events of history are often due to secular changes in the growth of population and other fundamental economic causes." রাশিয়ার সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, "in upheavals of society ··· the disruptive power of excessive national fecundity may have played greater part in bursting the bonds of convention than either the power of ideas or errors of autocracy." *J. M. Keynes*—"Economic Consequences of the Peace"—chapter on "Europe before the war."

দ্রুত বৃদ্ধিকে তাহারা সম্পূর্ণ জয় করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা জনবৃদ্ধির নীতিকে সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। চীন বা ভারতে জমির তুলনায় জনসংখ্যা খুবই বেশি হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতির মধ্যেই জননিয়ন্ত্রণের নীতিও যুক্ত থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের পরিকল্পনাও তাই সঠিক পথেই জনসংখ্যা হ্রাসের নীতি গ্রহণ করিয়াছে; তবে এই নীতির দোহাই দিয়া অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতি হ্রাস করার ম্যালথুসীয় যুক্তি খুবই অবৈজ্ঞানিক।

কিন্তু জনবৃদ্ধির দোহাই দিয়া পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার সঠিক নহে

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক (Relation of Population and Economic Development)

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে দুইদিক হইতে বিচার করা চলে—অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনবৃদ্ধির প্রভাব এবং জনবৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি প্রভাব হইবে তাহা প্রধানতঃ নির্ভর করে জনসংখ্যা ও অন্যান্য উপকরণ, যেমন জমি ও মূলধনের অনুপাতের উপর। যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় জমি খুব বেশি, সেখানে জনবৃদ্ধি হইলে ভোগ্য দ্রব্যের বাজার বাড়ে বলিয়া এবং শ্রম বিভাগের প্রসার হয় বলিয়া উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে পারে [৭]।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুবিধা তত ভালভাবে গ্রহণ করা যায় যত বেশি বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন থাকে। কারণ তাহা হইলেই ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ বেশি বরাদ্দ করা সম্ভব হয়! যে দেশে মাথাপিছু আয় ও মূলধনের পরিমাণ কম, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমস্যা বাড়াইয়া তোলে। এইরূপে দেশে নূতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, ফলে শ্রমিক-প্রতি মাথাপিছু মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ, আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িতে পারে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল নির্ভর করে দেশে বিনিয়োগের যোগ্য মূলধনের উপর

৭ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এইরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বাহির হইতে লোক আসার (Immigration) প্রভাব খুব বেশি হয়, কারণ কার্যক্ষম বয়সের লোকেরা দেশে প্রবেশ করে, এবং কিছুটা দক্ষতা ও মূলধন লইয়াই তাহারা আসে।

যদি বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন দ্রুত বাড়ান না হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা না হয় তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চয়ই কয়েকটি কারণে বাধা বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িলে উহার কম অংশ কর্মক্ষম বয়সের গণ্ডীতে থাকে। শিল্প প্রধান সমাজে কর্মক্ষম বয়সের লোকেরাই উৎপাদনক্ষম, অথচ দ্রুত জনবৃদ্ধি সমাজে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত কমাইতে থাকে[৮]। এই অবস্থার ফলে, শিশু-মৃত্যুর হার খুব বেশি থাকে বলিয়া মৃত্যু পর্যন্ত উহাদের ভরণপোষণ করিতে জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ ব্যয় হইয়া যায়। এই অংশ সঞ্চিত ও বিনিয়োগ হইতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চয়ই দ্রুততর হইতে পারিত। ভারতে এই অপচয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ২ %।[৯]

কর্মক্ষম ব্যক্তি কম : শিশু মৃত্যুর দরুণ উদ্বৃত্তের অপচয়

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ে, কারণ জন্মহার হ্রাসের তুলনায় মৃত্যুর হার প্রথমেই হ্রাস প্রায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি চলিতে থাকার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সকল কিছু মিলিয়া উন্নয়নের প্রথম যুগে মৃত্যুহার কমে[১০]। ইহাতে শিশু মৃত্যুজনিত জাতীয় সঞ্চয়ের অপচয় কমে বটে, কিন্তু মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম লোকের অনুপাত বাড়ে না, কারণ শিশুরা বড় হইয়া কর্মক্ষম

প্রথম যুগে মৃত্যুহার কমে, কিন্তু জন্মহার বাড়ে, অথচ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া উন্নয়নের পথ রুদ্ধ

৮ অর্থনৈতিক দিক হইতে উৎপাদনক্ষম বয়স হইল ১৫ হইতে ৬৪ বৎসর ; অনুন্নত দেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে এই বয়সের লোকসংখ্যার অনুপাত হইল ৫৭% , অথচ শিল্পপ্রধান দেশে ইহা ৬৭% (U. N. Demographic year Book, 1953)। অর্থাৎ, কর্মক্ষম ১০০ জন লোক উন্নত দেশে ৫৩ জনকে ভরণপোষণ করে, আর অপূর্ণোন্নত দেশে, (যেমন ভারতে) ৮২ জন লোকের ভার বহন করিতে বাধ্য হয়।

৯ "From the economic point of view, the manner of our growth involves an immense waste of national resources and productive capacity. First, we nurse, feed, clothe, house and train every batch of newly born population only to lose 45% of them before they reach the age of 15 at which they can make contribution to National income. If the cost of maintaining a young person up to the age of 15 is assumed to be half that of an adult, we throw away some 22·5% of our national income on rearing up persons from whom the community gets little or no return."—*D. Ghosh*—Pressure of **Population and economic efficiency in India.**

১০ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় না, উৎপাদনশক্তি বাড়াইতে হয় না, সামাজিক অর্থ নৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের দরকার হয় না, তাই উন্নয়নের প্রথম যুগে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় মৃত্যুহারের হ্রাস দ্রুত ঘটান যায়।

হওয়ার মধ্যে মোট জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে। মৃত্যুহারের হ্রাস এবং জন্মহারের বৃদ্ধি উভয় মিলিয়া উন্নয়নের প্রথম যুগে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, এবং ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রূপেই কাজ করে।

তৃতীয়তঃ, মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম থাকিলে সেই দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নের পথ রুদ্ধ করার সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়। এই সকল দেশে জমিতে নিযুক্ত চাষীর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূণ্য বলিলেই চলে। তাহাদের মাথাপিছু আয় কম, শিল্প দ্রব্যের জন্য চাহিদা কম, সঞ্চয় কম, সুতরাং শিল্পে নিযুক্ত হইবার মত মূলধনও কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে স্বল্প আয় ও স্বল্প মূলধন—এইরূপ দুষ্ট চক্রের পরিধি বৃদ্ধি পায় মাত্র। কৃষিক্ষেত্র হইতে কিছু চাষী সরাইয়া আনিলে খাদ্যের উৎপাদন কমে না বটে, কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের জন্য সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যের সংগ্রহ করার অসুবিধা বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে খুবই বেশি থাকে, তাই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ছাড়া দেশে জনবৃদ্ধি উন্নয়নের বাধারূপেই কাজ করে।

মাথাপিছু জমি কম, আয় কম, মূলধন কম—এই দুষ্ট চক্র ভেদ করার ছিদ্র কই?

চতুর্থতঃ, কৃষিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ না হইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা আরও একটি কারণে কমাইয়া দেয়। মাথাপিছু আয় বাড়ে না বলিয়া শিল্পদ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায় না, প্রধানতঃ খাদ্য ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক কাঠামো আবদ্ধ থাকে।১১ যদি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতা এবং আয় প্রথম হইতেই বাড়ান না যায়, তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চয় শিল্পোন্নয়নের গতিরোধ করিতে থাকিবে।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বিনা কৃষিক্ষেত্রে আয় বাড়ে না, অথচ উহা না হইলে শিল্প-প্রসার ঘটিতে পারে না

বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকদিন ধরিয়া টিঁকিয়া থাকিবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের নিকট তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়। সকল পুরাতন কাঠামো ভাঙিয়া ধনতন্ত্র যেমন বিরাট

---

১১ এই সকল দেশে খাদ্যের দাম কমিলে বা খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইলেও লাভ নাই, কারণ যাহারা আধপেটা খাইত, তাহারা এখন পুরাপেট খাইতে আরম্ভ করিবে। ব্রিটেন বা পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে খাদ্যের উৎপাদন, বা যোগান বৃদ্ধি শিল্পোন্নতির সহায়ক ছিল, কারণ শিল্প পুঁজি তখন কৃষিতে এবং অন্যান্য শিল্পে রূপান্তর সুরু করিয়া দিয়াছে।

সৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া আসিয়াছিল, আজ ঠিক সেইরূপ সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে—বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর বেড়া ডিঙাইয়া, উহা ছাপাইয়া দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান সম্ভবপর।১২

একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আজ যদি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমিয়াও যায় তাহা হইলেই আমাদের মাথাপিছু আয় কি বিপুলবেগে বাড়িয়া যাইবে? ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনশন ও হতাশার হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইবে? তাহা কিন্তু সত্য নয়। এই সকল দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী আমাদের অর্থনৈতিক অনুন্নতি ও অচলাবস্থা এবং একমাত্র অতিক্রান্ত এই অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়াই উন্নয়নের হার বাড়ান সম্ভব—জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইলে কি আপনা-আপনিই আমাদের উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে?১৩

যদি প্রচারের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমরা কমাইয়া উন্নয়নের হারের সমান করিতে পারি, তবেই কি আমাদের কোটি কোটি লোকের

১২"...the view that improvements in the standard of living, in the words of the Planning Commission, "are not likely to materialise if there is a concurrent increase of population" is based upon the assumption that the present frame work of our economy is likely to remain more or less intact and the pace of our economic development may be accelerated but its tempo cannot exceed the limits suggested by our experience. This view is mistaken : for the fact of the matter is that the present economy of India being itself such a limiting factor in our progress has to be superseded and replaced by another which would be materially free from its repressions. It is, therefore, wrong to project the recent past and the present into the future and forecast the rate of economic development on that basis. The present economy is its own anti-climax and has to be taken to have come to a dead end." *Dr. Gyanchand*—Some aspects of the Population problem of India—Page 9.

১৩ ফরাসী বিপ্লব জাত আশাবাদী সমাজসংস্কার মূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে ম্যালথাস তাহার তত্ত্ব দাঁড় করাইয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত এই তত্ত্বের কাজই হইতেছে দেশে অর্থনৈতিক ও সমাজ বিপ্লবের গুরুত্ব হ্রাস করা।

অন্নবস্ত্র, কর্ম ও নিরাপত্তার সংস্থান হইল? অতিনিম্ন জীবনযাত্রার মান কি তাহাতেই উন্নত হইয়া উঠিবে, অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে? ভারতের আদমসুমারী কমিশনার বলিতেছেন, "১০% হইতে ১৫% জনবৃদ্ধি (ভারতের ১৮৯১—১৯২১ সালের মধ্যে প্রতি দশকে ১.৭% হারে এবং ১৯২১—১৯৫০ সালের মধ্যে প্রতি দশকে ১২% হারে লোক বাড়িয়াছে) জৈবিক দিক হইতে স্বাভাবিক এবং পৃথিবীর উন্নত অনেক দেশেই এইরূপ ঘটিয়াছে, এবং এখনও ঘটিতেছে।"১৪

কমিশনার ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় স্বাভাবিক; ভারতের জনসাধারণ জৈবিক দিক হইতে অস্বাভাবিক নয়। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে যাহারা অপারগ এবং জনবৃদ্ধি কমানই সমাজতন্ত্র রোধের উপায় বলিয়া যাহারা মনে করেন—বরং তাহাদেরই কিছুটা "অস্বাভাবিক" বলিয়া মনে করা চলে।১৫

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Economic Growth)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সফল হইতে হইলে কোনো দেশের সমাজকে তাহার জন্য পূর্ব হইতে কিছুটা প্রস্তুত হইতে হয়। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির ধারার মধ্যেই সেই প্রস্তুতি চলিতে থাকে, এবং সমগ্র সমাজ-দেহ ও সমাজ-মন উন্নয়নের গতিবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। এই সময়ে সকল প্রকার উৎপাদন, পরিবহন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন ব্যাঙ্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শেয়ারবাজার, জিনিসপত্রের পাইকারী ও খুচরা বাজার, মূলধনের বাজার, মালিকসঙ্ঘ, শ্রমিকসঙ্ঘ, কৃষকসঙ্ঘ, মধ্যবিত্ত কর্মচারীর সমিতি প্রভৃতির) কাজকর্ম চালাইবার পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন আসিতে থাকে; সমাজদেহ বা সামাজিক কাঠামো দ্রুত রূপান্তরিত হয়।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন হয়—সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনও খুব দরকার

১৪ All India census Report 1951 P, 181—88

১৫ "There is no need to fight the Malthusian devil all the time. Time is long past when this was necessary , now it essential to take a more positive and constructive view of population and treat it as a major problem of radical social reconstruction , of ringing in the new social system and developing it rapidly and successfully". *Dr. Gyanchand* **Bannailli Readership Lectures, University of Patna,** March 1954.

এই রূপান্তর সফল করিবার জন্য, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন মনোভাব, পরিবর্তনশীল চিন্তাধারণা গ্রহণ ও অবলম্বন করার মত যোগ্যতা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিমানসের থাকা দরকার। সমাজ-দেহ যেমন শিল্পপ্রধান ও অধিকতর যন্ত্র-নির্ভর হইয়া উঠে; সমাজ-মনও সেইরূপ অর্থনৈতিক চুলচেরা হিসাব-নিকাশে আন্দোলিত হওয়ার মত গুণ আয়ত্ত করে (appreciative and sensitive to crude economic calculus)। সমাজ-মনের এইরূপ পরিবর্তন ও উপযুক্ত দিক-নির্দিষ্টতা আসিয়া পড়িলে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথ সরল হয় ও গতি দ্রুত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাবে পরিবর্তন কম বেশী হারে হইতে পারে; কোনো শ্রেণী অর্থনৈতিক উন্নয়নে লাভবান (আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে) হয়, তাহাদের মধ্যে উন্নয়নের উপযোগী মনোভাব দ্রুত তৈয়ারী হয়; যাহারা ততটা লাভবান নয় তাহাদের সেইরূপ মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠে না। ফলে এই সময়ে সমাজ-মন নিজের মধ্যেই বহু বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তবু যদি সমাজ-মানসের বৃহত্তর এবং চলনশীল (mobile) অংশে ক্রমোন্নতিজাত ও উহার উপযোগী বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তিগুলি গড়িয়া ওঠে তবেই সেই উন্নয়ন সাফল্য লাভ করিতে পারে। ভিক্টোরীয় সামন্ততন্ত্রীয় ইংলণ্ড, রাজতন্ত্রীয় জার্মানী, ধর্ম-সমাজতন্ত্রীয় জাপান, অতিআধুনিক আমেরিকা, সামন্ততন্ত্রীয় রুশিয়া ও চীন, আধাধর্মীয়, আধা-সামন্ততন্ত্রীয় ও আধা-আধুনিক ভারতবর্ষ—এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎপত্তিকালীন পরিবেশ (সমাজ-দেহ ও সমাজ-মন) পৃথক এবং প্রত্যেকটি দেশের সেই পরিবেশের প্রভাব ও পরিবেশ-পরিবর্তনের গতিও পৃথক। অনুন্নত বা অপূর্ণোন্নত দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিষ্ঠান থাকে যাহার দরুণ দ্রুত উন্নয়নের বেগ লাভ করিতে অসুবিধা হয়। উপযুক্ত পরিমাণে শিল্পনেতা, শ্রমিক ও মূলধন না পাইলে দ্রুত উন্নয়ন হইতে পারে না এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও আচার ব্যবহার ইহাদের যোগান সংকুচিত রাখে। শিল্পপ্রসারের মনোভাব সৃষ্টিতেও ইহারা প্রচুর বাধা দেয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন আসে সামাজিক মনে পরিবর্তনের প্রভাবে

প্রথমতঃ, সকল দেশের সমাজের মধ্যেই সকলে মানিয়া লয় এইরূপ কতকগুলি নিয়মকানুন ও নিষেধাজ্ঞা থাকে (series of protective and prohibitive social taboos)। অপূর্ণোন্নত দেশে সামাজিক নিয়ম-

কানুন ও নিষেধাজ্ঞাগুলির প্রকৃতি এমন যে দ্রুত উন্নয়নের হারে ইহারা বাধা দিতে থাকে। অনেক সময় কোন কোন দ্রব্যের ব্যবহার বা কোন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে ইহারা মনোভাব সৃষ্টি করে। কোন কাজকে উঁচু মনে করা হয়, কোন কাজকে নীচু বলিয়া ঘৃণা করা হয়। কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক বা জীবজগতের প্রতি এক বিশেষ ধরণের সামাজিক মনোভাব (যেমন ভারতের অধিবাসীদের গরু-প্রীতি (Cattle-Complex) উহার উপযুক্ত অর্থনৈতিক নিয়োগে বাধা দেয়। স্ত্রীলোকের পর্দা' প্রথা দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তির অনুপাত কমাইয়া দিতে পারে।

ধর্মীয় বা সামাজিক বিধিনিষেধ ও বিশ্বাস

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সমাজে বহুদিন ধরিয়া উন্নয়ন ঘটে নাই বলিয়া প্রাচীন ঐতিহ্য বা জীবন যাপন প্রণালী এমন মজ্জাগত হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় তাহা বাধার রূপেই দেখা দেয় (Obstacles due to traditional modes of life fixed through generations of comparative static economic conditions)। গ্রাম্য কাজকর্মের ধরণে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সহরে নিয়োগ করিতে হইলে যন্ত্রশিল্পের উপযোগী অভ্যাস ও মানসিক বৃত্তি গড়িয়া ওঠা দরকার। কৃষিতে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মিত কাজের অভ্যাস (punctuality and regularity) ততটা না থাকিলেও চলে; কিন্তু যন্ত্রশিল্পে তাহা চলে না। কাপড় জামা ও তাহা পরিধানের ধরণ হইতে সুরু করিয়া চলাফেরার রকমসকম সবই বদলাইতে হয়। ইহাদের দ্রুত বদ্‌লান গেলেও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই গুরুত্বপূর্ণ।

অভ্যস্ত জীবন যাপন প্রণালী

তৃতীয়তঃ, সামাজিক দল ও উপদল, জনসমষ্টি ও উপসমষ্টি (attitudes bred out of social formations and groupings) যেমন পরিবার, গোষ্ঠী (clan), গ্রাম সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্য হইতে ব্যক্তিমনের কতকগুলি দৃষ্টিভংগী গড়িয়া ওঠে। কোন বিশেষ বিষয়ে এইরূপ দল ও উপদল, জনসমষ্টি ও উপসমষ্টির স্বার্থ ও দৃষ্টিভংগীর সহিত ব্যক্তির দৃষ্টিভংগীকে মিলাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। পরিবর্তনের যুগে এই সকল উপসমষ্টির অনেক উপকারিতাও থাকে, অসংগঠিত ব্যক্তিরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তাহা হইতে কিছুটা-রক্ষা

সামাজিক উপদল বা উপসমষ্টি

পাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী ও জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ করা ও আত্মস্থ করিতে হইলে (adaptation and assimilation) ব্যক্তিমানস যত দ্রুত চলনশীল হওয়া দরকার—তাহাতে ইহারা বাধা দিতে থাকে।

চতুর্থতঃ, সমাজে এই সকল উপসমষ্টি ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক শ্রেণী থাকে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদ হইতে কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে attitudes bred out of class-division)। বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভংগীতে পার্থক্য থাকায় সমাজ নিজের মধ্যে বহুধা বিভক্ত থাকে, বহুভূত সমাজে (plural societies) পরিণত হয়। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ভয় সৃষ্টি হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইতে পারে। পরশ্রমভোজী ও ধনিকশ্রেণীকে সামাজিক পদমর্যাদা ও অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে সরাইবার মধ্য দিয়া একই সঙ্গে যে ঘৃণা, সম্মানবোধ, ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে তাহা অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করে। রাশিয়া ও চীনে মালিকশ্রেণীর সম্পর্কে ঘৃণা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের আত্মবিশ্বাস মিলিয়া বহুলাংশে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

সর্বশেষে, বর্তমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে ব্যক্তির যে দৃষ্টিভংগী গড়িয়া উঠে (attitudes derived from the recent history, political and economic) তাহার প্রভাবও কম নয়। ঔপনিবেশিক শোষণ চলিতে থাকিলে বা উহা হইতে মুক্ত হইলে প্রধানতঃ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগীর উদ্ভব হয়। এই জাতীয়তাবাদ যত উগ্র হইবে, (উন্নয়নের উপযোগী অন্যান্য সকল বিষয় সমান থাকিলে) অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ততবেশি হওয়ার সম্ভাবনা। জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্রধানতঃ দুইটি : (ক) নিজেদের উন্নয়নের কাজ নিজেরাই করিব, এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতা জাগান, এবং (খ) পৃথিবীর জাতিদের মধ্যে নিজের জাতিকে সম্মানজনক ও উচ্চস্থানে তুলিবার আকাংখা জাগান। পশ্চিমী দেশগুলি যন্ত্রশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া উন্নত হইয়াছে, আমাদেরও উন্নত হইতে হইলে দ্রুত শিল্প-

বর্তমান কালীন ইতিহাস

উন্নয়নের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব

প্রসার চাই—এই প্রতিযোগিতার মনোভাব অনেকাংশে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাকে, ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকে প্রভাবান্বিত করে, গ্রাম্য মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া যন্ত্রশিল্প গ্রহণের উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশে, এবং ভারতেও, গণইচ্ছার (will of the people) মধ্যে দুইটি প্রধান ভাবাদর্শ দেখা যাইতেছে ; প্রথমতঃ দেশের সম্পদ ও জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নত করার ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-তান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে এই উন্নতি ঘটান ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়িয়া তোলা। সমাজ মানসের অধিকাংশের দৃষ্টিভংগী এই দুই ভাবাদর্শের দ্বারা সঞ্চালিত ও রূপায়িত হইতেছে ; কিছু অংশ এখনও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী গড়িয়া তুলিতে বাধা দিতেছে। সকল দেশের রাষ্ট্রই জনমানসের শক্তিশালী ও মুখর অংশের স্বার্থও ইচ্ছার বাহক ও সঞ্চালক। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—সব কিছুর উপযোগী প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানজাত দৃষ্টিভংগী মিলাইয়া গঠিত মিশ্র অর্থনীতির ভাবাদর্শ গ্রহণ করায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত করার মত তীক্ষ্ণ নির্দিষ্ট মনোভংগী গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

———

নবম পরিচ্ছেদ

জাতীয় আয় ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনা

National Income & Perspective Planning

কোন দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য ও বিভিন্ন কার্যের সমষ্টি উৎপাদন করে তাহার মোট মূল্যকে সেই দেশের সেই বৎসরের স্থূল জাতীয় আয় বলে। ইহা হইতে সেই বৎসরে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া হিসাব করিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, তিনটি উপায়ে কোনো দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া (final products totalisation); দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের কাজে সহায়তার দরুণ উপাদানসমূহের সকল পাওনা যোগ করিয়া (Factor payments totalisation); এবং তৃতীয়তঃ, একবৎসরে জনসাধারণের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া (Consumption-Savings totalisation)।

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ও ইহা পরিমাপের পদ্ধতি

জাতীয় আয় এমনভাবে পরিমাপ করা হয়, যাহাতে জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের পরিমাণও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, বৃহৎ ও ভারি শিল্প, পরিবহন, বণ্টনব্যবস্থা, প্রভৃতি কাজকর্মের পারস্পরিক গুরুত্ব ও নির্ভরশীলতার চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থি বুঝিতে পারা যায়। আয়-ব্যয়ের ধরণ, কোন্ ক্ষেত্রে কত শ্রম ও মূলধন নিযুক্ত থাকিয়া কত পরিমাণ সম্পদ্ উৎপাদন করিতেছে, শ্রমিকের বা যন্ত্রের উৎপাদনক্ষমতা কোন্‌ক্ষেত্রে বেশি বা কোন্ ক্ষেত্রে কম—সকল কিছুই আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বুঝিতে পারি। ভারতের ক্ষেত্রে এই

জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধা, প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব আরও বেশি। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে, অথবা উন্নয়নের ও ক্রমোন্নতির নির্দিষ্ট ধারাপথে ও গতিবেগে দেশ অগ্রসর হইতেছে কিনা বুঝিতে হইলে অবশ্যই আমাদের জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা দরকার।

ভারতে জাতীয় বিভিন্ন আয়ের পরিমাপ (Different estimates)

বৃটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং কয়েকজন ইংরাজ আমাদের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আথিক আয়ের পরিমাপ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয় আয়ের হিসাবগুলি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

কে হিসাব করিয়াছিলেন	কোন বছরের হিসাব	মাথাপিছু আয় টা. আ. পা.
দাদাভাই নওরোজী	১৮৬৭-৭০	২০ —০ —০
লর্ড ক্রোমার	১৮৮২	২৭ —৮ —০
ডিগ্‌বী	১৮৯৫-৯৯	১৭ —৮ — ৫
লর্ড কার্জন	১৯০০	৩০ —০ —০
ওয়াদিয়া ও জোশী	১৯১৩-১৪	৪৪ —৫ —০
শাহ্‌ ও খাম্বাটা	১৯০০-১৪	৩৬ —০ —০
সিরাস্‌	১৯২১	১০৭ —০ —০
সাইমন কমিশন	১৯২৯	১১৬ —০ —০
ভি, কে, আর, ভি রাও	১৯৩১-৩২	৬৫ —০ —০

এই সকল হিসাব গুলিকে একেবারে সঠিক বলা চলে না এবং ইহাদের সাহায্যে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কিছুই স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। তথ্য সংগ্রহের অসুবিধা ছিল খুবই বেশি।

এই সকল হিসাবের ত্রুটি

প্রকাশিত পুস্তক বা সরকারী কাগজ পত্রে তথ্যের উপর নজর দেওয়া হইত না। ফলে অনেকাংশে আন্দাজি হিসাবমত গণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকে হিসাবের সময় সকল বিষয়ে সমান মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নয়। ইংরাজ শাসিত ভারত, দেশীয় রাজ্যগুলি, অন্যান্য বিদেশী পকেটগুলি প্রভৃতি

থাকাতে বিভিন্ন ব্যক্তির হিসাবে পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে তুলনা করিবার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই মানদণ্ডের সাহায্যে হিসাব করা হয় নাই, তাই এই সকল হিসাব হইতে জাতীয় আয়ের গতিবিধির নির্দিষ্ট কোন ধারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি না।

জাতীয় আয় কমিটির হিসাব (Estimate of National Income Committee)

স্বাধীনতা পাইবার পরে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সামগ্রিক তথ্য আহরণের জন্য ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় আয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন।১ কমিটি প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮—৪৯ সালের জাতীয় আয়ের হিসাব দেন। কমিটি সর্বশেষ রিপোর্টে ১৯৪৮—৪৯ সালের পরিবর্তিত হিসাব এবং ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালের হিসাব দেন। উহার পর হইতে আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব পাই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের বার্ষিক বিবরণী হইতে।

জাতীয় আয় কমিটির প্রতিষ্ঠা

কমিটির প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব বাহির হইয়াছিল। সেই বছরের জাতীয় আয়ের হিসাব ছিল ৮৭১০ কোটি টাকা। কৃষি ও তদনুরূপ ক্ষেত্র হইতে ৪১৫০ কোটি; খনি, যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতি হইতে ১৫০০ কোটি; বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে ১৭০০ কোটি; এবং অন্যান্য কাজকর্ম হইতে ১৩৮০ কোটি—মোট ৮৭৩০ কোটি টাকা হইতে ২০ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স বাদ দিয়া ৮৭১০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল।২ মোট জনসংখ্যা ধরা হইয়াছিল ৩৪ কোটির কিছু বেশি, ফলে

প্রথম রিপোর্টের এবং সংশোধিত রিপোর্টের দুই প্রকার হিসাব

---

১ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ; গ্যাড্‌গিল; ভি, কে, আর, ভি, রাও, বিদেশী পণ্ডিত যেমন অধ্যাপক সাইমন কুজনেটস্ প্রভৃতি ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল, ইহারা জাতীয় আয় ইউনিটের কর্মীবৃন্দের সাহায্যে গণনা করিয়াছিলেন, প্রথম রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে, শেষ রিপোর্ট ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

২ অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন এবং কাজকর্ম হইতে যথাক্রমে মোট জাতীয় আয়ের ৪৭.৬%; ১৭.২%; ১৯.৫% এবং ১৩.৮% অংশ উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৪৮-৪৯ সালে মাথাপিছু আয়ের হিসাব ছিল বৎসরে ২৫৫ টাকা। সর্বশেষ রিপোর্টে এই হিসাব সংশোধিত করিয়া বলা হয় যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাকা এবং বৎসরে মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬'৯ টাকা।

তাহার পর হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণে প্রতি বৎসর কিরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা নীচে তালিকার আকারে দেওয়া হইল :

নির্দিষ্ট বৎসরের ১৯৪৮-৪৯) এবং চল্‌তি বৎসরের দামস্তর অনুযায়ী জাতীয় আয়ের গতিধারা বিশ্লেষণ।

বৎসর	নীট জাতীয় আয় (কোটি টাকার হিসাবে)		মাথাপিছু আয় (টাকার হিসাবে)	
	চল্‌তি দাম-স্তরের হিসাবে	১৯৪৮-৪৯ সালের দাম-স্তরের হিসাবে	চল্‌তি দাম-স্তরের হিসাবে	১৯৪৮-৪৯ সালের দাম-স্তরের হিসাবে
১৯৪৮—৪৯	৮,৬৫০	৮,৬৫০	২৪৬'৯	২৪৬'৯
১৯৪৯—৫০	৯,০১০	৮,৮২০	২৫৩'৯	২৪৮'৬
১৯৫০—৫১	৯,৫৩০	৮,৮৫০	২৬৫'২	২৪৬'৩
১৯৫১—৫২	৯,৯৭০	৯,১০০	২৭৪'০	২৫০'১
১৯৫২—৫৩	৯,৮২০	৯,৪৬০	২৬৬'৪	২৫৬'৬
১৯৫৩—৫৪	১০,৪৮০	১০,০৩০	২৮০'৭	২৬৮'৭
১৯৫৪—৫৫	৯,৬২০	১০,২৮০	২৫৪'২	২৭১'৯
১৯৫৫—৫৬	৯,৯৯০	১০,৪৮০	২৬০'৮	২৭৩'৬
১৯৫৬—৫৭* (প্রাথমিক হিসাব)	১১,৪১০	১১,০১০	২৯৪'৩	২৮৪'০

স্বাধীনতার পর হইতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের অগ্রগতির এই হিসাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, চল্‌তি দামস্তরের হিসাবে নীট জাতীয় আয় যত পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী হইল দামস্তরে বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করিলে মাথাপিছু আয় ততটা বাড়ে নাই। কারণ লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির বিবরণী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, কৃষি ও পশুপালন হইতে আয়ের অনুপাত কমিয়া আসিতেছে এবং মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রের অনুপাত ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

দামস্তরে বৃদ্ধি হইতে সর্বাপেক্ষা লাভবান হইয়াছে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি ও অসুবিধা (Methods and difficulties of estimation of National Income in India)

সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়ঃ উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি, আয়-সুমারী পদ্ধতি ও ভোগ-সঞ্চয় পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর নীট উৎপাদনকে যোগ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল ব্যক্তির সকল প্রকার আয় যোগ করা হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে মোট বৎসরে দেশের অধিবাসীদের মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

উন্নত দেশের তিনটি পদ্ধতি

ভারতের জাতীয় আয় কমিটি এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটির সাহায্যে পরিমাপ করিতে পারেন নাই, তৃতীয় পদ্ধতি তাঁহারা ব্যবহারই করেন নাই, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পদ্ধতি একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষি, অরণ্য, পশু-পালন, শিকার, মাছধরা, খনি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উৎপাদন সুমারী পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাদির নীট পরিমাণ যোগ করা হইয়াছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালতের বিভিন্ন প্রকার চাকুরী প্রভৃতি হইতে আয় যোগ করিয়া আয়-সুমারী পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করা হইয়াছে।

ভারতের মিশ্রিত পদ্ধতি

জাতীয় আয় কমিটি নিজেই কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ তথ্য সংগ্রহের বহুবিধ অসুবিধা। এই সকল অসুবিধাগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলেঃ (ক) তত্ত্বগত, (খ) তথ্যগত ও (গ) তুলনাগত।[৬]

---

৬ The Economics of underdeveloped countries—*Bauuer yamey* : Chap II & III P. 16—42.

প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে বা কাজকর্মকে হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বহু মতভেদ দেখা যায় এবং স্পষ্ট কোন মানদণ্ড পাওয়া যায় না। যেমন, অনেক সময় নিজের বা পরিবারের জন্য যে কাজকর্ম করা হয় তাহাদের বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পরিবারের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় বা ভোগ করা হয় তাহাদের হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশগুলিতে 'পরিবার'-সমূহ গঠিত হয় বহুপ্রকার সম্পর্কযুক্ত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া, কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে পরিবারের সংজ্ঞা মোটামুটি নির্দিষ্ট। ফলে অধিক পরিমাণ পারিবারিক কাজকর্ম হিসাব হইতে বাদ পড়িয়া যায়। ভারতের বহু অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কাজ স্ত্রীলোকেরাই করে, তাহার দাম যোগ দেওয়া হয় না। পুরুষেরা বিক্রয়ের কাজ করিলেও সেই কাজকে পৃথকভাবে হিসাব করা হয় না।

তত্ত্বগত অসুবিধাগুলি

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির ন্যায় ভারতবর্ষেও অধিকাংশ দ্রব্য-সামগ্রী বাজারে আসে না; উৎপাদক হয় নিজেই ভোগ করে বা অপর উৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। সুতরাং বহু-পরিমাণে আন্দাজের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয় এবং হিসাব নিখুঁত হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, এই সকল দেশে উৎপাদন-সমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অধিক প্রসার লাভ করে নাই। যেমন একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, মজুর খাটিয়া আয় করে। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (classification of sectors), অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

সর্বোপরি, যে দামে চাষীরা বা উৎপাদকেরা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে সেই দাম বৎসরের সকল সময়ে সকল স্থানে সমান থাকে না এবং ক্রেতারা যে দামে কেনে সেই দাম হইতে উহার পার্থক্য খুবই বেশি। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের আর্থিক মূল্য হিসাব করার অসুবিধার কম নয়।

তথ্যগত অসুবিধার মধ্যে প্রধান হইল তথ্যের অসম্পূর্ণতা। ইহা বহুরূপ লইয়া দেখা দেয়। যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা সঠিক নয় এবং দক্ষ কর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত নয়। তথ্যের আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও পার্থক্য এত বেশি যে, একটি অঞ্চলের সম্পূর্ণ তথ্য পাইলেও উহার সাহায্যে সারা দেশের হিসাব বাহির

তথ্যগত অসুবিধাগুলি

করা চলে না। সর্বোপরি, দেশের রাজ্যক্ষেত্রে (Territory) অনবরত পরিবর্তন হইতে থাকায় সারা ভারতের তথ্যগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তন করিতে হয়।

এই সকল অসুবিধার জন্যই তুলনাগত বহু অসুবিধা আসিয়া পড়ে। যখন আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সহিত অপর কোন দেশের জাতীয় আয়ের তুলনা করা হয় তখন দুইটি দেশের হিসাব একই মানদণ্ডের ভিত্তিতে গণনা করা হইয়াছে কি না তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য থাকায় এইরূপ তুলনা করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

তুলনাগত অসুবিধাগুলি

আমাদের দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার প্রধান ত্রুটি হইল দৃষ্টিভঙ্গিতে। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, সোবিয়েত চীন প্রভৃতি দেশে উৎপাদক শ্রম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির মূল্যকেই হিসাবে আনা হয়, অনুৎপাদক কাজকর্মকে হিসাবে আনা হয় না। সমাজে আয়-কর ফাঁকি শিখাইবার জন্য উকিলের বা আয় বৃদ্ধি পাইলে, ধনিক শ্রেণীর গৃহপরিচারক বা মোটরগাড়ী চালকের সংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় প্রকৃত পক্ষে বাড়ে না। তৃতীয় স্তরের কাজকর্ম (Tertiary occupation) করে এইরূপ বহুব্যক্তির কাজকর্ম হিসাব হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ক্রমোন্নতির পথে দেশের অগ্রগমন পরিমাপ করিতে হইলে অনুৎপাদক কাজকর্ম বাদ দেওয়াই উচিত।৪

জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা সমাজতান্ত্রিক নয়, ধনতান্ত্রিক ইহাই মৌলিক অসুবিধা

দূর-প্রসারী পরিকল্পনা ও ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি
(Perspective Planning and National Income):

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনার সময়েই ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় কি গতিতে বাড়িবে তাহার

8 In the eastern European couentrives serices not directly connected with the production and transport of goods are not regarded as productive and their value is thus excluded from National Income. For a poor Country which is trying to develop its industry and to reduce the underemployment common in service trades, the marxist definition of national income has some obvious advantages over the more inclusive concept suited to wealthy industrialised economies and now commonly adopted in underdeveloped Countries—*United Nation's* **Economic Survey of Europe since the war (1952).**

আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান পরিকল্পনাকাল উত্তীর্ণ হইয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকালগুলিতে জাতীয় আয় কিরূপে ক্রমবর্ধমান থাকিবে তাহার কাঠামো গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন সারিতে বিভিন্ন কাল-স্তরের জাতীয় আয়কে তালিকাবদ্ধ করিয়া (time series table) ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় আয়ের কাল-পথ (time path) প্রস্তুত করিয়াছেন।

আগামী ২১ বৎসরে জাতীয় আয় কতদূর বাড়িতে পারে তাহা বলা হইয়াছে। কিছুটা বর্তমানের গতি ধারা এবং কিছুটা আন্দাজ—ইহাদের ভিত্তিতে দেখান হইয়াছে যে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে ১৯৫২—৫৩ সালের দামস্তরে প্রকাশিত ১৯৫০—৫১ সালের জাতীয় আয় (৯,১১০ কোটি টাকা) ১৯৬৭—৬৮ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথা-পিছু আয় দ্বিগুণ হইবে ১৯৭৩—৭৪ সালে।৫

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রতিবৎসরে প্রায় ৫% হারে জাতীয় আয় বাড়িবে, ফলে, পরিকল্পনার শেষে মোট জাতীয় আয় ২৪·৮% বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৪৮০ কোটি টাকাতে দাঁড়াইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯৬৫—১৯৬৬ সালে ২৭% বাড়িয়া দাঁড়াইবে ১৭২·৬০ কোটি টাকাতে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় উহা বাড়িবে যথাক্রমে ২৫·৬% ও ২৬·৮% হারে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে উহা হইবে ২১,৬৮০ কোটি টাকা, ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াইবে ২৭,২৭০ কোটি টাকা।

এই সকল পরিকল্পনাকালগুলির মধ্যে জনসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে তাহা আলোচনা না করিলে মাথাপিছু আয় কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করা যাইবে না। ১৯৫১—৬০ সালের মধ্যে ধরা হইয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ১২·৫%। কিন্তু পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাইবে কারণ জন্মহার সমান থাকিলেও মৃত্যুহার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা (উন্নততর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থার দরুণ)। ধরা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাইবে, ফলে মাথাপিছু আয় ততটা বাড়িতে পারিবে না

৫ এই আলোচনার সময়ে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, প্রথম পরিকল্পনা কালে ভারতের জাতীয় আয় ১১% বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতের জাতীয় আয় বাড়িয়াছে ১৮·৪% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ইহা ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার যে, দামস্তরে কিরূপ পরিবর্তন হইবে তাহা হিসাবের মধ্যে আনা হয় নাই, ফলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বা জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

হইয়াছে যে. ১৯৬১—৭০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ১৩'৬% এবং ১৯৭১-৮০ সালে ১৪%। ফলে আমাদের মাথাপিছু আয় অতি দ্রুত বাড়িতে পারিবে না। জাতীয় আয় ১৯৬৭—৬৮ সালে দ্বিগুণ হইলেও মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে ১৯৭৩—৭৪ সালে।

পরিশিষ্ট

ভারতের মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত ও জাতীয় আয় সম্পর্কে আলোচনা (A note on Capital-output ratio and National Income in India)

সমভাবে প্রযোজ্য সকল দেশেও সকল সময়ে একটি নির্দিষ্ট কোনো মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত নাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ স্তর এবং সেই উন্নয়নের রূপ ও কাঠামো প্রভৃতি সকল কিছুর উপরই ইহা নির্ভর করে। যেমন, জাপানে কয়েক বৎসরের মধ্যে (মোটামুটি ১৮৮৫ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছিল। মূলধন নিয়োগ বাড়ান হইয়াছিল কম, প্রধানতঃ সার, উন্নত বীজ, জলসেচ ও কীট পশু পক্ষীর হাত হইতে ফসল রক্ষা প্রভৃতির দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আধুনিক কালে পূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ১ ইউনিট আয় বাড়াইতে ৩ গুণ হইতে ৩½ গুণ মূলধন দরকার হয়, অবশ্য বিশেষ অবস্থায় এই অনুপাতের বহু তারতম্য দেখা যায়।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূলধন-উৎপন্নের এই অনুপাতকে ৩:১ বলিয়া ধরা হইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে বিনিয়োগের বৃদ্ধি উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটাইবে এইরূপ সময় (time-lag) হিসাব করা হইয়াছিল (অর্থাৎ দুই বৎসরের মধ্যে উৎপাদন ১০০ বাড়াইতে হইলে ৩০০ মূলধন নিয়োগ করা দরকার)। ধরা হইয়াছিল যে, ১৯৫০—৫১ সালে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ৫%, ১৯৫৫—৫৬ সালে ইহা বাড়িয়া হইবে ৬¾%, ১৯৬০—৬১ সালে হইবে ১১% এবং ১৯৬৭—৬৮ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ২০%—এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরা হইয়াছে বার্ষিক ১¼%। জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা—এই উভয় হিসাব ধরিয়া বলা হইয়াছিল যে, আমাদের মাথাপিছু আয় ১৯৭৭ সালে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে (প্রথম পরিকল্পনা সুরু হওয়ার ২৭ বৎসরের মধ্যে), ইহার ফলে এই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু ভোগের স্তর ৭০% বাড়িবে। প্রকৃত ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা সাফল্যের পরিমাণ বেশি। প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮%; যাহা আশা করা হইয়াছিল তাহাপেক্ষা ৭% বেশি হইয়াছে। উপরন্তু, প্রথম পরিকল্পনায় মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ১'৮৮:২ (ধরা হইয়াছিল ৩ : ১)।*

*° "This highly favourable outcome is the result partly of good monsoons and it also reflects the fact that considerable expansion in industrial output has been possible through utilisation of unutilised capacity."

বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই হইল সামগ্রিক অর্থনীতির হিসাবে মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত। মূলধনের এই উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে বহুবিধ বিষয়ের উপর, যেমন মূলধনের পরিমাণ, মূলধন-বিনিয়োগের উপযুক্ত যন্ত্রজ্ঞানের অগ্রগতি, নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি পরিচালনার যোগ্যতা, এবং মূলধন ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত পরিচালনগত ও সাংগঠনিক নৈপুণ্য। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কিছু পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে অপরিকল্পিত কাঠামোর তুলনায় অনেক বেশি। ইহার কারণ অনেক। পরিকল্পনার ফলে উৎপাদনের কার্যসূচীসমূহের মধ্যে সংগঠন ও সামঞ্জস্যবিধান ভালভাবে করা যায়, অপরিকল্পিত বাজারভিত্তিক কাঠামোর (unregulated market economies) সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই এড়ান সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগের রূপ ও আকৃতির (composition of investment) উপরও এই উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে। যেমন, উদাহরণ দেখাইয়া বলা যায়, সোভিয়েট রাশিয়ায় মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত এত বেশি ছিল তাহার কারণ গৃহনির্মাণে বিনিয়োগ ছিল খুবই কম। সর্বোপরি মূলধন উৎপন্নের অনুপাত নির্ভর করে স্থায়ী যন্ত্রপাতি বা স্থায়ী পুঁজি (economic overheads) কতদূর ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর। স্থায়ী পুঁজি হইতে বিনিয়োগের পূর্ণ ফল পাইতে হইলে কিছুদিন ধরিয়া অপূর্ণ ব্যবহারের স্তর (period of underutilisation) চলিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূলধন-উৎপন্নের অনুপাতের হিসাবে পার্থক্য দেখা দিবে।

ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হিসাব করা হইয়াছে ৬২০০ কোটি টাকা, যাহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ২৭০০ কোটি টাকা (১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা)। এই হিসাবে দেখা যায় যে, মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত ধরা হইয়াছে ২·৩ : ১। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় এই অনুপাত বাড়িয়া দাঁড়াইবে যথাক্রমে ২·৬২ : ১, ৩·৩৬ : ১ এবং ৩·৭০ : ১।

অনুশীলনী

1. Discuss the relation of Natural Resources to Economic Development.

2. What are Monsoons? Describe their influence on the economic life of India.

3. Give a brief account of the mineral products of India with reference to their location and distribution.

4. Describe the importance of forests in the economic life of India and the forest policy of the Government of India.

5. Briefly describe the important varieties of soils in India and point out uitability for the growth of parti ular kinds of crops.

6. Examine some of the salient features of the Indian population.

7. Under what conditions could a country be said to be over-populated? Is India over-populated?

8. "Over-population lies at the root of Indian poverty." Do you accept this view?

9. "In India there is really no problem of overpopulation at the present time." Examine this view.

10. "The growth of population is a menace to national prosperity." Assess the truth of this statement with regard to Indian situation.

11. What is the relation between Population and economic development? Discuss with particular reference to Indian situations.

12. Discuss the importance of changing social envirorment for successful economic planning.

13. How the Social environment of India is changing with the impact of the plan?

14. Discuss the Longterm perspective pictured by the planning commission for the economic growth of India.

15. Give an estimate of National Income of India and its relevent features.

চতুর্থ খণ্ড

ভারতীয় কৃষি উৎপাদনের কাঠামো

Agrarian Structure of India

দশম পরিচ্ছেদ

কৃষির গুরুত্ব ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো

Importance of Agriculture and Pattern of Rural Economy

বর্তমানে ভারত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের যুগে ভারতে কৃষি কাঠামোর গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে কৃষির গুরুত্ব অসাধারণ। প্রথমতঃ শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে জমির উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উভয় দিক হিসাব করিলে ইহা ৭৫% হইবে। দ্রুত শিল্পোন্নয়ন না হইলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমানই থাকিয়া গেলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে[১]।

কৃষির ভিত্তির উপরই বিরাট শিল্পকাঠামো দাঁড়াইয়া আছে

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি হইতেই ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় ৪৭ ভাগ পাওয়া যাইত, বর্তমানে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কৃষি উৎপাদনে অনেকখানি অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষির অনুপাত অল্প কিছু কমিয়াছে। তৃতীয়তঃ কৃষির উন্নতি ও সুষ্ঠু উৎপাদনের উপর প্রধান শিল্পসমূহের কাঁচামালের যোগান নির্ভর করে। কৃষির উন্নতি হইলেই খাদ্যশস্যের দাম কম থাকিবে, ফলে মজুরি ও কাঁচামালের দাম কম থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি হইলেই দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে।

কৃষির প্রসারেই শিল্প প্রসার সম্ভব

চতুর্থতঃ, ভারতকে কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে শিল্পদ্রব্য আমদানি করিতে হয়, কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স ভারতের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইবে। ভারত-

---

১ Second Five Year Plan, Page 1. ইংলণ্ডে মোট জনসংখ্যার ৫% এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১২% কৃষিতে নিযুক্ত আছে।

সরকার ক্রমেই অধিক শিল্প ব্যবসা হাতে লইতেছেন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় কৃষি হইতে অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হওয়া দরকার। একমাত্র তাহা হইলেই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপযোগী খাদ্য কাঁচামাল ও শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। সর্বোপরি, সামগ্রিক সমাজজীবনে কৃষির গুরুত্ব খুবই বেশি ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্‌কাল কমিশন বলেন যে, ভারতবর্ষে কৃষি কেবলমাত্র উপজীবিকা নয়, ইহা হইল একপ্রকার জীবনযাপনপ্রণালী, বহুশতাব্দী ধরিয়া কোটি কোটি জনসাধারণের জীবনযাপনের রূপ নির্ধারণ করিয়া আসিতেছে।২

গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো (Pattern of Rural Economy)

১৯৫০ সালের অক্টোবর এবং ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় নমুনা জরিপকার্যের (National Sample Survey) প্রথম ধাপে দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এক একটি পরিবারে গড়ে ৫·২১ জন লোক আছে। প্রতিটি পরিবারে গড়ে এক চতুর্থাংশের একটু বেশি (২৮·১%) স্বাবলম্বী ও আয়কারী ; প্রায় এক ষষ্ঠাংশ (১৬·৬%) পরাবলম্বী ও আয়কারী এবং ; অর্ধেকের বেশি (৫৫·৩%) পরাবলম্বী ও আয় করে না।

পরিবার ও আয়

জাতীয় নমুনা জরিপকার্যের প্রথম ধাপের হিসাব (First round) অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ১৯৪৯-৫০ সালে বাৎসরিক ভোগ-ব্যয় ছিল ২২০ টাকা

২"Every country is under an obligation to develop to the maximum extent possible from its own resources. This has no other meaning than that in the early period of planned economic development agriculture must provide for a considerable part of the initial resources for investment. These take the form, firstly, of manpower released for non-agricultural work ; secondly, of supply of foodgrains for meeting the increased demand and of raw-materials for new industries ; thirdly, of capital resources to be employed in agriculture both by way of self-financing and for investment by public authorities ; and finally, foreign exchange resources to be earned through exports of agricultural products. Rationalisation of agriculture, increase in its total production and in its productivity, the creation of a surplus and its mobilisation, and the ability to export a part of the production are all complementary aspects of rural economic growth."

Tarlok Singh, Planning commission, in an article **'India's Rural Economy and its Institutoinal Framework—A Reexamination.'**

(জাতীয় আয় কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে মাথাপিছু আয় ধরা হইয়াছিল ২৫৩'৯ টাকা। সঞ্চয়ের পরিমাণ ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে)।

সারা ভারতের জন্য (গ্রামাঞ্চল ও শহর মিলিয়া) হিসাব করিলে খাদ্যের জন্য পরিবারের গড় আয় হইল ৬৬'৩%, কাপড়জামার জন্য ৯'৭% এবং

ব্যয় কাঠামো

অবশিষ্ট ২৭% অন্যান্য বিষয়ের জন্য ব্যয়। শিক্ষা সংবাদপত্র এবং বই-এর জন্য ব্যয় বৎসরে মাথাপিছু ১'৬ টাকা; স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য বৎসরে মাথাপিছু ২'৮ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষা স্বাস্থ্য মিলিয়া মোট ব্যয়ের ২%-এর একটু বেশি। আলো ও জ্বালানির জন্য ৩'২৫%, পূজাপার্বণ প্রভৃতিতে ৭'২১% এবং সকল প্রকার আরামের জন্য মোট ব্যয়ের এক-অষ্টমাংশ।

জাতীয় নমুনা জরিপকার্যের দ্বিতীয় ধাপের (Second round) হিসাবে (১৯৫০ মে হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাস) দেখা যায়, পরিবার-প্রতি গ্রাম্য

মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ

বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ২৭'৭৪ টাকা। ইহার অর্ধেক ব্যয় হয় বাড়ি, কূপ, পুকুর, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ-কার্যে এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমির উন্নয়নের জন্য। গ্রামাঞ্চলে বাৎসরিক মূলধন-গঠনের (annual capital formation in the rural areas) পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৬৬ কোটি টাকা।

জাতীয় নমুনা জরিপ কার্যের তৃতীয় ধাপের (Third round) হিসাবে দেখা (১৯৫১ সালের আগষ্ট—নভেম্বর মাসে) গ্রামাঞ্চলে মাথা পিছু মাসিক ভোগব্যয়ের পরিমাণ হইল ২৪'২২ টাকা (ছোট সহরে ইহা ছিল ৩১' ৫ টাকা; কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীর গড় হইল ৫৪'৮২ টাকা। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীর গড় হইল ৫৪'০২ টাকা। সারা ভারতের মোট হিসাব ছিল ২৫'৭০ টাকা। দেখা যায় যে, বড় সহরে মাথা-পিছু ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় দ্বিগুণেরও কিছু বেশী)। গ্রামাঞ্চলের মোট ভোগব্যয়ের ৪৩% দ্রব্য পাওয়া যায় কার্যের হিসাবে আর ৫৭% নগদ টাকায় কেনা হয়।

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে বা নিজস্ব গতিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে কি পরিবর্তন আসিতেছে তাহা বিশ্বভারতীর কৃষি-অর্থনীতি গবেষণাকেন্দ্রের রিপোর্টে সীমাবদ্ধভাবে কিছুটা জানা যায়। উহা হইতে উন্নয়ন কার্যের ফলাফল এবং গ্রামীণ কাঠামোতে

কতখানি ও কোনদিকে রূপান্তর আসিতেছে তাহা কিছুটা বুঝিতে পারা যায়। কর্মনিয়োগ ও জীবিকার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার একটি গ্রামে কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে বেকারির পরিমাণ ৪৬·৩। দেখা যায় যে, এক পুরুষের মধ্যে চাষীর সংখ্যা কমিয়া ক্ষেত মজুরের ও ভাগচাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই কম, পশ্চিম বাংলার তিনটি গ্রামে জমিসম্পন্ন পরিবারগুলির মধ্যে ০·১ হইলে ৩ একরের মালিকানাবিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা হইল শতকরা ৮০·১৫, ৭৬·১৪ এবং ৫১·০ পূর্বাঞ্চলে গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রত্যেক চাষী পরিবারই ঋণগ্রস্ত। পশ্চিম বাংলার জরিপকৃত তিনটি গ্রামে ঋণের বোঝা পরিবার প্রতি শতকরা ৪৮, ৫৬ ও ৬৬ টাকা। গড়ে ঋণের ৩৮% উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গৃহীত, বাকী পরিমাণ খোরাক, পোষাক, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদির জন্য। অর্থাৎ ঋণের শতকরা ৬২ ভাগই অনুৎপাদক কার্যে অর্থাৎ ভোগের উদ্দেশ্যে।

কর্মনিয়োগ, আয়, ব্যয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

পূর্বাঞ্চলের জরিপকৃত ১১টি গ্রামের গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১৮০ টাকার নীচে, আর ব্যয় মাথাপিছু ১৯৩ টাকা। ব্যয়ের কাঠামোর বিস্তৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় ১১টি গ্রামের গড়ে শতকরা ৭৮ ভাগ ব্যয়ই খাদ্য সংগ্রহের জন্য এবং মাত্র ২২ ভাগ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য। শতকরা ৭৮ ভাগ খাদ্যের মধ্যে অধিকাংশই চাল, গম অর্থাৎ খাদ্যশস্যের জন্য; মোট ব্যয়ের ৫১%-ই খাদ্যশস্যের(cereals) জন্য ব্যয়।

সমগ্রভাবে ভূমিসংস্কারের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্রামবাসীর উদাসীনতা খুবই বেশি, রিপোর্টে এইরূপ বলা হইয়াছে। গ্রামবাসীদের মতে ভূমি-সংক্রান্ত আইনে ভাগচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ভূস্বামীদের মধ্যে ঘন ঘন ভাগচাষী পরিবর্তন করা এবং নিজে চাষ করার নামে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করার পরিমাণ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। জোতের উর্ধ-সীমা সংক্রান্ত আইন বিশেষ কার্যকরী হয় নাই, কোন কোন গ্রামে মোট জমির শতকরা ৩০ ভাগ বেনামী হস্তান্তরিত হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন এলাকার কোন কোন গ্রামে জীবনযাত্রার মান আয়-ব্যয়, ফসলের ধরণে পরিবর্তন আসিয়াছে। তবে সেখানে পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবে দুইটি প্রধান শক্তি কাজ করিয়াছে (ক) সামাজিকভাবে একবর্ণ ভিত্তিক ঐক্য (অর্থাৎ গ্রামে

ভূমিসংস্কারের ফলাফল

প্রধানতঃ একবর্ণের অধিবাসীই বসবাস করেন, এবং (খ) শ্রেণীভিত্তিক ঐক্য (অর্থাৎ গ্রামে জমির মালিকানা প্রায় সমপরিমাণে বিভক্ত)। এইরূপ গ্রামের সংখ্যা খুবই কম। অন্যান্য গ্রামে বিভিন্নপ্রকার সরকারী উন্নয়ন কার্যের সুবিধা তাহারাই পাইয়াছে যাহারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে উচ্চশ্রেণীর। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "গ্রামজীবনে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি এমন পরিবর্তন আনিতে হয় যে সেই পরিবর্তন ধারণ করা এবং উহা আগাইয়া লওয়ার শক্তি গ্রামের ভিতরেই সৃষ্টি হইবে, তবে সেক্ষেত্রে গোড়ার কথা হইল মানুষ; এবং গ্রামাঞ্চলে এই মানুষ কঠোর বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্যের কাঠামোতে আবদ্ধ। এই কাঠামো উত্তীর্ণ হইয়া কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা শক্তভাবে শিকড় বসাইতে পারে নাই। সমবায় চাষের ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা যতক্ষণ না গ্রামের শিকড়ে প্রবিষ্ট হইতেছে ততক্ষণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন অসম্ভব।"

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

জমি ও জল : জলসেচের অর্থনীতি

Land & Water : Economics of Irrigation

চাষের জমির পরিমাণ

ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে ৭২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই জমি ব্যবহারের নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে—

	কিরূপ অবস্থায় আছে	একর (কোটির হিসাবে)
১।	বন	১০'৩৩
২।	নীট কর্ষিত জমি	৩১'৫০
৩।	বর্তমানে অনাবাদী জমি	২'৮০
৪।	চাষযোগ্য অপচয় (পুরাতন অনাবাদী)	২'৯০
৫।	কৃষিকার্যে পাওয়া যাইবে না (ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, নদীনালা প্রভৃতি	১'২২
৬।	অকর্ষিত জমি (অপচয় বাদে)	৯'৫০
৭।	অন্যান্য	১৩'৯৫
		৭১'২০

কতখানি জমি এখনই পাওয়া যাইতে পারে

উপরের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর বর্তমানে অনাবাদী পড়িয়া আছে। সুতরাং এই সকল জমিতে চাষের প্রসার ঘটানো সম্ভব। ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর চাষ-যোগ্য অপচয়ের মধ্যে একটু চেষ্টা করিলে ১ কোটি একর জমিতে লাভজনক কৃষি সুরু করা চলে। যে সকল জমির হিসাব পাওয়া যায় নাই, অথবা উন্নয়ন করা খুবই ব্যয়সাধ্য, তাহাদের বাদ দিলেও এই তিন কোটি ৮০ লক্ষ একরে চাষ সুরু করা চলে। যে সকল কারণে এই পরিমাণ জমি পতিত রহিয়াছে তাহা দূর করা দরকার, অর্থাৎ

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের সুবন্দোবস্ত এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ান—এই সকল কাজই প্রধান।

জমি ব্যবহার পুরানো ও নূতন প্রভাবসমূহ

দেশে শিল্পপ্রসার বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত অগ্রসর হইতে থাকে জমি ব্যবহারের ধরণ (Pattern of land utilisation) তত বদলাইতে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিতেছে। বন কমিয়া আসিতেছে, নীট কর্ষিত জমি বাড়িতেছে, বর্তমানে অনাবাদী জমি কমিয়া আসিতেছে। চাষযোগ্য অপচয় কমিয়া আসিতেছে, কৃষিকার্যে পাওয়া যাইবে না এরূপ জমির দরকার বাড়িতেছে অকর্ষিত জমির পরিমাণ কমিতেছে। জমি ব্যবহারের ধরণের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবও বিশেষ লক্ষ্যনীয়। এতদিন ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি শিল্পের অনুন্নতি এবং মুনাফাহীন কৃষিকার্য এই তিন প্রভাবেই জমি ব্যবহারের ধরণ নিরূপিত হইয়া আসিয়াছে।

জলসেচ

উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। আবাদী জমি হইতে অধিক ফসল ফলাইবার জন্য এবং অনাবাদী চাষযোগ্য জমিকে আবাদযোগ্য করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ভারতে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ডাঃ ভোয়েলকার বলিয়াছেন "ইংলণ্ডের জমির প্রকৃতি যেমন আর্দ্রতা, ভারতের জমির প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত, ইহার হইল অত্যন্ত শুষ্কতা।" তাহা ছাড়া, বর্ষার বারিপাত বিভিন্ন অঞ্চলে সমান নয়। বৃষ্টিপাতের এই অসমতার ভিত্তিতে আমরা ভারতকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি : (ক) 'বৃষ্টিহীন অঞ্চল', যেমন সিন্ধু, রাজপুতানা, পাঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ। এই অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। (খ) 'অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল' যেমন বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও যুক্তপ্রদেশ। এই সকল অঞ্চলেও সেচ ব্যবস্থা একান্ত দরকার, (গ) 'নিশ্চিত বারিপাত অঞ্চল' যেমন বাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল। এই সকল অঞ্চলে অনেক সময় বারিপাতের আধিক্য দেখা যায়, ফলে সুষ্ঠুভাবে জল ব্যবহারের জন্য (নিকাশ ও প্রবেশ উভয়ের জন্যই) খাল খননের দরকার। শীতকালীন শস্য (রবিশস্য) বর্ষার জল পায় না, অতএব কৃত্রিম উপায়ে জল সেচ দরকার। জলপথ বিস্তার করিলে পরিবহনের কাজও অগ্রসর হয়। অর্থনৈতিক

উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কৃষির প্রসারের জন্য ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার; ট্রেভেলিয়ান ঠিকই বলিয়াছিলেন "এখানে জল জমি অপেক্ষাও মূল্যবান।"

বিভিন্ন প্রকার সেচ ব্যবস্থা

(Types of Irrigation Works in India)—

ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত চারি প্রকারের সেচ প্রণালী প্রচলিত আছে :— (ক) পুষ্করিণী, (খ) কূপ, ও (গ) নলকূপ, (ঘ) খাল দ্বারা সেচ ব্যবস্থা।

(ক) **পুষ্করিণী :** ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে পুষ্করিণীর সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ নদীর বক্ষে বাঁধ দিয়া এই সকল জলভাণ্ডার বা পুষ্করিণী (storage works) সৃষ্টি করা হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে নদীগুলি বর্ষার পর শুষ্ক হইয়া যায় সেজন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের উত্তর অঞ্চল ছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে জল সেচের জন্য পুষ্করিণী আছে। মাদ্রাজে পুষ্করিণীর সংখ্যাই সর্বাধিক। প্রায় ৪০,০০০ পুষ্করিণী মাদ্রাজ ও অন্ধ্ররাজ্যে বর্তমান।

(খ) **কূপ :** সাধারণতঃ কূপ হইতে মানুষের বা বলদের সাহায্যে জল উত্তোলন করা হয়। নালার সাহায্যে এই জল ক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়। বিদ্যুৎ-চালিত নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে প্রচলিত হইয়াছে। এ প্রথার সম্ভাব্যতা প্রচুর। কূপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, পাঞ্জাব, বোম্বাইতে প্রচলিত। কূপ দুই প্রকারের, অস্থায়ী (যেগুলি ২।১ বৎসর ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত হয়) এবং স্থায়ী।

(গ) **নলকূপ :** ভারতে নলকূপের সংখ্যা ২৫ লক্ষ এবং কূপের সাহায্যে কর্ষিত জমির শতকরা ছয় ভাগ সেচের জল পাইয়া থাকে। বেশীর ভাগ কূপই বেসরকারী সাহায্যে খনিত হয় এবং তজ্জন্য কৃষককে 'তাকাবি' ঋণ দেওয়া হয় টেকনিক্যাল বোর্ডের পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা হয়। আরও ৫৮১টি নূতন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নলকূপ খননের জন্য ২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; যাহাতে ১ লক্ষ ১৬ হাজার জমিতে জল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ—এই তিনপ্রকার মিলাইয়া পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা (Minor Irrigation Works) নাম দেওয়া

হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহারা মিলিয়া নূতন ১ কোটি একর জমিতে জলসেচ করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহাদের সাহায্যে আরও ৯০ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত হইবে আশা করা যাইতেছে।

(গ) **খাল :** খালই সেচের প্রধান উপায়। সাধারণতঃ, সরকারী অর্থে সেচের খাল কাটা হয়। সেচের খাল তিন প্রকারের :—(১) নিত্যবহ খাল (Perennial Canal) ; (২) প্লাবন খাল (Inundation Canal) ; সঞ্চিত জলভাণ্ডার খাল (Storage Canal)। 'নিত্যবহ খাল'গুলিতে বারমাস জল থাকে। ভারতের নিত্যবহ খালগুলিই প্রধান, যেমন সারদা খাল, স্কুর বাঁধ প্রভৃতি। 'প্লাবন' খালগুলির তলদেশ যে নদী হইতে উহারা জলসরবরাহ পায় তাহার জলস্তর (water level) হইতে উচ্চ হওয়ায়, বর্ষা বা অন্য কোন কারণে উক্ত নদীর জল স্ফীত হইয়া উঠিলে তবেই সেই খালে জল প্রবেশ করিতে পারে, নচেৎ তাহারা শুষ্ক পড়িয়া থাকে। কেবল বর্ষাকালেই এই সকল খাল কাযকরী হয়, শীত ও গ্রীষ্মে উহারা জলবিহীন থাকে। উপত্যকার মধ্যে বাঁধ দিয়া 'সঞ্চিত খালের জলভাণ্ডার' সৃষ্টি হয়। নালা বা খাল কাটিয়া ঐ জল ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

খালগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, মুখ্য (major) ও ক্ষুদ্র (minor)। মুখ্য খালগুলি দুই প্রকারের, (ক) 'উৎপাদনশীল' (productive) ও (খ) 'দুর্ভিক্ষ প্রতিষেধক' (protective)। যে খালগুলি নির্মাণ-কার্যের দশ বৎসরের মধ্যে পরিচালন-ব্যয় ও নিয়োজিত মূলধনের সুদ অর্জন করিতে পারে তাহাদিগকে 'উৎপাদনশীল' খাল বলে। আর যে খালগুলি দুর্ভিক্ষ প্রতিষেধকের জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং যাহাদের নির্মাণের ব্যয় চলতি (Current) রাজস্ব হইতে বা Famine Insurance Grant লইতে দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বলে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিষেধক' খাল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্মিত খাল আর্থিক দিক হইতে লাভজনক হয় নাই।

জলসেচ সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণা ছিল পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ বা খাল খনন, কিন্তু ইহাতে জলশক্তিকে মাত্র একধরণের কার্যেই ব্যবহার করা যাইত। অথচ জলের সাহায্যে শুধুমাত্র জলসেচ ব্যতীত আরও বহু-প্রকার কাজ করা যায়। এক একটি নদীর দুইধারের অঞ্চলসমূহের সকল

অর্থনৈতিক কাজকর্ম কি ভাবে জলের সাহায্যে করা যায়, অর্থাৎ জলশক্তির সাহায্যে কি ভাবে বহুপ্রকার লাভ করা যায়, আধুনিক কালে উহা লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে। একটি উদ্দেশ্যের স্থলে বহু উদ্দেশ্যে নদীর জল ব্যবহারের প্রচেষ্টা হইতেছে—বন্যারোধ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মাল ও যাত্রী চলাচল, বিদ্যুৎ হইতে শিল্পোন্নয়ন, মৎস্য চাষ—সকল উদ্দেশ্যে মিলাইয়া একটি পরিকল্পনার মাধ্যমেই বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন করাকে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনা কমিশন স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই সরকার বহু এইরূপ পরিকল্পনার কার্য সুরু করিয়াছেন—বর্তমানে বহুসংখ্যক এইপ্রকার বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জলসেচের প্রসার
(Progress of Irrigation under the Plans)

দেশ-বিভাগের সময়ে ভারতের অংশে যে পরিমাণ জমি পড়ে, উহার মধ্যে ৪·৮০ কোটি একরে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনা সুরু হওয়ার মধ্যে উহা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫·১৫ কোটি একরে। অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে মোট কর্ষিত জমির ২৭·৫% জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় নূতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণ মোট ১·৫০ কোটি একর বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ ও মাঝারি সেচব্যবস্থা দ্বারা ৬০ লক্ষ (ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ একরে পূর্বে ছোট সেচ ব্যবস্থা ছিল) এবং ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা দ্বারা ১ কোটি একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোট কর্ষিত জমির অনুপাতে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ২০% হইয়া পড়ে।

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব হইতে এবং প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ৭২০ কোটি টাকা ব্যয়ের বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনা

ইহার মধ্যে মোট ৮০ কোটি টাকা পরিকল্পনা সুরুর পূর্বেই ব্যয় হইয়াছিল এবং পরিকল্পনার মধ্যে ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছিল। বাকী ৩০০ কোটি টাকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পূর্বে সুরু করা জলসেচ কার্য চালাইয়া যাওয়া

ছাড়াও নূতন সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩৯০ কোটি টাকার ব্যয় হিসাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই ১৭২ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনাতে বাকী ২১৮ কোটি টাকা লইয়া যাওয়া হইবে। নূতন ১৭২ কোটি টাকা এবং পুরাতন ২০৯ কোটি টাকা—মোট ৩৮১ কোটি টাকা—দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৃহৎ ও মাঝারি সেচকার্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ। সিন্ধু নদীতে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার জন্য আরও ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় মোট ব্যয় বরাদ্দ এখন ৪১৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া ছোটখাট সেচকার্যেও বহু অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে জলসেচ খাতে ব্যয়বরাদ্দও সংশোধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট সকল প্রকার সেচকার্য দ্বারা নূতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণকে ২·১০ কোটি একর বাড়াইবার কথা হইয়াছে। সংশোধিত পরিকল্পনার ফলে এই হিসাবও কিছুটা সংশোধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

সেচ পরিকল্পনার কয়েকটি ত্রুটির কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেচকার্যে ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে উচ্চহারে জল-কর, ভূমি-কর এবং বিদ্যুৎ-কর প্রভৃতি আরোপ করা হইতেছে তাহাতে দেশের অনেক অঞ্চলে চাষীর মনে সেচ সম্পর্কে আশংকা দেখা দিয়াছে। উচ্চহারে বাধ্যতা-মূলক জল-কর আরোপ করিলে চাষী ফসল বাড়াইতে বাধ্য হইবে এই যুক্তি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নহে। জলসেচের ফলে বর্ধিত উৎপন্নের কত অংশ চাষীর হাত হইতে তুলিয়া আনিতে হইবে তাহার সম্পর্কে নির্দিষ্ট নীতি থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, সময় ও পরিমাণমত জল দেওয়া যখন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতেছে না তখন এইরূপ বাধ্যতামূলক কর আরোপ ঠিক কি না তাহাও আলোচ্য বিষয়। আমাদের দেশে বড় বড় সেচব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বিদেশ হইতে লোক আনিতে হয়, দেশে এইরূপ কার্যের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। ভারতের চাষীদের জল দিলেই হইবে না, জলের ব্যবহারও শিখাইতে হইবে; জলের অপচয় না ঘটাইয়া ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে জলের ব্যবহার শেখান দরকার। চাষীরা বৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, বৃষ্টি হইলে জল নিতে চায় না এবং বৃষ্টি না হইলে একসঙ্গে সকল চাষী

সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি

প্রায় এক দুই দিনের মধ্যেই সকল জল তুলিতে চেষ্টা করে।' এই অভ্যাসের পরিবর্তন দরকার।

জলসেচের অর্থনৈতিক প্রভাব ও জলকরের সমস্যা (Economic effects of irrigation project and problems of Irrigation tax)

পূর্বে ইংরাজ আমলে কোন বিশেষ জলসেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা হইতে যে পরিমাণ বেশি ভূমি-রাজস্ব আদায় করা যায়, তাহাই প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাব বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু একটি অঞ্চলের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ও কাজকর্মের উপর সেচব্যবস্থা বা বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্রভাব বহুদুর প্রসারী। অন্যত্র কাজ পাইতেছে না, এইরূপ বহু ব্যক্তির নূতন কর্ম সংস্থান হয়, অর্থোপার্জনের বহু নূতন পথ উন্মুক্ত হয়। দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে; চাষীর, ব্যবসায়ীর, পরিবহন ব্যবস্থার মালিকদের কাজ ও আয় বৃদ্ধি পায়, কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারের আয়তন প্রসারিত হয় এবং বিক্রয় নিশ্চিত হইয়া উঠে। বীজবপন ও ফসল কাটার সময়ে কিছুটা পরিবর্তন আসে। নূতন ধরণের ফসল বোনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ওই অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের আমদানি, রপ্তানি ও বাণিজ্যহারে পরিবর্তন আসে। সেই অঞ্চলের শিল্প ও উৎপাদনীশক্তির প্রসার ঘটে। একটি প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাব হইল জমির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং সেচাঞ্চলের জমিদারি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আয় বৃদ্ধি পাওয়া (জমির বর্ধিত দাম ও বর্ধিত ফসলের ভাগ পাওয়ার ফলে)*।

সেচব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রভাব শুধু সেচেই আবদ্ধ নয়

সেচাঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রভাব বিচার করার সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেচব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সময়ে মোট প্রভাবের মধ্যে তদানীন্তন উৎপাদনের বা কাজকর্মের প্রভাব জড়িত থাকে; সেচব্যবস্থা তৈয়ারি হইয়া যাইবার পরে উহার স্থায়ী প্রভাবগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই মূলতঃ দরকার। তাহা ছাড়া, প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রভাব; স্বল্পকালীন প্রভাব ও দীর্ঘকালীন প্রভাব সকল কিছু পৃথক করিয়া বিচার করা প্রয়োজন।

প্রভাব বিচারে বহু সাবধানতা থাকা দরকার

* আধুনিক কালে গুণক প্রভাবের (Multiplier effect) সাহায্যে আয় ও কর্মসংস্থানের উপর মোট প্রভাব হিসাব করা হয়।

জলসেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট্র কি পরিমাণ (Irrigation charges or water taxes) ধার্য করিবে তাহা নির্ধারণ করার জন্য কোনরূপ মাপকাঠি বা মানদণ্ড দরকার। (ক) পাশের শুষ্ক জমিতে ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণের সহিত জল-সিঞ্চিত জমিতে ব্যয় ও উৎপাদন-পরিমাণের তুলনা করিয়া জলসেচ হইতে লাভ বাহির করা যায়। এইরূপে হিসাব করা বর্ধিত আয়ের কত অংশ রাষ্ট্র তুলিয়া লইবে তাহা সরকারী নীতির উপর নির্ভর করে। (খ) আমেরিকার একটি বিখ্যাত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সেচ ব্যবস্থার ফলে জমির দাম কতখানি বাড়িল সেই হিসাব করিয়া সেচ কর ধার্য করা উচিত।*

জলকর আরোপের মাপকাঠি

(গ) অনেকে বলেন যে, চাষীর কর প্রদান ক্ষমতার (ability to pay) উপর প্রভাবশীল এইরূপ বহু বিষয় একত্রে বিচার করিয়া জলকর ধার্য করা উচিত, বিশেষ করিয়া, সেচ ব্যবস্থাটির যোগ্যতা, জমি ও জলের সঠিক ব্যবহার, কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, বিক্রয় ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, কিছুদিন অন্তর জলকরের হার ও করপ্রদান পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখাও দরকার।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় নীতিকেই গ্রহণ করা ভাল, কারণ জমিতে ব্যয় ও উৎপাদনের সঠিক হিসাব কিছুতেই পাওয়া সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া, জমি ও জলের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থাটির যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে নিদারুণ মতদ্বৈধতা থাকিবে। সুতরাং জলসেচের দরুণ জমির দাম কি দাঁড়াইল, তাহাই উপযুক্ত মানদণ্ড। সেচ ব্যবস্থাটির ফলে জমির উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব কি দাঁড়াইল তাহা জমির দামের সাহায্যেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে অন্যান্য বহু কারণে, বিশেষতঃ জমির ফাট্‌কাদারীর দরুণ জমির দামে বৃদ্ধি ঘটিল কি না, সেই বিচার করিতে ভুল করিলে চলিবে না।

জমির দাম বৃদ্ধিই জলকরের উপযুক্ত মাপকাঠি

*"The farmer's repayment should be fixed at the irrigation value. In addition, the farmer should be able to obtain the land title at unirrigated value, free from speculative increase."—*Report of an Economic Survey of Certain Federal and Private Irrigation Projects* (The Haw and Schmit report P. 99)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জমি ও চাষী : মালিকানাসত্ত্ব

Land and Cultivator : Land Tenure

সামন্ত ভূমিব্যবস্থা কাহাকে বলে (What is feudal Land-Lordism)

সাধারণভাবে বলা চলে, ভারতের ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্র প্রচলিত আছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। প্রথমতঃ, এইরূপ ব্যবস্থায় প্রধানতঃ যাহারা নিজেরা চাষ করে না তাহারা জমির মালিক হয়১।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী সাধারণ কৃষকই সরবরাহ করে এবং জমির মালিক উহা দেয় না। চাষীরাই উৎপাদনের ব্যয় বহন করে, জমির মালিকেরা উৎপাদনকেন্দ্র হইতে অনুপস্থিত থাকে।২

তৃতীয়তঃ, জমির চাষী স্বাধীন মজুর নয়, জমির সঙ্গে আবদ্ধ।৩

---

১ মনে রাখা দরকার, ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থাতেও জমির মালিক চাষী নয়, তাই কেবলমাত্র এইরূপ হইলেই উহা সামন্ত প্রথা নয়। ইহার সহিত আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জড়িত থাকে।

২ জমির মালিক অনেক সময় চাষের কাজ দেখাশোনা করে অথবা উৎপাদনের উপকরণগুলির কিছু কিছু সরবরাহ করিতে পারে। তাহাতেও সামন্ত-প্রথা নাই এমন বলা চলে না। ধনতন্ত্রে চাষীর হাতে জমি ও অন্যান্য উপকরণ থাকে না, তাহারা কারখানার মজুরের মত জমিতে উৎপাদনের কাজে নিজের শ্রম ভাড়া দেয়। সাধারণতঃ সামন্ততন্ত্রে চাষী জমি ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়।

৩ বিভিন্ন উপায়ে চাষী জমির সঙ্গে আবদ্ধ থাকিতে পারে। যেমন, প্রথমতঃ ভূমিদাস-প্রথা (Serfdom)। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুর এক মালিককে ছাড়িয়া অন্য মালিকের কাছে নিজে খুসীমত শ্রমশক্তি ভাড়া খাটাইতে যাইতে পারে। ভূমিদাস প্রথায় কোন ভূমিদাস জমির সহিত আবদ্ধ অর্থাৎ সেই জমির গাছের মতই জমির মালিকের সম্পত্তি। জমি বিক্রয় হইলে ভূমিদাস আপনা-আপনি নূতন মালিকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, জমি ছাড়িয়া পলায়ন করিলে তাহাতে দেশের আইন ভঙ্গ করা হয়। ভূমিদাসের সহিত দাসের পার্থক্য এই যে, দাস চাষের কাজ করিলেও জমির সহিত আবদ্ধ নয়, সে মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহাকে ক্রয়-বিক্রয় বা মারিয়া

চতুর্থতঃ, জমির মালিকানা সকলের জন্য উন্মুক্ত বা অবারিত নহে।৪ রাষ্ট্রকে কোনরূপ কাজ বা অর্থ দিতে হইবে—জমির মালিকানার সহিত এইরূপ সম্পর্ক জড়িত থাকে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রের দাবীর অধীন, ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাধীন৫।

ভারতের বিভিন্ন ভূমিসত্ব ব্যবস্থা (Different Land Tenure Systems of India)

প্রাচীনকালে ভারতের ভূমিসত্ব ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। সকল সূত্র মিলাইয়া দেখা যায় যে, সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতেই জমির চূড়ান্ত মালিকানা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে চাষী উহা ব্যবহার করিলেও পঞ্চায়েতকে কর দিতে হইত। অবশ্য শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য এবং সেচব্যবস্থার জন্য রাজাকে চাষী বা পঞ্চায়েত ফসলের কিছু অংশ দিত। গ্রাম-পঞ্চায়েতের মালিকানা, ব্যক্তিগত চাষ

প্রাচীন ভারত

ফেলাও চলে (অ্যারিষ্টটলের ভাষায় ক্রীতদাসেরা উৎপাদনের সবাক যন্ত্র বা Intrumentum Vocum), কিন্তু ভূমিদাসকে মারিয়া ফেলিলে দেশের আইন বিরুদ্ধ কাজ করা হয়, তাহাকে জমির সহিত বিক্রয় করা চলে। ভূমিদাস-প্রথা থাকিলে উহা সামন্ততন্ত্রের ক্লাসিকাল রূপ, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বোঝা সামন্ততন্ত্রের উপর চাপিয়া এই ক্লাসিকাল সামন্ততান্ত্রিক রূপকে কিছুটা পরিবর্তন করিতে পারে। যেমন, কোন কৃষক মালিক-চাষী (Peasant proprietor) বা স্বেচ্ছা-চাষী (tenant-at-will) হইতে পারে, কিন্তু যদি (প্রথা বা শিল্পে অনগ্রসরতার দরুণ) জমিদার তাহাকে বিনা দামে খাটাইতে পারে, তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোনরূপ হ্রাস করিতে পারে, তবে উহা কিছুটা পরিবর্তিত হইলেও সামন্ততন্ত্র।

৪ ইহার অর্থ হইল প্রথমতঃ জমির মালিক হইলে রাষ্ট্রকে কিছুটা কর দিতে হয়। কোন ব্যবসায়ী যন্ত্রের মালিক হইলেই রাষ্ট্রকে সেইজন্য কোন কর দিতে হয় না। উহা হইতে উৎপাদন করিয়া আয় বা মুনাফা করিলে আয়কর বা অন্যান্য কর দিতে হইতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের মালিকানার দরুণ সেই কর নয়।

৫নীচের দুইটি উদ্ধৃতি হইতে ইহাদের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে :

"After the restoration of the Stuarts, the landed proprietors carried, by legal means an act of usurpation, effective everywhere on the continent without any legal formality. They abolished the feudal tenure of land i.e. they got rid of all its obligations to the state... vidicated for themselves the rights of modern private property in estates to which they had only a feudal title"...*Marx*, **Capital Vol 1.**

"On the Contrary in America, it was not slave economy of the big landlords that served the basis of capitalist agriculture (the civil war crushed the slave estates), but the free economy of the free farmer working on free land, land free from all medieval fetters, free from serfdom and feudalism, on the one hand, and free from the fetters of private property in land, on the other. Land was given away in America out of an enormous land fund, at a nominal price, and it is only on a new, completely capitalist base that private property in land has now developed there. *Lenin*, **works. vol I.**

এবং রাজার প্রাপ্য অংশ সকল কিছু মিলিয়া প্রাচীন ভারতের ভূমি ব্যবস্থা গঠিত ছিল।৬

গুপ্তযুগ

গুপ্তযুগে এবং তাহার পরবর্তীকালে ঠিক ইউরোপীয় ধরণের না হইলেও সামন্ততন্ত্রের ন্যায় ভূমিব্যবস্থা এদেশে গড়িয়া উঠিতে সুরু করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ বা স্থানীয় শান্তিরক্ষক রাজার অধিকারের কিছু অংশ নিজেরা ভোগ করিতে সুরু করিল, কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে তাহারা কিছু কিছু রাজস্ব দিতে আরম্ভ করিল। নীচের তলায় গ্রাম-পঞ্চায়েত থাকিলেও দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ইহার বিলোপ সুরু হইয়া গিয়াছিল।

মুসলমান যুগ

মুসলমান যুগে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতেছিল এবং ফলে গ্রামাঞ্চলে দ্রব্যবিনিময় (Barter) প্রথা দূর হইয়া ক্রমশঃ অর্থভিত্তিক বিনিময় প্রসার লাভ করিতেছিল। ফসলের ভিত্তিতে খাজনার বদলে অর্থের ভিত্তিতে খাজনা লওয়া এই সময়েই সুরু হইয়াছিল। রাজকর্মচারীগণ সরকারী কার্যের বদলে জমিদারী বা জায়গীরদারী পাইতেছিলেন, এইরূপে প্রায় নূতন এক জমিদারশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষকের চাষ-স্বত্ব (occupancy right of the tenant cultivator) বিলুপ্ত হইল না। জমিদারেরাই চাষীর নিকট হইতে খাজনা আদায় করিত, নিজের অধীনস্থ উপজমিদারশ্রেণীর উপর আদায়ের ভার দিত। এইরূপে কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইংরাজ যুগ

ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া নবাবদের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভার চাহিয়া লইল এবং তাহার পর হইতে তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারী নীলামের সাহায্যে সর্বোচ্চ দামে বিক্রয় করা সুরু করিল। এই নূতন জমিদারশ্রেণীর সহিত জমির সম্পর্ক ছিল কম, চাষীদের নিকট হইতে যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব ধনী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে এই সময়ে জমিতে ধনতান্ত্রিক প্রসার সুরু হইয়া গিয়াছে, জমির উপর রাজার বা রাষ্ট্রের সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের যুগ শেষ হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের

৬বেডেনপাওয়েল, শ্রীরাধাকুমুদ মুখার্জি প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বৈদিক যুগেও জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং চাষী-মালিকানা ছিল।

কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ না ঘটাইয়া সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শোষণব্যবস্থা কায়েম করিয়া সেই লুণ্ঠিত অর্থে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিল।৭

এই নূতন জমিদারশ্রেণীর ভয়াবহ শোষণের প্রত্যক্ষ ফল হইল ১৭৭০ সালের বাংলায় মন্বন্তর ; ১৭৮৪, ১৭৮৭ এবং ১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষ।৮

কৃষিতে এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার হাত এড়াইবার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারদের সহিত রাষ্ট্রের বন্দোবস্ত হইল এবং খাজনা নির্দিষ্ট রহিল। চাষীর নিকট হইতে জমিদার কি পরিমাণ খাজনা আদায় করিবে, তাহার প্রতি রাষ্ট্রের লক্ষ্য না থাকায় জমিদারের আয়ের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিল, প্রজারা শোষিত হইতে লাগিল, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব একেবারে নির্দিষ্ট রহিয়া গেল।

ইহা ছাড়া ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইল। ফলে ১৭৯৩ সালে যেখানে প্রজার নিকট জমিদারগণের

---

৭ "Like the Mughals before them, and the Guptas and Mauryas before the Mughals, the British insisted on the right of the imperial power to the first share of the fruits of the soil. But this type of a claim was already centuries out of date in England itself, and belongs properly to a stage of economic development where there is in effect, no other principal source of state revenue······To no holder was granted the exclusive right to occupy, enjoy, and dispose of land which, in practice, is the hallmark of western private ownership. Without this quality of exclusiveness, real private property cannot be said to exist."

Daniel Thorner—**The Agrarian Prospect of India**, P. 7.

৮ কিরূপ চাপ দিয়া জমিদার ও চাষীদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত তাহা Burke-এর বক্তৃতা হইতে পাওয়া যায়।

"The peasants were left with little else than their families and bodies. The families were disposed of. It is a known observation that those who have the fewest of all other worldly enjoyments are the most tenderly attatched to their children and wives. The most tender parents sold their children at markets. The most fondly jealous husbands sold their wives. The tyranny of Mr. Hastings extinguished every sentiment of father, son. brother and husband. I come now to the last stage of their miseries ; everything, visible and vendible was seized and sold. Nothing but the bodies remained."

—Quoted in '**Indian Land System and Land Reforms**' by **Bhowani Sen** from Appendix of '*Maharaj Nand Kumar*' by *Chandi Charan Sen*.

খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা মাত্র, উহা ১৬ কোটি টাকায় পরিণত হইল, কিন্তু জমিদারগণের নিকট সরকারের যে তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল তাহা মাত্র ৪ কোটি টাকার উর্ধে আর বৃদ্ধি পাইল না। ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে পরিচিত।

এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদার নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে অপারগ হইলে 'সূর্যাস্ত আইন' অনুসারে জমিদারী নিলামে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া লওয়া হইত। এই বন্দোবস্তের সময় প্রজার অনুকূলে কোন রক্ষাকবচের (যেমন খাজনার নির্দিষ্ট হার, 'জমিতে সত্ব', প্রজা উচ্ছেদ নিবারণ প্রভৃতি) ব্যবস্থা ছিল না। কেবল এই সকল বিষয়ে সরকারের আইন করিবার অধিকার ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণামত পরবর্তীকালে রায়তের মঙ্গলের জন্য ভূমিসত্ত্ববিষয়ক বহু আইন পাশ হইয়াছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী ভূমিসত্ত্ব নির্ধারণে নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল :—(১) আর্থিক উদ্দেশ্য। তাঁহার ধারণা ছিল ইহার ফলে দেশে সম্পদ ও প্রাচুর্যের বৃদ্ধি হইবে। রাজস্ব চিরস্থায়ী হইলে উহা আদায় করাও সহজ হইবে। (২) সামাজিক উদ্দেশ্য। জমিদার শ্রেণীর সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৃদ্ধি হইবে বলিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন। (৩) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বঙ্গীয় জমিদার শ্রেণী সরকারের বশ্য ও রাজভক্ত হইবে।

বৃহৎ বঙ্গে, মাদ্রাজের কতকাংশে ও বেনারসীর নিকটবর্তী কয়েকটি জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হয়। অন্যান্য প্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে এই প্রকার বন্দোবস্ত স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গিয়াছে, যে, উহাতে রাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে যথেষ্ট লোকসান হইতেছে। সেজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তনীতি পরিত্যক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণতঃ জমিদারগণের সহিত সম্পাদিত হইত বলিয়া উহাকে জমিদারী বন্দোবস্তও বলা হইত। অস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে, সরকার যখন নির্দিষ্টকালের জন্য জমি বা বন কোন জোতদারের সহিত বন্দোবস্ত করে তখন তাহাকেও জমিদারী বন্দোবস্ত বলা হয়।

অস্থায়ী বন্দোবস্ত চারি প্রকারের—রায়তওয়ারী, মহলওয়ারী, মালগুজারী ও অস্থায়ী জমিদারী। নিম্নে বিভিন্নপ্রকার ভূমি বন্দোবস্তকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল :

অস্থায়ী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত অস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির মালিকের দেয় রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট নহে। অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে কোথাও ১০ বৎসর, কোথাও ২০ বৎসর, কোথাও ৩০ বৎসর, এবং কোথাও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় অন্তর ভূমি রাজস্বের হার পুনর্নির্দিষ্ট হয়। ফসলের বাজারদাম বৃদ্ধি, সেচ ব্যবস্থার দরুণ ভূমির উর্বরাশক্তির বৃদ্ধি, জমির পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির খাজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে, এবং মালিকদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে নিষ্পন্ন হয়।

(১) **রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত**—যেখানে সরকার রায়ত বা কৃষকদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে খাজনা নির্দিষ্ট করে তাহাকে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত বলে। এই ব্যবস্থায় রায়ত ও সরকারের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী নাই। রায়তেরা সরাসরি সরকারকে খাজনা দেয়। এই প্রকার বন্দোবস্ত—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বেরার ও আসামের একাংশে প্রচলিত ছিল। প্রতি ১০, ২০ বা ৩০ বৎসর অন্তর ভূমি রাজস্বের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। "জমির উন্নতি নীতি" (development principle) অনুসারে নূতন অঞ্চলে শীঘ্র শীঘ্র ও পুরাতন অঞ্চলে বিলম্বে রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, কারণ কৃষকের রাজস্ব বৃদ্ধির হার হঠাৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে উহা বহন করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় চাষের খরচ বাদে কৃষকের যে নীট মুনাফা থাকে তাহার অর্ধেক (শতকরা ৫০ ভাগ) সরকারকে খাজনা হিসাবে দিতে হয়।

(২) **মহালওয়ারী বন্দোবস্ত**—এই প্রথা পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে রায়তের সহিত ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত হয় না। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত একটি অঞ্চলের সহিত বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু প্রত্যেক কৃষক রাজস্বের জন্য সরকারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে দায়ী থাকে। সাধারণতঃ, 'লম্বরদার' নামক গ্রামের মাতব্বরের মারফৎ রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত হয়।

(৩) **মালগুজারী বন্দোবস্ত**—সরকারী কর্মচারী গ্রামের জমি জরিপ করিয়া (রায়তী প্রথা অনুসারে) সরকারকে দেয় রায়তেরা খাজনা স্থির

করে। মালগুজাররা সেই খাজনা আদায় করিয়া সরকারের নিকট দাখিল করে। আদায়ী রাজস্বের উপর তাহারা কমিশন পায়। মারাঠা রাজত্বের সময় ইহাদের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এই প্রথা জমিদারী প্রথার অনুরূপ। কিন্তু রায়তদের রাজস্বের পরিমাণ সরকার ঠিক করিয়া দেওয়ায় ইহা প্রকৃতপক্ষে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রথা মধ্যপ্রদেশেও প্রচলিত ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা—অনেকের মতে তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতকগুলি সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, অস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিবার ভূমি-রাজস্ব নির্ণয়ে যে ব্যয় ও হায়রানি হয় তাহা ইহাতে নাই, এবং খাজনা বৃদ্ধি এড়াইবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জমিতে 'চিরস্থায়ী স্বত্ব' পাইলে 'ধূলামাটি স্বর্ণে পরিণত হয়'। কোন কোন বদান্য জমিদারের চেষ্টায় বন হাঁসিল, বাঁধ নির্মাণ, চলাচল ব্যবস্থা প্রভৃতি কৃষি-উন্নতিমূলক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, এই বন্দোবস্তের ফলে তৎকালীন সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব পাইবার পূর্ণ আশ্বাস পাইয়াছিল। চতুর্থতঃ, ইহা জমিদার ও প্রজার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্টতম হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণী, স্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিমান মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং শক্তিমান কৃষকশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে এই জমিদার ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর দান অসামান্য। ষষ্ঠতঃ, জমিদারশ্রেণীর রাজভক্তির উপর সরকার নির্ভর করিতে পারিয়াছিল। সিপাহী যুদ্ধের কালে সরকার ইহাদের নিকট হইতে প্রভূত উপকার পাইয়াছিল। সপ্তমতঃ, দেশের নেতৃত্ব গ্রহণে জমিদারশ্রেণী পরাঙ্মুখ হয় নাই। স্কুল-কলেজ-টোল স্থাপন, হাঁসপাতাল নির্মাণ, শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে, এমন কি দেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারেও বহু জমিদারকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ—কিন্তু এই ব্যবস্থার দোষের অন্ত ছিল না।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বড় বড় জমিদারগণ কর্তৃক বৃহদায়তন কৃষির যে কল্পনা করা হইয়াছিল তাহা আদৌ বাস্তবে পরিণত হয় নাই। জমি বেশি থাকিলেই কৃষিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসার হয় না। শিল্পে ধনতন্ত্রের প্রসারই কৃষিতে যন্ত্র ও মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

(২) সরকার এই বন্দোবস্তের ফলে বিশেষভাবে আর্থিক হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১৭৯৩ সাল হইতে অদ্যাবধি রাজস্ব আদায় তিনকোটি ৬০ লক্ষ টাকা হইতে মাত্র ৪ কোটিতে পৌঁছিয়াছে, যেখানে জমিদারগণের আয় ৪ কোটি হইতে ১৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। জমিদারেরা ১২ কোটি টাকা অনুপার্জিত মুনাফা (unearned increment) ভোগ করিয়াছে। ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সমস্ত সুবিধা জমিদারগণই ভোগ করিয়াছে। (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার মঙ্গলের কথা আদৌ চিন্তা করা হয় নাই। (৪) জমিদারী প্রথাই বাংলার শিল্প ও ব্যবসায়ে পশ্চাৎপদ থাকিবার কারণ। উদ্যমী পুরুষেরা কিছুকাল ব্যবসা প্রভৃতি ঝুঁকির কাজে টাকা উপার্জন কমিবার পর জমিদারী ক্রয় করিয়া নিরুদ্বেগ জীবনযাপনে প্রলুব্ধ হইত। (৫) জমিদারগণ প্রবাসী জীবনযাপনে প্রলুব্ধ হইত। (৫) ফলে প্রজাগণের সহিত তাহাদের কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক জন্মায় নাই। (৬) জমিদারী প্রথার ফলে বহু প্রকার মধ্যস্বত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, কোন কোন স্থলে সরকার ও কৃষকের মধ্যস্থলে ২০টি স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারী জমি হইতে উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে জমির উন্নতিতে জমিদার কখনও মনোযোগী হইতে পারে নাই। (৭) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ বোম্বাই প্রদেশে যেখানে রায়তওয়ারী প্রথা বর্তমান, সেখানেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব দেখা যায়। (৮) অস্থায়ী বন্দোবস্তে আকাল পড়িলে প্রজা খাজনা হইতে রেহাই পাইলেও পাইতে পারে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সে সুবিধা পায় না।

বর্তমান কৃষিসত্ত্ব কাঠামো এবং উহার প্রকৃতি (Present agrarian tenure structure & its nature)

বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা লইয়া গঠিত ভারতের ভূমিব্যবস্থা বহু বিষয়ের সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ বর্তমানে পিরামিডের আকারে দাঁড়াইয়া আছে।

রাষ্ট্র, মালিক, কিষাণ ও মজদুর

প্রাক্-ব্রিটিশ সামন্ততন্ত্র (যেখানে রাষ্ট্র ফসলের কিছু অংশ দাবী করিত) হইতে সুরু করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে আধুমিকতম ধনতান্ত্রিক ধারণা ইহার মধ্যে মিশিয়া আছে। রাষ্ট্র হইল সর্বোচ্চ-জমিদার (Super-Landlord), উহার নীচে বহু স্তরের চাষীশ্রেণী—নীচের ব্যক্তির তুলনায় উপরের ব্যক্তির হাতে

মালিকানা-সম্পর্কিত দলিলটি একটু বড় বা উঁচু ধরণের—'এই কাঠামোতে ভারতের কৃষিকার্য চলিতেছে। উপরের শ্রেণীর কাজই হইল ঠিক পরবর্তী নীচু শ্রেণীর নিকট হইতে টাকায় বা ফসলের হিসাবে উৎপাদনের কিছু অংশ আদায় করা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাষ্ট্রের নীচে তিন শ্রেণীর লোক লইয়া এই স্বত্বকাঠামো (tenure structure) দাঁড়াইয়া আছে। মালিক, যাহারা প্রধানতঃ চাষের কাজ না করিয়া খাজনা আদায় করে; কিষাণ, যাহারা প্রধানতঃ কোন না কোন স্বত্বের বা দলিলের সাহায্যে নিজেরা জমি চাষ করে বা কিছুটা অন্যকে দিয়া চাষ করাইয়া লয়; এবং কৃষি-মজুর, যাহারা প্রধানতঃ অপরের জমিতে চাষ করে এবং উহার বদলে ফসলের অংশ বা নগদ টাকা পায়

পিরামিডের আকারে গঠিত এই ভূমি ব্যবস্থার মূল কথা হইল উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ যাহারা উৎপাদন করে না এইরূপ লোকের হাতে চলিয়া যায় এবং তাহা জমির বা কৃষি-যন্ত্রপাতি উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয় না। উৎপাদনের কাজে আসে না এইরূপ অনুৎপাদক শ্রেণীর ভরণ পোষণের ভার হইল উৎপাদক শ্রেণীর হাতে। উৎপাদক শ্রেণীর ভূমিসত্ত্ব নীচু স্তরের এবং অনিশ্চিত ধরণের বলিয়া (inferior and insecure property right) জমিতে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কথা তাহারা চিন্তাও করে না এবং তাহার উদ্বৃত্ত অপহরণের পর এইরূপ কোন ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। দেশের বর্ণভেদ প্রথার সঙ্গে জড়িত হইয়া এই ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থা ভারতের সামাজিক পরিবেশে সামন্ত-যুগীয় অনড়তা ও অচলতা আনিয়া দিয়াছে। চাষের কাজ বা কোনরূপ শ্রমের কাজই নিম্নবর্ণের বা নিম্ন জাতির কর্তব্য এই মজ্জাগত ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিপুল বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় সকল শ্রেণীর লক্ষ্যই হইয়াছে শ্রম বা উৎপাদনী কাজ না করিয়া উহা হইতে কতটা দূরে থাকিয়া সামাজিক পদ মর্যাদার সিঁড়ির উপরের কোন্ ধাপে উঠিতে পারা যায়।

এই পিরামিডের অর্থনৈতিক তাৎপর্য

উৎপাদনের কত বিরাট অংশ অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায় তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে কৃষি হইতে মোট ৪৮০০-এর কোটি টাকার জাতীয় আয় সৃষ্টি হইয়াছিল ধরা হয়। খাজনার হার নীট উৎপাদনের ১০% হইতে ৬০% মধ্যে ধরা চলে। মালব্যের মতে খাজনার

উৎপাদক শ্রেণীর হাত হইতে উদ্বৃত্তের অপহরণ

পরিমাণ ৩৩% হইতে ৭৫%-এর মধ্যে৯। চাষীদের খাজনার গড় হার উহাদের নীট আয়ের ২৫% ধরিয়া লইলে, দেশে মোট খাজনার পরিমাণ ছিল বৎসরে ১২০০ কোটি টাকা।১০

এইখানেই হিসাব ক্ষান্ত করিলে চলিবে না। চাষীর নিকট হইতে বে-আইনী বহু রকমের আদায় যে কি পরিমাণ হইতেছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ফসলের অর্ধেক দিয়া ভাগচাষীরা চাষ করে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে, বোম্বাই-এ), নীট উৎপাদনের কত অংশ তাহাতে দেওয়া হইল, কে তাহার হিসাব করিবে? ঠিকা-চাষী ও স্বেচ্ছা-চাষীর নিকট হইতে কতখানি খাজনা এবং বেআইনী আদায় চলে তাহার হিসাব করাও চলে না। মালব্য ইহাকে ১০০ কোটি টাকার বেশি হইবে বলিয়াছেন এবং তাঁহারই মতে "ইহা কমের হিসাব" ("this was an underestimate")। উচ্চ সুদের হারের দ্বারা, গ্রামে মুদি দোকান পাট স্থাপন করিয়া, বন্ধকীর দোকান খুলিয়া ইহারা যে পরিমাণ আদায় করে, তাহা যোগ করিলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা খুব সুখের নিশ্চয়ই বলা চলে না। পরিকল্পনাতে বিনিয়োগ-যোগ্য অর্থাভাবের সম্মুখে যখন বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭% হইতে ১০%-এ উঠান সম্ভব হইতেছে না তখন অনুৎপাদক শ্রেণীই জাতীয় আয়ের ১২% লুট করিতেছে; অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসার কিরূপে ঘটিবে? ইহাই সমাজের প্রধান সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (chief potential economic surplus)। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করিলে তবেই এই উদ্বৃত্ত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বা ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়াইতে পারে। ভূমিসত্ব ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ যাহা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পিছন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে তাই "অনুন্নতির ধারক" বা অগ্রগতির

কিরূপে এই ভূমি ব্যবস্থা উন্নয়নকে ব্যাহত করে

---

৯ *H. D. Malaviya*, **Land reforms in India A. I. C. C. Publications, P, 450**

১০এই হিসাব যে খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা মালব্যের উপরোক্ত বই হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়:

"Professor Brijnarayan calculated that the landlords in the Punjab took as much as 80 per cent of the net produce of the tenant under the batai system of cultivation. In Bombay, the rents ranged between 40 and 60 per cent of the net produce", P 86.

"সংকোচক" (Depressor) বলা হইয়াছে। এই "দমক" বা "সংকোচকের" অপসারণই অর্থনৈতিক প্রসার পরিকল্পনার প্রথম কাজ।[১১]

কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা (The need for Land Reforms)

ভারতের গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বন্ধ করিতে না পারিলে দেশের শিল্প প্রসার কখনই সম্ভব নয়। খাদ্য, কাঁচামাল প্রভৃতির উৎপাদন-ক্ষেত্র এত অনুন্নত রাখিয়া কখনই বিরাট শিল্প কাঠামো গড়িতে পারা যায় না। দেশে শিল্প বিস্তারের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইলে, শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইলে এবং কৃষক ও শ্রমিকের মনে আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অবিলম্বে কৃষি হইতে জমিদারী ও সকল মধ্যসত্ব অপসারণ করা দরকার। এই বিষয়ে জাতি সংঘের একটি কমিটি[১২] বলিয়াছেন যে, দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা "উচ্চ খাজনা বা সুদের হার চাপাইয়া চাষীর জীবন যাত্রার মান কমাইয়া দিতে পারে; অগ্রসর হইবার সুযোগ ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে এবং কোন স্থায়িত্ব (security) না থাকায় বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; ভালভাবে চাষের পক্ষে খুব ছোট বা প্রগাঢভাবে চাষের পক্ষে খুব বড় কৃষিক্ষেত্রগুলি জিয়াইয়া রাখিতে পারে।"

সংস্কার খুবই প্রয়োজন

ভারতে দ্রুত শিল্পপ্রসারের গতি-পথে আমরা একপ্রকার দুষ্ট চক্রের প্রভাব দেখিতে পাই। জাতীয় সঞ্চয় বা মূলধনগঠনের পরিমাণ দ্রুত বাড়ান দরকার, কিন্তু জনসাধারণের হাতে ক্রয় শক্তি না বাড়িলে এইরূপ মূলধন-গঠন সম্ভব হয় না, এবং কৃষিসংস্কার ও শিল্পপ্রসার না ঘটাইলে দেশের ক্রয়শক্তি বাড়িতে পারে না। দেশের চাষীরা ক্রমশ গরীব হইতে থাকিলে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকে; শিল্প প্রসারের প্রথম যুগেও দ্রব্য সামগ্রী অবিক্রীত থাকিয়া এই প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়। যতদিন জমিতে

কৃষি সংস্কারই শিল্পোন্নয়নের প্রধান সর্ত

১১ This complex of legal, economic and social relations uniquely typical of is the Indian countryside served to produce an effect which I should like to call that of a built-in "depressor".
......It is difficult to see how India's current plans for economic development can get very far without a concerted effort to remove the depenessor" *Daniel Thorner*. **The Agrarian Prospect of India.** P. 18.

* Land Reform. Defect in Agrarian Structure as obstacles to Economic Development. U. N. N. 1951. P 5.

ব্যক্তিগত মালিকদের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে এবং ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে ততদিন কৃষির উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না। তাই কৃষি সংস্কারই শিল্প বিস্তারের একমাত্র প্রথম স্তর। বর্তমানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়াছে, কিন্তু দেশের মধ্যে বিক্রয় হইতেছে না। তাই বিদেশে বিক্রয় করার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু অবিক্রীত বিদ্যুৎশক্তি রপ্তানি করা যায় না বলিয়া পড়িয়াই আছে। চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইতেছে না, কারণ আখ উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণ (quality) কমিয়া গিয়াছে। খাদ্য সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে, খাদ্যের আমদানি বৈদেশিক মুদ্রা সংকট বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অসম্পূর্ণ কৃষিবিপ্লব বা কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের অবস্থান দেশের পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে প্রতি পদে বাধা দিতেছে।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ভারত কৃষি বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা মনে রাখা দরকার। একটি উদাহরণ দিলেই ইহা বুঝা যাইবে। আমরা জানি যে, বর্তমান পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হইল নূতন তৈয়ারি ভারি শিল্প হইতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কোথায় যাইতেছে? বলা যায়, আমাদের চল্‌তি প্রয়োজন মিটাইতে উহা ব্যবহৃত হইতেছে, আমদানি করার প্রয়োজন আর নাই। কিন্তু ক্রমে উহাদের উৎপাদন আরও বাড়িবে, এবং সেই সকল ইস্পাত, সিমেণ্ট বা মূল ধাতু ও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনকারী কল কারখানা নিশ্চয় তৈয়ারী করিতে হইবে, অথবা সারাজীবন উহাদের গুদামে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তখন ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে, কিন্তু নূতন তৈয়ারি ভোগ্য দ্রব্যগুলি যাইবে কোথায়? আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করা তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই নিতান্ত দরকার। গ্রামাঞ্চলে ক্রয় শক্তি সৃষ্টি করিতে হইলে আমূল কৃষি বিপ্লব বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভারতে যন্ত্রযুগ সুরু হইতেছে, সেই যন্ত্রই নিজের তাগিদে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া নিজের নিয়োগের পথ খুব শীঘ্রই বাহির করিয়া লইবে, তাই এই কৃষি বিপ্লব আসন্ন। রক্তপাত ও সংঘর্ষ বিনা এই বিপ্লব শেষ হইবে না ইহাও বুঝা যায়, কারণ সরকারের প্রতিটি আইনই জমিদারেরা ফাঁকি দিয়াছে, ভূমি সংস্কার আইনগুলির ফলে গ্রামের

শিল্প প্রসার দরকার, কিন্তু বাজার কই

উৎপাদন সম্পর্কগুলিতে পরিবর্তন আসে নাই বলিলেই চলে[১৩]। প্রশ্ন হইল, এই বিপ্লব কাহাদের নেতৃত্বে হইবে—কৃষিতে কি ধনতন্ত্রের বিকাশ হইবে অথবা সমাজতান্ত্রিক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে? এই প্রশ্নই আজিকার দিনে ভূমিসত্ব সংস্কারের মূল দিকনির্ণয় করিতেছে।

ভূমি সংস্কারের কার্যসূচী ও অগ্রগতি (Programe and Progress of land Reforms in India)

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে ভূমি সংক্রান্ত বহু আইন কানুন রচিত হইয়াছে। বাংলা দেশে ১৮৫৯ সাল হইতেই ইহার সুরু। এই সকল আইনে প্রধানতঃ জমিদারের অত্যাচার হইতে চাষীকে রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রচেষ্টা কোনটাই বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি কেন্দ্রগুলি না ভাঙিলে, জমির উপর একচেটিয়া মালিকানার প্রভাব হ্রাস না করিলে এবং দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিয়া জমির উপর নির্ভরশীলতা না কমাইলে খণ্ড ছিন্ন আইনের দ্বারা প্রজার উপকার করা সম্ভব হয় না।

স্বাধীনতার পূর্বে কৃষি সংস্কার সম্ভব হয় নাই

ভারতীয় কৃষির এই অবস্থা দূর করার জন্য বহুদিন হইতেই জাতীয়তাবাদী নেতারা জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের দাবী করিয়া আসিয়াছিলেন। বাংলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, রাজস্থানের জায়গীরদার, মধ্যপ্রদেশের মালগুজার, পাঞ্জাবের বিশ্বেদার, কাশ্মীরের ইলাকদার, ইহাদের কাহারও কৃষি উৎপাদনের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় যোগ

---

১৩ "Land reform laws ostensibly passed for the benefit of the under-privileged have not basically altered India's village structure. The small minority of oligarchs have had wit and resource enough to get around these laws in which, in any event, the loopholes were so large as to give them ample manoeuvering ground. By passing themselves off, whether legally or illegally, as tillers and cultivators, the village oligarchs have gone on running India's rural life. Their uninterupted presence in power means that the forces of the "depressor" continue to operate strongly in the countryside." *Daniel Thorner*, **The Agrarian Prospect of India.**

ছিল না। ইহারা যে অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষণকারী পরভোজী এবং দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুন্নতির ধারক, ইহাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী। এই কথা বলিয়াই ভারতের দরিদ্র নিরক্ষর চাষীকে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনা সম্ভব হইয়াছিল এবং স্বাধীনতার পরে চাষী জমির মালিক হইবে, মধ্যস্বত্ব লোপ পাইবে, খাজনার হার কমিবে, রাষ্ট্রের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, এই সকল কথা বলা হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পূর্বে কৃষি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি

স্বাধীনতার পরে ভারতে ভূমি সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার প্রধান কার্যসূচীকে এইরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় :

(১) **মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপসাধন** ; এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান। (২) **জমিদার প্রজা ব্যবস্থার সংশোধন** ; এই উদ্দেশ্যে ন্যায্য খাজনা (fair rent) স্থির করা, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি জমিদার নিজে ব্যক্তিগত চাষের জন্য পাইবে সেখানে প্রকৃত চাষীদের স্থায়ী স্বত্ব দিবার ব্যবস্থা করা, যে জমি জমিদারের হাতে রহিল না সেখানে সরাসরি চাষীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং চাষীকে সেইরূপ জমির মালিক করা। (৩) **জমির বণ্টন করা** ; এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ জমির মালিকানা ও বর্তমান জোতের ঊর্ধসীমা নির্দিষ্ট করা (placing ceiling upon future acquisition and existing holding) ; ঊর্ধ-সীমার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত জমিগুলি ভূমিহীন কৃষি-মজুরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে ছোট ছোট জোত-এর (uneconomic small holdings) আয়তন বাড়ান। (৪) **বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জোতগুলিকে একত্র করা** ; যাহাতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা পাওয়া যায় ; এই উদ্দেশ্যে যাহাতে ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ না হয় সেই ব্যবস্থা করা। (৫) **সমবায় চাষ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা** ; এই উদ্দেশ্যে ছোট ছোট জমিখণ্ডগুলি একত্র করিয়া যুক্তভাবে চাষের ব্যবস্থা করা যাহাতে বৃহৎমাত্রায় চাসের ব্যয়সংকোচগুলি পাওয়া যায়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমবায় গ্রাম পরিচালনা গড়িয়া তোলা।

ভূমিসংস্কারের উপরোক্ত কার্যসূচী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতদূর কার্যকরী করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা দরকার। **মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন** সম্পর্কিত আইন প্রায় সকল রাজ্যেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কিছু কিছু অঞ্চল এখনও বাকি আছে। আসামের অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকা এবং মাদ্রাজের ইনাম এলাকাতে (Inam estates) এখনও পর্যন্ত এই সম্পর্কিত কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। রাজস্থানে বেশীর ভাগ অঞ্চলেই জায়গীরদারী, ইহা উচ্ছেদের আইন পাশ হইয়াছে। যে অঞ্চলে জমিদারী ও বিশ্বেদরী ব্যবস্থা সে অঞ্চলে এখন পর্যন্ত আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। উড়িষ্যাতে মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই। এই বিষয়ে রাজ্য-সরকারদের বর্তমানে কাজ হইল এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণের হিসাব করা এবং অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করা, জমির স্বত্বসম্পর্কীয় কাগজপত্র তৈয়ারী করা এবং আদায়ের সংগঠন গড়িয়া তোলা[১৪]।

প্রজাস্বত্ব সংস্কার (tenancy reforms) সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু কাজ করা হইয়াছে। খাজনার হার সম্পর্কে পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে স্থূল উৎপাদনের (gross produce) $\frac{১}{৪}$ অথবা $\frac{১}{৫}$ অংশের বেশি হইবে না। সকল রাজ্যেই খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন রাজ্যের খাজনার হারের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।[১৫]

জমিতে প্রজাদের স্বত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন কোন রাজ্যে বিস্তৃত

---

১৪ ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ এইরূপে হিসাব করা হইয়াছে :

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	৩৮৯ কোটি টাকা
পুনর্বাসন মঞ্জুরী	৮৬ কোটি টাকা
সুদ	১৫০ কোটি টাকা
	৬২৫ কোটি টাকা

১৫ আসাম, বোম্বাই, মহীশূরের অংশে, উড়িষ্যা, রাজস্থান, পুরানো হায়দরাবাদ অঞ্চল এবং দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে সর্বোচ্চ খাজনার হার স্থূল উৎপাদনের $\frac{১}{৪}$ অংশ বা তাহা অপেক্ষা কিছু কম; ইহাদের মধ্যে দুইটিতে, বোম্বাই ও রাজস্থানে, $\frac{১}{৬}$ অংশ। কেরালাতে কৃষি সংস্কার আইনে ধানের জমিতে স্থূল উৎপাদনের $\frac{১}{৪}$ হইতে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং অন্যান্য জমিতে $\frac{১}{৬}$ হইতে $\frac{১}{১০}$ অংশ অন্যান্য রাজ্যে সর্বাধিক খাজনার হার স্থির করা হইয়াছে। স্থূল উৎপাদনের $\frac{১}{৩}$ অংশ বা একটু বেশি; ইহার মধ্যে তিনটিতে (অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে) কোন কোন ক্ষেত্রে স্থূল উৎপাদনের ৫০ % ধার্য করা হইয়াছে।

আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যান্য রাজ্যে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ নিবারণের জন্য আইন পাশ করা হইয়াছে।১৬

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদের পরে প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দেওয়া হইবে। রাজ্য সরকারসমূহ এই বিষয়ে বেশি অগ্রসর হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যসরকার আইন পাশ করিলেও অধিকাংশ চাষীর পক্ষে জমি কেনা সম্ভবপর হয় নাই।

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, **জোতের উর্ধসীমা** নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াব জন্য জমির হিসাবপত্র করা দরকার। বেশির ভাগ রাজ্যেই হিসাব লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছে, পারিবারিক জোতের তিনগুণ পরিমাণ জোতের উর্ধসীমা নির্দিষ্ট করা উচিত (ceiling at three fanily holdings) এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার আইন পাশ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে উহার পরিমাণ ২৫ একর।

বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জমিগুলির একত্রীকরণ বিশেষ দূর অগ্রসর হয় নাই, কারণ জমিদারী উচ্ছেদ ও চাষীকে স্বত্ব প্রদানের কাজ শেষ করা যায় নাই। ঐ সকল আইন জমিদারের ফাঁকি দিয়াছে বলিয়া এখনও জমিদারেরা একত্রীকরণে বাধা দিতে পারিতেছে১৭।

---

১৬ যে সকল রাজ্যে প্রজা-স্বত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আইন পাশ হইয়াছে সেখানে মোটামুটি তিন ধরণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় :

(১) জমিদারদের নিজ-চাষের জন্য কোন অধিকার না রাখিয়া সকল চাষীকেই পূর্ণ চাষস্বত্ব দিয়াছে. যেমন যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী।

(২) জমিদারেরা যদি কিছু পরিমাণ জমি বা কিছু অংশ জমি চাষীদের স্থায়ী অধিকারে রাখে, তাহা হইলে তাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি নিজের চাষে রাখিতে পারে, যেমন আসাম, বোম্বাই, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি।

(৩) জমিদারদের নিজ চাষের জন্য জমির পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু চাষীরা খুব কম (নিম্নতম কিছু পরিমাণ) জমি নিজের হাতে রাখিতে পারিবে না বলা হইয়াছে।

১৭ প্রথম পরিকল্পনাকালে বোম্বাই-এ ২১ লক্ষ একর, মধ্যপ্রদেশে ২৯ লক্ষ একর, পাঞ্জাবে ৪৮ লক্ষ একর, পাঞ্জাব ও পুর্বপাতিয়ালা রাজ্যসমবায় ১৩ লক্ষ একর এবং যুক্ত প্রদেশে প্রায় ৪৫ লক্ষ একর একত্রীকরণ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সকল রাজ্য মিলিয়া এই পরিকল্পনার জন্য ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছে (কয়েকটি রাজ্যের হিসাব পাওয়া যায় নাই) ৩ কোটি ৮০ লক্ষ একর।

সমবায় চাষ সম্পর্কে পৃথকভাবে এখন পর্যন্ত কোন রাজ্য সরকার আইন পাশ করে নাই। তবে চাষীরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমবায় সমিতি স্থাপন করিলে খাজনার হার, জল ও সারের দাম, সরকারী উপদেষ্টার সাহায্য, ট্রাক্টর ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি সুবিধা দেওয়া হইবে, কয়েকটি রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে (যেমন পশ্চিম বাংলা) এইরূপ বলা হইয়াছে।

ভারতে ভূমিসংস্কারের সমালোচনা (A Critique of Indian Land Reforms)

ভারতের যে কোন ভূমি সংস্কার আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, আইন সভায় বিল পেশ করা হইতে সুরু করিয়া সেই আইন পাশ হইতে যে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয় তাহাতে সেই আইনের কার্যকারিতা খুবই হ্রাস পায়। যুক্তপ্রদেশে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে আইনসভা জমিদারী উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করিয়া একটি কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করে। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে কমিটি উহার রিপোর্ট দেয়। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আইন সভায় জমিদারী উচ্ছেদের বিল আসে। বিতর্ক, আন্দোলন ও সংশোধনের নিয়মিত পদ্ধতির মধ্য দিয়া সেই বিল শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে পাশ হয়। তাহার পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রণাক্রমে রাষ্ট্রপতি উহাতে সম্মতি দেন। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আনিবার সময় বিপদ ঘটে। যেমন হিমাচল প্রদেশে, ১৯৫৩ সালের প্রথমেই জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হইয়া রাষ্ট্রপতির নিকটে সম্মতির জন্য প্রেরিত হইল। কয়েকমাস ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে বিলের কয়েকটি ধারা কিছু নরম করা ভাল। শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হিমাচলপ্রদেশ আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া দিল্লীতে পাঠাইবার প্রায় এক বৎসর পরে মুক্তিলাভ করে।[১৮]

বেশি সময়ক্ষেপ হওয়ায় আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য

---

১৮ এইরূপে আইন পাশ হইলেই সেই অনুযায়ী সংস্কার কার্য সুরু হইবে, এমন কথা নাই। ৪ বৎসর ধরিয়া যে আইন বিহারে পাশ হইল সেই আইন প্রয়োগ করার সময়েই বিহারের জমিদারেরা আদালতের আশ্রয় লইল। জমিদারপক্ষ জয়ী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধন করিলেন। জমিদারপক্ষ সুপ্রীম কোর্টে গেল এবং এইবার তাহারা পরাস্ত হইল। বিহার সরকার সেই আইন কার্যকরী করিতে উদ্যত হইল, জমিদারেরা আবার ছোট আদালত

এত দেরী হইলে, একথা স্পষ্টই জানা যায় যে, জমিদারদের স্থান হইতে তাহাদের বিচ্যুত করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। উঁচুদরের মালিকানা সত্ব যাহার আছে,সে নিজের পরিবারের লোকদের নামে বিশ্বাসী চাকরবাকরের নামে, জমিদারী ভাগ করিয়া দিয়া, এবং বাকী জমি নিজের আত্মীয়স্বজনকে প্রজা হিসাবে দেখাইয়া, বহুপ্রকার কাগজপত্র পাল্টাইয়া ভাগচাষী ও প্রজাদের ভয় দেখাইয়া ভৃত্য হিসাবে সাজাইয়া প্রায় পুরা জমিদারীই পূর্বের ন্যায় রক্ষা করিতে পারে। বহুদিনকার প্রজা ও ভাগচাষীরা জমি হইতে উৎখাত হইয়া যায়, রাষ্ট্র কিছুই করিতে পারে না। ভারতে জমিদারী উচ্ছেদের আইনগুলি এই পথেই সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকেন্দ্রগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই, গ্রামাঞ্চলে মধ্যসত্ব লোপ পায় নাই, বণ্টনের উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় নাই। ভূমিহীন চাষী জমি পায় নাই, প্রকৃত চাষী কোন চাষ-স্বত্ব পায় নাই, অবস্থা পূর্বের তুলনায় খারাপ হইয়াছে, কারণ জমিদারেরা পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ও সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা চাষ করে না, সেই জমিদার শ্রেণীর হাতে কিছু জমি নিজে বা প্রজা বা মজুরের সাহায্যে চাষ করাইবার অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে সকল ভূমি সংস্কার আইন বিফল হইয়া গিয়াছে।[১০]

নিজে যাহারা চাষ করে না, তাহাদেরও চাষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে

হইতে সুরু করিয়া সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত ধাবিত হইল। জমিদারেরা মামলায় হারিয়া গেল। ১৯৫২ সালে তৃতীয় বারের মত যখন আইন কার্যকরী হইতে গেল, তখন জমিদার পক্ষ অসহযোগিতা করিয়া জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারের হাতে দিতে সরাসরি অস্বীকার করিল। সরকারী কর্মচারীরা তখন নিজেরাই এই সকল কাগজপত্র তৈয়ারী করিতে চেষ্টা সুরু করিল। ইহার পরে যখন জমিদারদের উপর 'জমিদারী ছাড়িয়া দেওয়ার সরকারী নির্দেশ আসিল, তখন জমিদারেরা আদালতে কিছুদিন সময় চাহিল; ইহাতে আবার দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এইরূপে মাত্র আট বৎসর সময়ের দরকার হইয়াছিল।

১৯ "In sum, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition Act has provided for a new hieraachy of tenure-holders in place of the old one ; but the two are all too recognizrbly similar. At the top are the bhumidars, below them the sirdars, and still further down the asamis. At the bottom of the heap remain the mass of cropsharers and landless labourers. The zamindars have disappeared but these same persons have been confirmed as landholders, often of very substantial tracts of the best quality of land. Intermediaries as such

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে বিচার করিলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া খুবই অনুচিত হইয়াছে বলা চলে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রভূত অর্থ দরকার—এই অবস্থায় অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে এত অর্থ দেওয়া কিছুতেই অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়াইতে পারে না ২০।

ক্ষতিপূরণের ভার চাষীর উপরই পড়িয়াছে

প্রজা উচ্ছেদের অভিযান সুরু হওয়ার ফলে জমিদারের হাতে পূর্বাপেক্ষা বেশি জমি আসিয়া গিয়াছে। নিজেরা বা মজুরের সাহায্যে চাষ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থা থাকায় বহুদিনকার প্রজার হাত হইতেও জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সুরুতে জমিতে বৃহদায়তন চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, চাষী-উচ্ছেদের এই ঐতিহাসিক ধারা-পথেই ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সঠিকভাবে হইতে পারিতেছে না, কারণ দেশে প্রকৃত শিল্পের প্রসার ঘটে নাই এবং সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। দেশের ভূমিসংস্কার আইনসমূহ সামন্ততন্ত্রকে পূর্ণ উচ্ছেদ না করিয়া উহাকে ধনতান্ত্রিক রূপদানের চেষ্টা করিতেছে।

প্রজাউচ্ছেদ ও গ্রাম্য বেকারের পরিমাণ বৃদ্ধি

দেশে শিল্পপ্রসার দ্রুত না হইলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিতে

---

are not allowed and the leasing out of land is prohibited, but it is possible to retain the status of a "cultivator," while tilling solely with the labour of hired workers, or by giving out one's fields to cropsharers. For the great bulk of the peasantry who were classified as sirdars the tenure remains substantially the same, the rent remains exactly the same, and the most important new feature is that the rent is collected by Government rather than by the zaminder."—*Daniel Thorner* : **Agrarian Prospect of India P. 25.**

২০ উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থের অভাবের দিকে তাকাইয়া বিবেচনা করা দরকার যে, ক্ষতিপূরণের হার কঠোরভাবে কমান দরকার কি না। মোট টাকার পরিমাণ প্রায় ৫৫৯ কোটি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের প্রায় ২৫%—ইহা খুবই বেশি এবং ভবিষ্যতের কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজ্য সরকারের তহবিলসমূহের গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়া থাকিবে কয়েকটি রাজ্যে ২০, ৩০ এমন কি ৪০ বৎসর পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। *H. D. Malaviya* : **Land reforms in India P. 485.** "Compensation at current values will load the present tenants with considerable dbbts."—*kenneth H. Parsons,* **Professor of Agricultural Economics in the , University of wisconsin U. S. A Malavya P. 486.**

পারে না, এই চাপ গ্রাম্যবেকারির রূপে প্রকাশ পায়। এই বেকারি যতদিন থাকিবে ততদিনই চাষীর খরচায় কম মজুরিতে অথবা বেশি খাজনায় জমিদার চাষ করাইয়া লইতে পারিবে; নিছক মালিকানার জোরে চাষীর হাত হইতে 'উদ্বৃত্ত' অপহরণ করিয়া লইতে পারিবে। তাহা ছাড়া দেশের মধ্যে যতদিন ট্রাক্টরের উৎপাদন সুরু না হইবে, সস্তায় জলসেচ ও ঋণ পাওয়া না যাইবে, জমির একচেটিয়া ভাঙিয়া জমি সস্তা না হইবে, ততদিন জমিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হইবে না। ছোট খাট বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ সুরু হইলেও দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিরাজ করিতেছে।

এই আইনগুলি ধনতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করে নাই

সরকারী কৃষি সংস্কার আইনগুলি যতই ভাল হউক না কেন উহা কার্যকরী করা কখনই ভালভাবে হয় না, কারণ উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ একদল ব্যক্তির নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ছাড়া ইহা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি-কেন্দ্র এমনই রহিয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীগণ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই শক্তিবিন্যাসকে মানিয়া এবং উহার সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে বাধ্য হয়[২১]। যতদিন না পর্যন্ত গ্রামজনতা স্বাধীনতার বিদ্যুৎস্পর্শে সকল শোষণ ও বাধা দূর করিয়া উঠে, নিজশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া না উঠে, নিজেই নিজের চালনশক্তি সৃষ্টি করিতে না পারে, ততদিন অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী ভূমিবিপ্লব সফল হইতে পারে না।

পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিবিন্যাস বজায় রাখিয়াছে

---

২১ "The bigger landlord has ways which conform with those of the money-lender, and indeed, as we have said, he is often the moneylender or trader himself. The village headman is often drawn from the same class, and it is usual for these to have connexions which link them not only to the sources of finance but to the seats of administrative power. Subordinate officials, revenue and other—including those of the relatively low-paid cooperative department—have no alternative but to stay with these village leaders, and be dependent on them for ordinary amenities when they visit the village or camp in it for a few days. In this and other ways is initiated a process of association with those who wield power and influence in the village and who for that reason have their own uses as the local instruments of an adminstration which resides in town and cities and which in various degrees is inaccessible to the ordinary villager......frequently the directions merely remain on paper, especially when they involve some disadvantage to the more powerful in the village.

জোতের উর্ধ-সীমা নির্ধারণ (The Problem of Land ceilings)

জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা উচ্ছেদের পর রাষ্ট্রের সঙ্গে চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। জমিতে যাহাতে একচেটিয়া মালিকানা পুনরায় গড়িয়া উঠিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন জোতের উর্ধ সীমা নির্ধারণের কথা বলিয়াছেন। অর্থনৈতিক জোত বা পারিবারিক জোত-এর (economic holding or family holding) পাঁচগুণ পর্যন্ত এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকিতে পারিবে এইরূপ সুপারিশ করিয়া ইহা কার্যকরী করার ভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে ব্যক্তির হাতে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহু ধরণের যুক্তি দেখান হইতেছে২২। প্রথমতঃ, বলা হইতেছে যে, জোতের উর্ধ-সীমা স্থির করিলে বড় বড় ফার্মগুলি ভাঙিয়া যাইবে, ছোট ছোট খণ্ড ছিন্ন জোতের উদ্ভব হইবে, বৈজ্ঞানিক চাষ সম্ভব হইবে না।

বিরুদ্ধ যুক্তি সমূহ

দ্বিতীয়তঃ, বড় জমিদারের সংখ্যা কম এবং তাহাদের হাতে জমির পরিমাণ এমন বেশি নয় যে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া নিঃস্ব চাষীদের হাতে খুব বেশি জমি দেওয়া যাইবে। জমি-হীন কৃষি মজুরের পরিমাণও বেশি কমিবে না২৩।

……Several factors in the village help to create this effect, not least among them the powerful influence of caste · this marked tendency toward the promotion of an impression of change around changelessness, of active obedience to behests around solid resistance to instructions...has always to be taken into account in assessing the worth of reports that the policies of Government have been put into operation in the village ··The persons who suffer in this proccess are the weaker and disadvantaged elements of the village for whose benefit the directives and policies are conceived."—The General Report P. 277-8.

২২ "And it is interesting that those spokesmen for whom land ceiling is totally unrelated to economic realities are themselves not so much concerned with the economic merit of the case as with their own fear that ceiling, once accepted. would be extendend to urban income," A. I. C. C. Economic Review Dec 1, 1958.

২৩ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিকাল ইনষ্টিটিউট-এর জাতীয় নমুনা অনুসন্ধান-এর বিবরণী হইতে এই যুক্তির স্বপক্ষে তথ্য সরবরাহ করা হইতেছে। "প্রতিটি পরিবারকে কিছু পরিমাণ, অন্ততঃ ২ একর করিয়া জমি দিতে হইলে, সরল হিসাবেই দেখা যায়, ভূমিহীন এবং ২ একরের কম যাহাদের আছে তাহাদের জন্য মোট ১০ কোটি একর জমি দরকার। ২০ একর জমিতে উর্ধ সীমা স্থির করিয়া উহার অধিক সকল জমি লইয়া লইলে মোটে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, মাত্র ২০ একর জমিতে উর্ধ-সীমা স্থির করিয়া উহার অধিক জমি বণ্টন করিলে ছোট ছোট ২ একরের জোত তৈয়ারি হইতে পারে বটে, কিন্তু এইগুলি অর্থ নৈতিক দিক হইতে ভাল হইতে পারে না।"

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির হাতে কৃষিগত আয় বা গ্রাম্য আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া জোতের উর্ধ-সীমা কিরূপে স্থির করা যায় ? বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উর্বরতা, জলবায়ু বা জলসেচ ব্যবস্থাতে (অর্থাৎ একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণে) এত পার্থক্য থাকে যে, সমান একরের হিসাবে সারা দেশে এইরূপ উর্ধ-সীমা নির্ধারণ সম্ভব হয় না। সারা দেশের অন্যান্য সকল উৎপাদনক্ষেত্রে আয়ের বা মূলধনের উর্ধ-সীমা নির্দিষ্ট হইল না, কিন্তু যাহারা সাপের কামড় খাইয়া রৌদ্রজল মাথায় করিয়া চাষের কাজ করে তাহাদের কি দোষ হইল ? কেবল মাত্র তাহাদের ক্ষেত্রেই আয় বৃদ্ধির সীমা নির্ধারিত হইবে কেন[২৪] ?

চতুর্থতঃ, বাড়্তি জমির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হইতেছে তাহা খুবই কম, ইহাকে উৎখাত চলাই চলে। আর যদি বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাই হয় তবে আরও ভালভাবে টাকা খাটাইবার উপায় কি দেশে নাই ?

এই সকল যুক্তির বিপক্ষে উর্ধ-সীমা স্থাপনের সমর্থনকারীরা কি বলেন তাহাও জানা দরকার। অনেক সময়ই উর্ধ-সীমা স্থাপনের সমর্থনকারীরা কেবলমাত্র গণতন্ত্রের প্রসার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেন। তাঁহারা বলেন ভূমি বণ্টন না হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতরা ধনী চাষীর কুক্ষি হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না, দেশে সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায় না।

এই প্রকার যুক্তি ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক হইতে উর্ধ-সীমা নির্ধারণের পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। প্রথমতঃ, সকল চাষীর ভূমি-ক্ষুধা মিটান না গেলেও ভূমি বণ্টন করার দরকার নাই, এই কথা ঠিক নয়। চীন দেশেও কৃষি সংস্কারের প্রথম যুগে জমি বণ্টন করিয়া চাষীর মনে তীব্র উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইয়াছে। জমিদারদের না চটাইয়া এই নীতি আমাদের দেশে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, জোতের উর্ধ-সীমা নির্ধারণের বিষয়ে কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে তাকাইলেই চলিবে

---

[২৪]বলা হয় যে জমির পরিমাণ স্থির রহিল, কিন্তু চাষের পদ্ধতিতে ক্রমাগত উন্নতি করিয়া চাষী যত খুসী আয় বাড়াইতে পারে। কিন্তু অত ছোট জোত হইতে আয় বাড়াইবার সীমা নির্দিষ্ট আছে।

না, বণ্টনের দিকও মনে রাখিতে হইবে। বেশি পরিমাণ জমির মালিক ধনী চাষী বা জমিদারদের হাতেই বিক্রয়-যোগ্য শস্য জমিয়া যায় সাধারণ চাষীদের (দারিদ্র্যের দরুণ) এবং তাহাদের এইরূপ কাজকর্ম একচেটীয়া দেশে দুষ্প্রাপ্যতা ও দাম বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ জমির একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া তাই খুবই দরকার ২৫।

তৃতীয়তঃ, বড় বড় জমিদারী ভাঙিলে ছোট ছোট জোত দেখা দিবে, এই যুক্তিও সঠিক নয়, কারণ বড় জমিদারদের জমি একসঙ্গে এক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নাই, উহা খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়াই আছে। চাষের দিক হইতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহা ছাড়া, ইহা সকলেই জানেন যে, দেশে মূলধন বেশি থাকিলে বৃহদায়তন চাষে সুবিধা পাওয়া যায়, আর শ্রমিক বেশি থাকিলে শ্রমপ্রগাঢ়পদ্ধতি নিয়োগ করিতে হইলে ছোট জোতই সুবিধাজনক। শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন-বেশি বাড়ান না গেলেও একর-প্রতি উৎপাদন ইহাতে খুবই বাড়ান চলে। চীন দেশে একর প্রতি ধানের উৎপাদন (শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতি দ্বারা) ১৯৪৯ সালে ১৫৬৬ পাউণ্ড হইতে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৩৫৫ পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছিল; সেই বৎসর ভারতের একর-প্রতি ধান্যোৎপাদন ছিল ১,১০০ পাউণ্ড।

স্বপক্ষে যুক্তি সমূহ

চতুর্থতঃ, জোতের সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দিলে এবং খাদ্যশস্যের ব্যবসায় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিলে ক্ষতিপূরণের টাকায় এবং সঞ্চিত অর্থে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হওয়ার মত সম্ভাবনা দেখা দিবে, ইহাও মনে রাখা দরকার।

জোতের উর্ধ-সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার যে সকল অসুবিধা আছে, তাহাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জোতের উর্ধ-সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার অর্থই হইল চাষীর বা জমিদারের আর্থিক আয় নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা।

---

২৫ "Stark economic reality and not ideology, therefore, demands a breakup of the monopoly. When mere 5 per cent of the population accounts for 88 per cent of land holdings and 45 per cent of the land holdings account for only 8 per cent of the total cultivated acreage, the possibility of hoarding is immense." A. I. C. C. Economic Review Dec. 1. P. 18.

যদি দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর বাড়িয়া যায়, তবে এই নির্দিষ্ট আয়ের চাষীদের খুবই অসুবিধা হইবে। শিল্পজাত দ্রব্যের দামস্তর যত বৃদ্ধি পাইবে ইহাদের উপর অবিচার মতই বাড়িবে। দামস্তর কতখানি স্থির রাখা সম্ভব হইবে তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়।

কার্যকরী করার বাস্তব অসুবিধা

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে জমির পরিমাণ, উর্বরতা এবং আয় প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক তথ্যের অভাব এত বেশি যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একর-প্রতি গড় আয় স্থির করাই সম্ভব হইবে না। তৃতীয়তঃ, যেখানেই এইরূপ উর্ধ-সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে জমির মালিকেরা বিভিন্ন উপায়ে (ভুয়া সম্পত্তিভাগ প্রভৃতি) উহা ফাঁকি দিয়াছে। পরিবারের মধ্যে বা বিশ্বস্ত চাকর বাকর কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামে ঠিক উর্ধ-সীমা পর্যন্ত জমি লিখাইয়া লওয়া প্রায় সকল রাজ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার, পরিকল্পনা কমিশন জোতের উর্ধ-সীমা নির্ধারণ করিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু জোত ইহা হইতে বাদ দিবার কথা বলিয়াছেন। মিশ্র জোত—যেমন বাগিচা, বাগান, দুধ, মাখন, পনীরের ব্যবসাস্থল প্রভৃতি একত্রীভূত জোতগুলি তাঁহারা বাদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বাদ দিবার আইনগত ফাঁকের মধ্য দিয়া প্রায় সকল ধনী চাষীই এই আইন ফাঁকি দিবার জন্য ইতিমধ্যে তৈয়ারী হইতেছে।

ভূদান যজ্ঞের অর্থনীতি (Economics of Bhoodan Yagna)

ভারতের ভূমিহীন চাষীরা যাহাতে জমি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পদ বৈষম্য হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্যে বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলন সুরু করেন। তাঁহার হিসাব মতে ভারতে ৫ কোটি ভূমিহীন চাষী আছে। প্রত্যেক ভূমিহীন চাষীর জন্য ১ একর হিসাবে জমি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তিনি এই আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৫ জন হিসাবে লোক ধরিয়া পরিবার-পিছু ৫ একর জমি তিনি লক্ষ্য হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন। গান্ধী প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি জমিদারদের মনে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সহানুভূতির বাস্তব প্রকাশ হিসাবে

ভূদানের লক্ষ্য

প্রত্যেক জমিদারকে নিজ-মালিকানার ১/৬ অংশ দান করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। ভারতে মোটামুটি ৩০ কোটি একর জমি চাষ হয়, সারা দেশে এইরূপ নির্দিষ্ট অনুপাতে দান হইলে ৫ কোটি একর পাওয়া যাইবে এবং তাহার পরে ভূদান কর্মীদের নেতৃত্বে এই জমি উপযুক্তভাবে বণ্টন করা হইবে।

আন্দোলনের উৎপত্তি

১৯৪৯-৫০ সালে ভারতীয় সাম্যবাদী দল তেলেঙ্গানায় জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি নিজেরা অধিকার করিয়া চাষ আবাদ করার জন্য সেই অঞ্চলের ভূমিহীন চাষীদের আহ্বান করিয়াছিলেন। ধনী চাষী ও জমিদারেরা ইহার বিরোধিতা করে এবং তাহাদের বিতাড়িত করিয়া ভূমিহীন ও গরীব চাষীরা নিজেদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া লয়। উহার পরে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে চাষীদের সরাইয়া দিয়া জমিদারগণ সেই জমি পুনরায় নিজেদের দখলে আনে। ১৯৫১ সালে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিনোবা ভাবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপ্লবের পথ ছাড়া বিকল্প পথের আভাস দিতে সচেষ্ট হইলেন।

অগ্রগতি

আন্দোলনের সূত্রপাত খুব আশাজনক দেখা গেল; ১৯৫২ হইতে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ০ লক্ষ একর জমি দান হিসাবে পাওয়া গেল। ইহার মধ্যে বেশি পরিমাণ হইল বিহারে, ১৯৫৩ সালে। কিছুদিন পরে এই আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চাশা ক্রমে কমিয়া আসিল এবং এই আন্দোলনের সার্থকতা, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা দেখা দিল।

কিন্তু ততটা সফল হয় নাই

দেখা গেল যে, (ক) বিহারে দান-করা বেশির ভাগ জমিই পাথুরে, বন্ধ্যা, কৃষির দিক হইতে অনুপযোগী অথবা জটিল ধরণের স্বত্বসংক্রান্ত মামলা বিবাদের অধীন। অন্যান্য রাজ্যে দেখা গেল, দান-করা জমিগুলি আইন-নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ জোত-পরিমাণের ঠিক উদ্বৃত্ত অংশ। ভূমি আইন কার্যকরী হইলে যতটুকু রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইতে পারে, জমিদারেরা ততটুকু ছাড়িয়া দিয়াছে, উহার বেশী নয়। (খ) কিন্তু আরও বেশি অসুবিধা দেখা গেল সেই জমি বণ্টনের ব্যাপারে। যে জমি পাওয়া গিয়াছে উহার ৫%-এর বেশি এখন পর্যন্ত বণ্টন হয় নাই। (গ) ভূদান আন্দোলনের মূল

কথা সম্পদ বণ্টন ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস মোটেই সফল হয় নাই। যে সকল জমি বা উৎপাদন কেন্দ্র হাতে রাখিলে গ্রামের অর্থনীতির উপর ধনীচাষী বা জমিদারী শ্রেণীর অকুণ্ঠ প্রভাব বিস্তৃত থাকে, তাহাদের বাদ দিয়াই কিছু কিছু জমি ধনী চাষীরা ছাড়িয়া দিয়াছে ২৬।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভারতীয় কৃষির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে ভূদান আন্দোলন সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। এই মূল বিষয় হইল পাঁচটি, ইহার একটিও ভূদান আন্দোলনের দ্বারা সমাধা হয় নাই :

(১) অত্যন্ত জটিল সম্পত্তিগত কাঠামো, যাহার মাথায় হইল রাষ্ট্র কর্তৃক প্রধান মালিক হিসাবে "খাজনা" আদায় ;

(২) ভূমি সংস্কার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের "বিলোপসাধনের" পরেও, চাষের কাজ না করিয়া কেবল মালিকানা সত্বের জোরেই একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকা—যাহারা প্রকৃত চাষীর—প্রজা, বা ভাগচাষীর—নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে খাজনা এখনও পাইতেছে অথবা যদি মজুর খাটাইয়া চাষ করে তবে অত্যন্ত কম হারে মজুরি দিতেছে ;

প্রকৃত সমস্যা কি কি

(৩) ভূমি সংস্কারের পরেও, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্ব বজায় থাকা এবং সত্যসত্যই হাতে কলমে চাষ করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে ;

(৪) প্রকৃতপক্ষে যে চাষীরা চাষ করে তাহারা নিয়মিতভাবে এবং খুব বেশি পরিমাণে মূলধনীদ্রব্য ও অর্থসঙ্গতির ব্যাপারে অভাবগ্রস্ত ; উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে ; এবং গড় ফলন খুবই কম ;

(৫) এইরূপ অবস্থা দূর হইয়া অর্থনৈতিক পুনসংগঠনের দিকে অগ্রসর হওয়ার মত অন্তর্নিহিত কারণের বা ঝোঁকের অভাব ; খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন জমি ; উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন খুবই ছোট।

---

২৬ „For political purposes they may associate their names briefly with the Bhoodan works. Some have attempted to gain control over Bhoodan redistribution so as to enlarge or strengthen their following ··when the Bhoodan compaigners march into their village, these well-off folk make a good show by giving away a few patches of land. But they are careful to retain securely in their grasp the holdings and associated economic operations. upon which their control of the village rests". *Daniel Throner* : Agrarian Prospect P. 15.

এই পাঁচটি অবস্থা মিলিয়া গঠিত কৃষি-অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্রে প্রকৃত চাষীর বাসস্থান নাই ; সকল চাষীকে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে প্রতি গ্রামে একটি দুইটি বা কয়েকটি পরিবার। তাহাদের হাতে গ্রামের সমস্ত জমি তো নাই-ই, অর্ধেকও হয়তো নাই ; কিন্তু তাহাদের হাতের জমিগুলি গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সর্বাধিক মূল্যবান। তাহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া প্রজা বা ভাগচাষীকে জমি পাইতে হয়, ভূমিহীন মজুরকে কাজ পাইতে হয়। তাহাদের উপর এই বাধ্যতামূলক নির্ভরশীলতাই তাহাদের শক্তির উৎস। তাহারাই ঋণ দেয়, দাদন দেয়, ফসল কেনে, উহাকে বিক্রয়োপযোগী শোধন করে এবং বিক্রয় করে। অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির এইরূপ ভারসাম্য কি ভূদান আন্দোলনের দ্বারা কিছু মাত্র ব্যাহত হইয়াছে অথবা সেইরূপ কোন সম্ভাবনা আছে ?

সমস্যার মূল কেন্দ্রে ভূদান পৌঁছিতে পারে নাই

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জমি ও চাষী : জোতের আয়তন

Land and Cultivator : the unit of Cultivation

একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদন-মাত্রা সর্বোত্তম স্তরে (Optimum scale of Production) উঠান দরকার। ভারতে চাষী-প্রতি চাষের জমির পরিমাণ খুবই কম এবং পুরুষ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার-সূত্রে গড় জোতের আয়তন হ্রাস পাইতেছে। তাহা ছাড়া, প্রতিটি চাষী পিতার প্রতিটি জমি খণ্ড হইতে অংশ দাবী করায় প্রত্যেক চাষীর হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, "জোতের আয়তন, তাহাদের মালিকানা এবং চাষ—এই সকল বিষয়ে সংবাদ খুবই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ"। তাহা সত্ত্বেও চাষীর হাতে জোতের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে হিসাব পাওয়া যায়। কয়েকটি রাজ্যে জোতের গড় আয়তন হইল :

রাজ্য	গড় জোতের আয়তন
বোম্বাই	১৩·৩ একর
পাঞ্জাব	১·০ একর
মহীশূর	৬·২ একর
উড়িষ্যা	৪·৯ একর
আসাম	৪·৮ একর
মাদ্রাজ	৪·৫ একর
পশ্চিমবঙ্গ	৪·৪ একর

বাস্তব অবস্থা আরও খারাপ, কারণ ইহা গড়ের হিসাব এবং বড় বড় জোতও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে সারা ভারত কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানের বিবরণীতে (Report of All India Agricultural Labour Enquiry) বলা হইয়াছে যে, ২ একরের কম জোতের পরিমাণই সর্বাধিক সংখ্যক। মোট জোতের তুলনায় ৫ একরের কম জোতের

সংখ্যা মাদ্রাজে ৬৭·৬%, অন্ধ্রে ৬৬·৮%, মধ্যপ্রদেশে ৫৯·৪%, মধ্যভারতে ৪৫·৬% এবং হায়দরাবাদে ৩২%।

উপরের এই হিসাব হইতে প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না, কারণ ইহা মালিকানার হিসাব। চাষের জোতের আয়তন আরও অনেক কম, কারণ মালিকানার হিসাবে চাষীর হাতে বেশি জমি থাকিলেও খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য প্রত্যেকটি জোতের আয়তন খুবই কম হইয়া পড়ে।

খণ্ডীকরণকে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে সমর্থন করা হয়। বলা হয় যে, কয়েকজনের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত না হইয়া অনেকের মধ্যে সম্পত্তির বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া ভাল। অসম্বদ্ধতার পক্ষে অনেক বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে জমি ছড়াইয়া থাকার সুফল হইল ফসল লোকসানের ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখা, বাৎসরিক ফসল-পরিবর্তনের (annual crop rotation) সুবিধা বেশি পাওয়া।

খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার সুবিধা

কিন্তু ত্রুটির তুলনায় এই সকল সুবিধা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খুব ছোট ছোট জোতে কখনই চাষীর পক্ষে জমিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া কতকগুলি স্থির ব্যয় (fixed cost) যেমন গরু লাঙল প্রভৃতি চাষীকে বহন করিতেই হয়, জমি কম থাকিলে এই সকল মূলধনী দ্রব্যগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হয় না, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি ইউনিটে স্থির ব্যয়ের অংশ বেশি পড়ে। পরিবর্তনীয় ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি দরকার হয়। অনেক সময়, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনীয় ব্যয় (যেমন জমিতে বেড়া দেওয়া) নির্বাহ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার মত বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয় না। রাস্তা, আইল প্রভৃতিতে প্রচুর জমি নষ্ট হয়। সর্বাপেক্ষা অসুবিধা হইল ইহার দরুণ কৃষির যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় না। কৃষিজাত উদ্বৃত্ত চাষের কাজ মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হইয়া কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়াইবার সুযোগ পাইতে পারে না।

খণ্ডীকরণের অসুবিধা

অসম্বদ্ধতার ফলে এই সকল দোষ ত্রুটিগুলিই আরও প্রকট হইয়া পড়ে। অতিক্ষুদ্র জোতের সকল ত্রুটিই অসম্বদ্ধতায় দেখা যায়, যন্ত্র ও শ্রম-সঞ্চয়ী পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র জোতের কোন সুবিধা এই অবস্থায় নাই, নিজহাতে চাষী ক্ষুদ্র জোতে যে প্রগাঢ়-চাষ করিতে পারে, অসম্বদ্ধতার দরুণ তাহা পাওয়া যায় না। প্রচুর পরিমাণ জমি নষ্ট হয়, দূরের জমিখণ্ড ভাল চাষ হয়

অসম্বদ্ধতার অসুবিধা

না, সেই জমির উপর ভাল নজর রাখা চলে না। মূলধনীদ্রব্য ও শ্রমিকের যাতায়াতের দরুণ ব্যয় বাড়িয়া যায়, প্রচুর সময় নষ্ট হয়, পথঘাটে যাতায়াতের অধিকার ও সীমানার বেড়া লইয়া মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়, অন্যান্য কাজে অসমবায়ী মনোভাবের ঝোঁক দেখা দেয়, একটি পুকুর বা কুয়া কাটিয়া একজন চাষী নিজের সকল জমিখণ্ডে সেচ দিতে পারে না। রাত্রিদিন সকল খণ্ডের জমিতে পাহারা দেওয়া সম্ভব হয় না।

কারণ : এই অবস্থা উৎপত্তির প্রধান কারণ হইল কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকা এবং উহার দরুন কৃষির অনগ্রসরতা। জমিদারের হাতে জমি থাকায় সে একসঙ্গে বেশি জমি চাষীকে দিতে চাহে না, নিজের জনবল বাড়াইবার জন্য অধিকসংখ্যক চাষীর মধ্যে জমি ভাগ করিয়া দিতে চায়। গ্রামের অধিকাংশ চাষীর উপর ক্ষমতা বিস্তারের ইহা একটি অন্যতম পথ। অন্যান্য দেশে কৃষিতে ধনতন্ত্র প্রসারের পথে এই সকল ক্ষুদ্র জোত ভাঙিয়া জমিদারেরা বৃহৎ কৃষিফার্ম গঠন করিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের জমিদারেরা অধস্তন মধ্যসত্বভোগীদের নিকট জমি বণ্টন করিয়া নিশ্চিত রাজস্বের বিনিময়ে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানের ভূমি সংস্কার আইনগুলি জমিদারী-প্রথা সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয় নাই, জমিদারদের অধিকার বহুলাংশে বজায় রাখিয়াছে, ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার মূল ভিত্তি অপসারিত হয় নাই।

মূল কারণগুলি

ইহা ছাড়া আরও অনেক কারণ দেখান হইয়া থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন না হওয়ার ফলে চাষের জোত ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়াছে, খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে প্রচ্ছন্ন বেকারির সম্পত্তিগত প্রকাশমাত্র। ব্যক্তিসত্বার প্রভাব বাড়িয়াছে, যৌথপরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে, সম্পত্তি ভাগ করিয়া লওয়ার ইচ্ছা প্রবলতর হইয়াছে। দেশের উত্তরাধিকার আইন খণ্ডীকরণে সাহায্য করিয়াছে। দেশের ভূমিসত্ব ও ভূমিব্যবস্থায় অসম্পূর্ণ কৃষিবিপ্লব এই ব্যবস্থাকে আরও বহুদিন জিয়াইয়া রাখিবে বলিয়া মনে হয়।

আনুসঙ্গিক কারণগুলি

আর্থিক জোত (The Economic Holding)

আর্থিক জোত বলিলে কি বোঝা যায় সেই সম্পর্কে বহু বিভিন্ন ধারণা

প্রচলিত আছে। কিটিঞ্জ (Keatinge) বলেন 'যে জোত হইতে উৎপাদন করিয়া সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাইয়া চাষী নিজেকে এবং পরিবারকে মোটামুটি আরামে রাখিতে পারে', তাহাই আর্থিক জোত। ডাঃ ম্যান (Dr. Mann) বলেন যে, 'আর্থিক জোত হইল একটি গড় আয়তনের চাষী পরিবার যাহা হইতে নিম্নতম ন্যায্য জীবনযাত্রার মান পাইতে পারে।' ষ্ট্যান্‌লি জেভনস্ বলেন যে, আর্থিক জোত হইতে হইলে 'ন্যায্য' বা 'মোটামুটি' হইলে চলিবে না, উহা দ্বারা চাষী 'উন্নত' জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পারে।

কাহাকে বলে

এই সকলই হইল ক্ষুদ্র চাষীর হাতে জমি রাখার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি-ভিত্তিক চাষ প্রথা মানিয়া আলোচনা করা। কিন্তু আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, সেচ, গো-পালন, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি সকল কিছু অনুযায়ী যতখানি জমি হইলে সর্বনিম্ন ব্যয়ে একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক বাড়ান যায় সেই হিসাবেই আর্থিক জোতের পরিমাপ বাঞ্ছনীয়। এই অনুযায়ী আর্থিক জোতের হিসাব করিলে ব্যক্তিভিত্তিক চাষ ও জমিদারী বাধানিষেধের বাহিরে সমবায় চাষ এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ সকল কিছুকে ধারণার মধ্যে আনা দরকার।

পরিকল্পনা কমিশন এক একটি গ্রামে একটি বা দুইটি সমবায় সমিতির ভিত্তিতে ১০০০ একর বা ১৫০০ একর জমিকে আর্থিক জোত হিসাবে হিসাব করিয়া সেই ভাবে কৃষি রূপান্তরের চেষ্টা করিলেই ভাল করিতেন। তাহা না করিয়া "পারিবারিক জোত" (family holding) নামে একটি নূতন ধারণা প্রচলন করিয়াছেন১। ভূমিসংস্কার প্যানেলের একটি কমিটী পারিবারিক জোতকে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, যে পরিমাণ জমি হইতে ফসল ফলাইয়া বাৎসরিক স্থূল ১৬০০ টাকা বা নীট ১২০০ টাকা পাওয়া যায় (পারিবারিক শ্রমের পাওনা ইহার মধ্যে যোগ করিয়া) এবং একটি লাঙলের পূর্ণ ব্যবহার হয় তাহাই পারিবারিক জোত।

পারিবারিক জোত কাহাকে বলে

আর্থিক বা পারিবারিক জোতের আয়তন স্থির করার সময়ে বহু বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সকল জমির উর্বরতা সমান নয়, জলসেচের সুবিধা

* *Draft outline Second Five Year Plan* P. 77.

সমান নাই, কিরূপ যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে, নিজের ভোগের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন হইতেছে, বাজার হইতে দূরত্ব কি, চাষী নিজে মালিক বা জমিদারকে ফসলের অংশ দিয়া চাষ করে, সেই অংশ কতখানি, মজুরের দাম কি, তাহাদের দক্ষতা কি এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় কিরূপ,—এই সকল ও আরও বহু বিষয় মনে রাখিয়া এইরূপ আর্থিক বা পারিবারিক জোত হিসাব করা দরকার।

প্রতিকারের চেষ্টা (Remedies & attempts)

খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূর করিয়া কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সকল জমি রাষ্ট্রের অধীনে লইয়া আসিয়া বড় বড় কৃষি ফার্ম স্থাপন করিয়া কৃষিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটান-ই এই সকল দোষ ত্রুটি দূর করার একমাত্র উপায়। তাহার জন্য কোন প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রকে ব্যক্তিক্ষেত্রের অধীনে রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৃহৎ অংশে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র চলিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য সম্ভব হয় না এবং শিল্প ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই কথা জানা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ছোট ছোট সংস্কারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা ইহার ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছে এবং প্রায় সকল ব্যবস্থাই বিফল হইয়াছে অথবা খুব সীমাবদ্ধ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

সত্য প্রতিকার রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সমাজতান্ত্রিক কৃষি ফার্ম

সংস্কারের প্রচেষ্টা ইংরাজ শাসনের আমল হইতেই সুরু হইয়াছে। ১৯২১ সালে পাঞ্জাবে মিঃ ক্যালভার্ট প্রথমে সমবায় সংহতি সমিতির মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে খণ্ডীকৃত ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতির (voluntary consolidation of holdings) জন্য আইন পাশ করেন। ইহা তেমন কার্যকরী না হওয়ায় কিছুটা বাধ্যতামূলক করিয়া মধ্যপ্রদেশে ১৯২৮ সালে আইন রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাঞ্জাবে ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাব জোতের সংহতি আইন Punjub Consolidation of Holdings Act) পাশ হয়। যদি ভূস্বামীদের ⅔ অংশ, যাহারা কমপক্ষে গ্রামের ¾ অংশ জমির মালিক, এইরূপ সংহতি চান তবে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু ভূস্বামীদের বাধা দিবার

স্বাধীনতার পূর্বে

ক্ষমতা থাকিবে না, আইনে এইরূপ বলা হইল। অনেক জিলায় সংহতি অফিসার (consolidation officers) নিযুক্ত হইল।

১৯৪৭ সালে বোম্বাই রাজ্যে বাধ্যতামূলক সংহতি আইন পাশ হইল; ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবে এইরূপ আইন গৃহীত হইল। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ সংহতি হইয়াছে, তাহা হইল: বোম্বাই রাজ্যে ২১ লক্ষ একর (১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে পর্যন্ত), পাঞ্জাব ৪৮ লক্ষ একর, পেপসুতে ১৩·৩ লক্ষ একর দিল্লীতে ২ লক্ষ একর এবং যুক্তপ্রদেশে ৪৩·৮ লক্ষ একর। অন্যান্য রাজ্যে এই বিষয়ে কিছুই অগ্রসর হয় নাই বলিলে ভুল হইবে না, কেবলমাত্র সমাজোন্নয়ন এলাকাসমূহে এই বিষয় কিছুটা চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে আরও খণ্ডীকরণ না হয়, এই জন্য অনেক রাজ্যে (যেমন বোম্বাই, পাঞ্জাব, পেপসু ও যুক্তপ্রদেশ) নিম্নতম জোতের আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া উহা আর হ্রাস পাইতে পারিবে না এইরূপ আইন করা হইয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, উত্তরাধিকার আইন না পাল্টাইলে নূতন খণ্ডীকরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। অনেক রাজ্যে (মধ্যভারত, হায়দরাবাদ এবং হিমাচলপ্রদেশে) অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল আইন সত্ত্বেও জমিদারদের বিরোধিতায় এবং ব্যক্তিগত চাষপ্রথার উপর জোর দেওয়ার ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার ত্রুটি দূর করা যায় নাই।

স্বাধীনতার পরে

সমবায় চাষ কাহাকে বলে (What is Cooperative farming)

নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থকে একত্র করিয়া সংঘবদ্ধভাবে সাধারণ স্বার্থের সহিত জড়িত কাজকর্ম করাকে সমবায় পদ্ধতি বলে। বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্রামের চাষীরা একত্র হইয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে পারে। শস্য বিক্রয়, সার ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। এই সকল সমিতিকে অনেক সময় সেবা-সমবায় (Service-cooperatives) বলে। কৃষি উৎপাদনের বা জীবন-ধারণের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিকে আমরা একত্রে কাজ করিব—এইরূপ সম্মিলনী মনোভাব লইয়া এই সকল সেবা-সমবায় গঠিত হইয়া থাকে।

সমবায় সেবা সমিতি

যদি তাহাদের মধ্যে সমবায়ী মনোবৃত্তি ও অভ্যাস আর একটু গভীর

হয়, তবে তাহারা সমবায়ী কাজকে আরও এক উন্নত স্তরে লইয়া যাইতে পারে। কৃষি উৎপাদনের প্রায় সকল কাজই সমবেতভাবে করা হয় এইরূপ হইলে তাহাকে সমবায় যুক্ত চাষ (Cooperative joint farming) বলে। বিভিন্ন জমিখণ্ডের সীমানারেখা ভাঙিয়া দিয়া সকল জমিকে একত্রে মিলাইয়া, উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারাকে ছোট ছোট অংশ ভাগ করিয়া নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটাইয়া, সেচ দেওয়া, বীজ বোনা, ক্ষেত নিড়ানো, ফসল কাটা, শস্যকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করা (Processing), বিক্রয় করা— সকল কাজই নিজেদের সমিতির তত্ত্বাবধানে নিজেরা করা—ইহাই সমবায়-চাষ। সমিতির নিয়ম হইল যে, সভ্যরা কাজের জন্য মজুরি পাইবে এবং বৎসরের শেষে জমির পরিমাণ অনুযায়ী লাভের অংশ পাইবে। যে কোন সভ্য এইরূপ সমিতিতে ইচ্ছামত যোগদান করিতে পারিবে এবং খুসীমত নিজের জমি লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।

সমবায় যুক্ত চাষ বা সমবায় চাষ

সমবায় চাষের সমাজতান্ত্রিক রূপ একটু অন্যপ্রকার। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির মালিকানা রাষ্ট্রের, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে চাষ করা ও সেই চাষ পরিচালনা করার দায়িত্ব সেই অঞ্চলের চাষীদের লইয়া গঠিত যৌথ-খামার সমিতির উপর (Collective farm society)। এইরূপ ব্যবস্থায় কে কি পরিমাণ জমির মালিক ছিল সেই অনুযায়ী তাহাদের প্রাপ্য নির্ধারিত হয় না, তাহাদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক অথবা যৌথ-খামার কর্তৃক তাহা স্থির হয়। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অবসান হয়, অবশ্য চাষী নিজের ঘরবাড়ি এবং শাকসব্জীর বাগানের উপযোগী জমি নিশ্চয় রাখিতে পারে। যতটুকু জমি সে অবসর সময়ে নিজের পরিশ্রমে, অপরের শ্রম ভাড়া না করিয়া চাষ করিতে পারে, ততটুকু তাহাকে রাখিবার অধিকার দেওয়া হয় ; সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সে পুত্রকন্যাকে বণ্টন করিয়া দিতে পারে ; রাষ্ট্র, যৌথ-খামার বা অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে, কিন্তু তাহাকে উৎপাদনের উপায় (means of Production) হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা থাকে না, অপরের শ্রম ভাড়াতে খাটাইয়া সেই সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত আয় বাড়াইবার পথ খোলা থাকে না।

যৌথ চাষ বা যৌথ-খামার সমিতি

আর একরূপ সমবায় পদ্ধতির কথা প্রচারিত হইতেছে তাহাকে বলা হয় সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Cooperative Village Management)। এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকল জমি একত্রে মিলাইয়া উহার পরিচালনা গ্রাম্য সমিতি সমূহ পঞ্চায়েৎ বা গ্রামসভার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই গ্রাম পরিচালক অধিবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং ইহার উপর উৎপাদন ও গ্রাম-জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দায়িত্ব ন্যস্ত যেমন, কি ফসল কোন জমিতে উৎপন্ন হইবে, ফসল ঘোরানোর (Crop-rotation) ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কোথা হইতে টাকা, উন্নত ধরণের বীজ সার যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে, কোন শ্রমিক কোথায় কাজ করিবে, আনুষঙ্গিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে। সমগ্র গ্রামকে একই ফার্মের মত চাষ করা যাইতে পারে, অথবা কয়েকটি সুবিধামত ব্লকে ভাগ করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত কোন পরিবারকে বা কয়েকটি পরিবারকে এক একটি ব্লক ভাগ করিয়া দেওয়া চলে, স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা স্থির করা হয়। গাঁয়ের পতিত জমি, পুকুর, মেছোঘেরী, বনজঙ্গল এবং ছোটখাট জলসেচ ব্যবস্থা সবই পঞ্চায়েৎ বা গ্রামসভার পরিচালনায় আসিবে।

সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা

সমবায় চাষ সমিতি হইতে চাষী যেরূপ জমি লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থায় তাহা পারে না, সেইদিক হইতে ইহা যৌথ-খামার প্রথার ন্যায়। কিন্তু যৌথ খামারের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর উৎপাদনের লক্ষ্য, উৎপাদন পদ্ধতি, এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি সমবায় গ্রাম পরিচালনার কাঠামোতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা রহিল বটে, কিন্তু তাহার রূপ পৃথক হইয়া গেল। মোট জমির এক অংশের উপর জমির মালিকের মালিকানা আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জমিখণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ মালিকানা আর রহিল না। যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর শেয়ারের মত, কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র বা জিনিসের উপর শেয়ার ক্রেতার প্রত্যক্ষ মালিকানা নাই, কিন্তু কোম্পানীর মোট সম্পত্তির উপর একটি অংশ তাহার আছে। এই প্রথা দুইটি বিশেষ নীতি মানিয়া চলে এবং তাহার ফলে ভারতীয় বিশেষ অবস্থার সহিত খাপ খায় বলিয়া মনে করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমান উত্তরাধিকার—এই দুইটি নীতি এই ব্যবস্থায় বহাল থাকে। ইহাতে জমির শেয়ার পুত্রকলত্রের মধ্যে বিভক্ত

অন্যান্য প্রকার সমবায়ের সহিত ইহার তুলনা

হইতে পারে, কিন্তু চাষের জোত খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ হইতে থাকে না। যাহারা জমিতে কাজ করে তাহারা মজুরি পায় এবং মালিকেরা জমির মালিকানা অনুযায়ী লভ্যাংশ পাইতে থাকে।

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা আছে বলিয়া মনে করা হয়। বৃহৎ মাত্রায় কৃষি উৎপাদনের সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায়, একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাঁয়ের পতিত জমি উদ্ধার হয়। ফসল-পরিকল্পনা (Crop Planning) বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয়। পূর্ণ বেকারি মরসুমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর হওয়া সম্ভব হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমতা আসে এবং বৈষম্য দূর হয় বলিয়া মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাম-শাসন পরিচালিত হয় এবং সকলে সমান স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়—এরূপ বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-বিরোধ দূর হইয়া গ্রামের জীবনে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আসে—এমনও মনে করা চলে। চতুর্থতঃ, ভারতে গ্রামসভা বা পঞ্চায়েৎ-এর হাতে গ্রামশাসন বা রাজস্ব আদায়ের ভার বহু পূর্বকাল হইতেই ছিল, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য বা কীর্তি রক্ষা করাও এই পথে সম্ভব হইয়া উঠিবে।

সুবিধা

ইহার বহু অসুবিধার কথাও অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমাদের গ্রামাঞ্চল এত বড় বিপ্লব গ্রহণ ও ধারণের উপযোগী হইয়া উঠে নাই, জমির তুলনায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বেকার হইয়া পড়িবে, ব্যক্তিভিত্তিক চাষ-প্রথা না থাকায় উৎসাহ ও প্রেরণা অবলুপ্ত হইবে, এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাইবার মত শিক্ষা-দীক্ষার অভাব আছে —এই সকল ত্রুটি ও অসুবিধার কথাও বলা হইয়া থাকে। পরিকল্পনা কমিশন তাই এই ব্যবস্থা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া স্তরে স্তরে গড়িয়া তোলার পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথমে পতিত জমি, পরে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে দেওয়া জমি, ভূদান-যজ্ঞে পাওয়া জমি, ক্রমে ক্রমে যাহারা উপযুক্ত চাষ করিতে পারে না সেই অনুপযুক্ত চাষীর জমি, যদি গ্রামের চাষীদের সংখ্যাধিক অংশ রাজী থাকে তবে বাধ্যতামূলক ভাবে সংখ্যালঘু অংশের জমি—এইরূপে পঞ্চায়েৎ-এর হাতে জমির পরিমাণ বাড়াইয়া এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পাকা করিয়া তোলার কথা পরিকল্পনা কমিশন বলিতেছেন। তাঁহারা এই ব্যবস্থাকেই ভবিষ্যৎ ভারতের সমাজ-

অসুবিধা ও ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য

তান্ত্রিক গ্রামীণ ও কৃষি-সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনও এই চিত্র গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমে সেবা-সমবায়, ক্রমে সমবায় চাষ এবং সর্বশেষে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা—ইহাই কৃষি-কাঠামো ও গ্রাম-জীবন রূপান্তরনের স্তরক্রম হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

আপাত দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবে ইহা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, উন্নত স্তরের গ্রামজীবন এবং সারাদেশের অর্থনৈতিক দেহে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে মাত্র। সদিচ্ছা প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলেই কোন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে না, বাস্তব অবস্থাপ্রসূত অর্থনৈতিক নিয়মের তাগিদেই উহার উপযোগী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইতে থাকে। বহুপুরুষ চাষীদের নিকট হইতে যতটা সম্ভব খাজনা আদায় করিয়া সেই অর্থে সহরে বা গ্রামে আরামে যে সকল জমিদার কাল কাটাইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ অপসারণ না করায় এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে —এই কথা স্পষ্ট জানিয়া রাখা দরকার। যাহারা প্রকৃত চাষ করে না তাহাদের "চাষী" বলিয়া ধরা হইয়াছে, প্রজা উচ্ছেদ করিয়া তাহারা জমি খাসে লইয়া আসিবার সুযোগ পাইয়াছে, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই পুরানো প্রজাদেরই মজুর হিসাবে খাটাইতে পারিতেছে, বেনামী করিয়া পূর্ণ বা প্রায়-পূর্ণ জমিদারী রক্ষা করিতে পারিতেছে—এই চিত্রই বাস্তব, তাহাতে ভুল নাই। এই অবস্থায় সমবায় গ্রাম্য ব্যবস্থাতে অনুপস্থিত মালিকদের জমি গ্রামের চাষী চাষ করিবে এবং নিছক মালিকানা-সত্ত্বের জোরে সহরে বা গ্রামে বসিয়া জমিদার ও জোতদারেরা তাহার ফল-ভোগ করিবে। গ্রামের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে জমিদারেরা মোটেই বিচ্যুত হয় নাই, পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে কাহারা প্রভুত্ব করিবে? যৌথ মূলধনী ব্যবসাতে কি বেশীর ভাগ শেয়ার যাহাদের হাতে তাহারাই প্রভুত্ব করে না? মালিক অনুপস্থিত থাকিয়াও মালিকানার জোরে মজুরকে শোষণ করে—এই ধনতান্ত্রিক নীতিই এই পরিকল্পনার ভিত্তি। সামন্ততান্ত্রিক মহালওয়ারী

কেন এই ব্যবস্থা বিফল হইবেই

বন্দোবস্ত এবং মজুরের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক চাষ, উভয়ের সংমিশ্রণে কখনই সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামো গড়িয়া উঠে না।

সমাজতান্ত্রিক কৃষি-কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে কি অবস্থায়? যদি জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র ততটুকু থাকে যে অপরের সাহায্যে উহা চাষ করা যায় না এবং গ্রামের বেশির ভাগ জমিই কেবলমাত্র প্রকৃত চাষী লইয়া গঠিত সমবায় সমিতির হাতে থাকে। একমাত্র তাহা হইলেই প্রকৃত সমাজ-তান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার মত অর্থনৈতিক নিয়মের কার্যকারিতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা সংগঠনের পরিকল্পনায় সেইরূপ কিছুই দেখা যায় না।২৬ *

সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামোর রূপ ও উহা গঠনের উপযোগী বাস্তব অবস্থা কি

সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে তখনই যদি গ্রামে দ্রুত কৃষি উন্নয়ন ঘটাইবার উপযোগী নেতৃত্বের উদ্ভব হয় এবং সেই নেতৃত্ব যদি কৃষি সমাজের পরিবর্তন হইতেই সঞ্জাত হইয়া সেই পরিবর্তনকে ধারণ, বাহন এবং চালন করার শক্তি নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে। তাই সমাজতান্ত্রিক গ্রাম-নেতৃত্ব সৃষ্টি হইতে পারে সেই স্তর হইতে হইতে যাহারা প্রকৃত চাষ করে, এবং সর্বনিম্ন স্তরের চাষীদের অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষি মজুর এবং ভাগচাষীদের মধ্য হইতে। তাহারাই বর্তমানে সর্বাধিক শোষিত বলিয়া এবং চাষের কাজের খুঁটিনাটি জানেন বলিয়া, সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামোতে সর্বাপেক্ষা লাভবান ও গতিশীল শ্রেণী—তাই কৃষিসংস্কারের মধ্য হইতে ইঁহাদেরই পরিবর্তনের এবং নূতন কাঠামোর নেতৃত্ব লইয়া আগাইয়া আসার কথা। ভারতের ভূমিসত্ত্ব সংস্কার বা সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার পরিকল্পনায় এইরূপ নেতৃত্ব উদ্ভব হইবার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে কি না, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহাদের সার্থকতা বিচার করিতে হইবে।

ভারতের সমবায় চাষ প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব (Proposal of introducing Cooperative Farming in India)

চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষির যন্ত্রীকরণ ও

* শিল্পক্ষেত্রেও ইহা সত্য; তাই একমাত্র শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বেও পরিচালনাতেই সমাজ-তান্ত্রিক শিল্পকাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে—শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপিত হইলে তাই ইহা সমাজতন্ত্র নয়।

আধুনিকতম উপায়ে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার। এই উপায়ে চাষের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকই হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত জোত ও উহার অসম্বদ্ধতা। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ভারতে সমবায় চাষ প্রথা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব করা হইতেছে। সমবায় চাষ ব্যবস্থার বিকল্প হইল দুইটি (ক) সকল জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইয়া যৌথ খামার ব্যবস্থা গঠন করা, এবং (খ) বড় বড় জমিদারেরা মজুর খাটাইয়া বৃহৎ মাত্রায় চাষ করিয়া কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ করা। কিন্তু পূর্ণ সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ ধনতন্ত্র—উভয় ব্যবস্থার ত্রুটি থাকায় মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন অনুযায়ী সমবায় চাষ প্রথা গড়িয়া তোলার কথা বলা হইতেছে *।

প্রস্তাব

সমবায় চাষের উপকারিতা অনেক। কৃষিজোতের আয়তন বড় হওয়ার ফলে বৃহৎমাত্রায় চাষের সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইবে—ব্যক্তিগত চাষীর তুলনায় সমবায় সমিতি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে। বেশী আর্থিক সঙ্গতি থাকিলে ভাল যন্ত্রপাতি, এমন কি ট্রাক্টর পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারিবে, উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহার করা সম্ভব হইবে, জলসেচ ব্যবস্থার উন্নত করা সম্ভব হইবে, বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর হইবে, কম শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে, সরকারী কৃষিদপ্তর হইতে উপকরণ ও শিক্ষাদীক্ষার সাহায্য পাওয়া খুবই সহজ হইয়া উঠিবে, মরসুমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর করার উপযুক্ত কুটির

উপকারিতা

* যেন নিজেদের ইচ্ছাতেই তাহারা গ্রামাঞ্চলে নূতন উৎপাদন প্রথা তৈয়ারি করিতে পারে না। এতদিন ব্যক্তিভিত্তিক চাষের উপরই জোর দেওয়া হইত, কিন্তু খাদ্যের অভাব হওয়ায় এবং কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায়, শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হইয়াছে, তাই কৃষকের আয় বাড়ান দরকার হইয়া পড়িয়াছে; নূতন অবস্থার চাপে নূতন ব্যবস্থা তৈয়ারীর কথা হইতেছে। নাগপুর কংগ্রেসের ডাক (The call of the Nagpur Congress) বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইতেছে, "The congress has come to the conclusions that are embodied in the resolution on the agrarian pattern not on any theoritical doctrinaire or a priori considerations. It is the fact of life, the pressures of a democratic revolution which have driven the congress, stage by stage, to the realisation that nothing short of *some* radical changes in the current agrarian pattern would meet needs of the new age that is *upon* us. A. I. C. C. **Economic Review** Feb. 1. 1959. P. 5.

ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি ও ফাঁকগুলি দূর হইবে, খাদ্য ও ফসল লইয়া মজুতদারির অবসান ঘটিবে। গ্রামের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের অচলায়তন ভাঙিয়া নূতন ও উন্নত জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠিত হইবে *।

সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধাগুলিও দেশে আলোচিত হইতেছে। বলা হইতেছে, চাষীদের মধ্যে সাধারণ উদ্যমহীনতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব প্রবল। সমবায়ী জীবনযাত্রার পুরাতন প্রতিষ্ঠান-সমূহ, যেমন পঞ্চায়েৎ ও যৌথ পরিবার প্রভৃতি ভাঙিয়া গিয়াছে, সমবায়ী মনোভাব আর ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালক ও নেতার অভাব, মূলধনের অভাব, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির অভাব, প্রভৃতির কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বোপরি বলা হইতেছে,কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারির আবরণ উন্মোচিত হইয়া শ্রমের খোলা বাজারে বেকারের সংখ্যা খুবই বাড়িয়া যাইবে।

অসুবিধা

এই সকল অসুবিধার কথা মনে করিয়াই প্রথমেই সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া তোলার কথা তোলা হইতেছে না। প্রথমে চাষ ছাড়া কৃষি উৎপাদনের বা জীবন-যাপনের অন্যান্য দিকে সেবা-সমবায় গঠন করার (Service Cooperatives) প্রচেষ্টা করা হইবে বলা হইতেছে। তিন বৎসরের মধ্যে এই প্রচেষ্টা শেষ করিতে হইবে। গ্রামে সমবায়ী মনোভাব, অভ্যাস ও নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিলে সমবায়

ধীরে ধীরে

* In Soviet Russia, in Mexico, in Palestine, the Cooperative farming has been effective in introducing the more advanced farming methods into the former backward rural areas. By pooling of resources, peasants have availed themselves of the advantages of large-scale farming and have thereby increased production and raised the standard of living. These Cooperatives have brought medical care, improvement in diet and more decent and sanitary housing to the people who formerly lived in dirt and squalor, suffering from malnutrition or other diseases of poverty. Destitute farm folk as full-fledged members of a cooperative group, have acquired for the first time in in their lives, a sense of economic and social security. In fostering participation in the arts, literature and social progress, this system, has finally helped to redress the most distressing evil of rural existence, the idiocy of village life".—*Henrik F. Infield*—**Cooperative Communities at work.**

চাষ সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। সর্বশেষ স্তরে, সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের হাতে গ্রামের সকল জমির ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।*

স্বাধীনতার পরে প্রথমে যুক্তপ্রদেশের ঝাঁসী জিলায় সমবায় চাষের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ক্রমে যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য জিলায়, বোম্বাই, পাঞ্জাব দিল্লীতে ও পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি সমবায় চাষ সমিতি স্থাপিত হয়। বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, যেখানে সম্ভাবনা ও প্রয়োজন দেখা দিবে সেখানেই সমবায় চাষ সমিতি স্থাপন করার জন্য রাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরকে সক্রিয় ও উৎসাহী হইতে হইবে। ১৯৫৩ সালে সরকার সকল রাজ্যের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহে বলা হয় যে, রাজ্য সরকার যখন কোন সমবায় চাষ সমিতি স্থাপনের জন্য এলাকা স্থির করিবে তখন যেন সেই সকল এলাকার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়, যেখানে ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা বেশি, উদ্ধারকৃত জমি (reclaimed land) পাওয়া যায়,

ভারতে সমবায় চাষ

---

* ১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব।

"The congress, having considered the Report of the Agricultural Production Sub-Committee, records its general approval of the Report and endorses the recommendations made therein. In particular, the congress is of opinion that—

1. The organisation of the village should be based on village panchayats and village Cooperatives both of which should have adequate powers and resources to discharge the functions allotted to them.······

2. The future agrarian pattern should be that of cooperative joint farming in which the land will be pooled for joint cultivation, the farmers continuing to retain their property rights, and getting a share from the net produce in proportion to their land. Further those who actually work on the land whether they own the land or not, will get a share in proportion to the work put in by them on the joint farm.

As a first step, prior to the institution of joint farming, service cooperatives should be organised throughout the country. This stage should be completed within a period of three years. Even within this period, however, where-ever possible and generally agreed to by the farmers, joint cultivation may be started.—*Nagpur Congress* 1959 ; **Resolution on Agrarian Organisational Pattern.**

সমবায়ী কোন না কোন সংগঠন আছে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাও কিছুটা আছে। আরও বলা হয় যে, সমবায় চাষ ব্যবস্থার প্রসার যেন ধীরে ধীরে হয় এবং অনিচ্ছুক চাষীদের যেন কোন মতেই বাধ্য করা না হয়। ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমবায় চাষ সমিতি গঠন করায় উৎসাহ দেওয়া হয় এবং সাহায্য করার জন্য কিছু কিছু উপদেশ দেওয়া হয়। ভারতীয় অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া সমবায় চাষ পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা বিশ্লেষণ করার জন্যও বলা হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে কিছুই বিশেষ করা হয় নাই। ফলে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া যে সমবায় সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, তাহারা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছিল *।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ১০ বৎসরের মধ্যে দেশের জমির একটি বৃহৎ অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ সুরু করা দরকার। কিন্তু রাজ্যসরকারসমূহ এই বিষয়ে এখনও বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। ১৯৫৭ সালের মে মাসের শেষে ১৩৯৭টি সমবায় চাষ সমিতি ভারতে ছিল। ইহাদের উপযুক্ত প্রসার ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া

---

* যেমন বর্ধমান সহরের অদূরে সড্যা গ্রামের সমবায় চাষ সমিতির অবস্থা হইয়াছিল। এই সমবায় চাষ সমিতি রাজ্য সমবায় দপ্তর কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত ও বহু মেডেল ইত্যাদি পাইয়াছে। কয়েকজন উৎসাহী চাষী মিলিয়া গরু লাঙল বিক্রয় করিয়া দিয়া পাশাপাশি অবস্থিত নিজেদের জমি একত্র করিয়া একসঙ্গে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ সুরু করিয়াছিল। কোন বর্ণগত প্রভেদ বা সম্পত্তিগত পার্থক্য ইহাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল না। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু বহু বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় এই সমিতি এখন ভাঙ্গিবার মুখে। কোন দলাদলি, অশিক্ষা বা উৎসাহহীনতার জন্য নহে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো অনুরূপ থাকিলে দ্বীপের মত বিচ্ছিন্নভাবে সমবায় চাষ সমিতিগুলি বাঁচিয়া থাকিতে বা উন্নতি করিতে পারে না—ইহা তাহারই প্রমাণ, যেমন গরু বেচিয়া ট্রাক্টর কেনা হইল। ট্রাক্টরের জন্য রোজই তেল চাই, গরুর খাদ্য গ্রামের মধ্যেই জুটিত বা খড় খাওয়ান চলিত। সহরে ফসল বেচা বা অন্যান্য কাজে গরুর সাহায্যে পরিবহনের ব্যবস্থা হইয়া যাইত, ট্রাক্টরের সাহায্যে তাহা হইতে পারে না। গরুর সাহায্যে জ্বালানি সার উভয়ই কিছুটা পাওয়া যাইত, ট্রাক্টরের সাহায্যে তাহা পাওয়া যাইতেছে না। সমগ্র দেশ অনুন্নত উৎপাদন কাঠামো ও নিয়মাধীন থাকিলে ক্ষুদ্র অঞ্চলে একক প্রচেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক বা সমবায়ী প্রচেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না। উৎপাদনের দুই ধরণের নিয়মে সংঘর্ষ বাধে; দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র ব্যক্তিভিত্তিক চাষের নিয়মাধীন থাকায় উহাই অবশেষে জয়ী হয়। খণ্ড ছিন্ন এবং পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি এই কারণেই সফল হইতে পারে না, সম্ভবও নয়।

উচিত, কমিশন পরিকল্পনা তাহাও বলিয়াছিলেন। ইহাদের কাজকর্ম কিরূপ চলিতেছে সেই সম্পর্কে তথ্য পাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের ২২টি সমবায় চাষ সমিতি সম্পর্কে নমুনা অনুসন্ধানের কাজও শেষ হইয়াছে।

এই ২২টি সমবায় চাষ সমিতির কাজকর্ম ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া পরিকল্পনা কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমবায় চাষ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইতেছে, এই সকল সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া তুলিয়াছে অনুপস্থিত মালিকেরা এবং ভূমিসত্ব আইনের প্রয়োগ ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে। ইহাদের মধ্যে প্রায় কেহই কৃষির উৎপাদনগত কাজকর্ম করে না, করিলেও পরিচালনার কাজের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, ভাড়াটে কৃষিমজুর দিয়া কাজ চালান হয়। ভাগচাষী ও প্রজাউচ্ছেদের যন্ত্র হিসাবে কাজ করায় এই সমবায় সমিতি-গুলি গরীব ও ছোটচাষীর সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। অথচ সমবায় দপ্তর হইতে ইহারা প্রচুর অর্থসাহায্য ও অন্যান্যরূপ সুবিধা পাইয়াছে। অনুপস্থিত ধনী মালিকেরা আরও ধনী হইয়াছে, গরীব চাষীদের দারিদ্র্য বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানের অসম্পূর্ণ ভূমিবিপ্লবের ভিত্তিতে সমবায় চাষ গড়িয়া তোলা কতখানি অসম্ভব, তাহা পরিকল্পনা কমিশনের এই রিপোর্টের ফলে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে।*

সমবায় চাষ সম্পর্কে চীন প্রত্যাগত ভারতীয় ডেলিগেশনের বিবরণ (Report of Indian Delegation to China on Cooperative Farming)

ভারতের সহিত প্রতিবেশী চীন দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা কয়েকবৎসর পূর্বেও প্রায় একরকমের ছিল।* আজ সেখানে সমবায় চাষ প্রথা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে।

* **Studies in Cooperative Farming.** Programme Evaluation organisation, *Planning Commission.*

* "Agricultural conditions in India and China are similar in several ways. Both the countries have had to maintain for thousands of years a dense population on a relatively limited supply of land. In both, arable land as capital is scarce and it is only labour which is relatively in plentiful supply. In both countries, the average farm is very small in size—in china it was even smaller than in India until recently and hence the emphasis has always been on increasing the yield per acre as much as possible. In both countries

চীনের কৃষি পদ্ধতি ও পরিবেশে কিরূপে এত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে সেই তথ্য আহরণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে দুইটি প্রতিনিধিদল চীনে পাঠাইয়াছিলেন। একটির উদ্দেশ্য ছিল চীনের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি ও কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং অপরটির উদ্দেশ্য ছিল চীনা কৃষি পরিকল্পনা ও উৎপাদনকৌশল (Agricultural Planning and techniques) সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা।

সমবায় চাষ প্রথা গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি দলের সংখ্যালঘু অংশ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, গণতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম বা চাপ সৃষ্টির পথে বড় চাষীদের উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং মাঝারি ও ছোট চাষীদের সমবায়ে সংঘবদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতীয় চাষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মমতা চীনা চাষীদের তুলনায় বেশি। তাঁহাদের মতে জাপানী পদ্ধতিতে পারিবারিক চাষ প্রথার সহিত সেবা-সমবায় যুক্ত করিলে কৃষির উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইবে।

প্রতিনিধি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারত ও চীনের অবস্থার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীনের মত ভারতেও সমবায়চাষ সংগঠন গড়িয়া তোলা ঐতিহাসিক কর্তব্য বলিলেই চলে। ডেলিগেশন সুপারিশ করিয়াছেন, আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক ৮০টি গ্রামে প্রায় ১০০০০ সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। বলা হইয়াছে, স্বেচ্ছামূলক সমবায়ের নীতি অবলম্বন করা দরকার, যখন খুসী কোন সভ্য বাহির হইয়া যাইতে পারিবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে হইবে। খুব বড় সমিতি স্থাপন

---

attempts have been made in recent years, especially after independence in India and after Liberation in china, for the development of agriculture through the methods of national Planning and the introduction of new techniques. In spite of these broad similarities there have been notable differences in emphasis in planning and in the application of techniques as well as in much of the historical background in these two countries. Under the Second Five Year Plan it was proposed to increase agricultural production by 18 per cent, but there is a strong feeling that this rate of increase was too low and proposals were under consideration for raising the target substantially. It was reported that china was planning a much higher rate of increase under a 12—Year programme for agricultural development"—*Report of the Indian Delegation to china on* **Agricultural Planning and Techniques P. 1.**

করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে আমলাতন্ত্র দেখা দিতে পারে*। জমির পরিমাণ অনুযায়ী সমিতির সভ্যরা মালিকানা লভ্যাংশ (Ownership dividend) পাইবেন।

চীনা সমবায় চাষ সমিতির সাফল্যের মূল কারণ দুইটি: (ক) অনুপস্থিত বড় চাষীদের মালিকানা-লভ্যাংশ দিবার নীতি বর্জিত হইয়াছে, ফলে ছোট চাষীদের এবং কৃষিমজুরদের মধ্য হইতেই গ্রাম নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। (খ) এক কোটির উপর সুসংগঠিত, পরিশ্রমী ও নির্লোভী দেশপ্রেমিক কর্মী আছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বড় চাষীর মালিকানা-সত্ব বজায় রাখিতে গিয়া তাহারা কৃষি বিপ্লবে কোন প্রতিবন্ধক আরোপ করে নাই; অহিংস পদ্ধতি বা জবরদস্তি দ্বারা চাষীদের উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই*। যাহারা প্রকৃত হাতে কলমে, ক্ষেতে ও মাঠে চাষের কাজ করে সমবায় সমিতি শুধু তাহাদেরই লইয়া গঠিত, উহার উন্নতির ফলভোগ শুধু তাহারাই করিবে। এই পথেই প্রকৃত কৃষি বিপ্লব সম্ভব। তাই স্বাধীনতার পরে ১৯টি সমবায় চাষ সমিতি লইয়া কৃষি সংস্কার সুরু হইযাছিল, ও ১৯৫৬ সালের মে মাসের শেষে এক কোটি সমবায় সমিতিতে চীনের ৯১% অধিবাসী কৃষি উৎপাদন বাড়াইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সংঘবদ্ধ হইয়াছে। খাদ্যাভাব দূর হইয়াছে, খাদ্য রপ্তানি করিয়া এবং সহরে পাঠাইয়া দ্রুত মূলধন-গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই মূলধন-গঠন চীনা কৃষিকেই ভবিষ্যতে যন্ত্র যোগান দিবে এবং উহার উন্নয়নের গতিবেগ আরও বহুদূর বাড়াইয়া দিবে।

সর্বোন্নত পারিবারিক জোত অথবা সর্বোন্নত সমবায়ী জোত

(Optimum Family Farm or optimum Cooperative Farm)

ছোট ছোট পাবিবারিক জোত ও সেবা-সমবায়ের নানাবিধ সাহায্য—

---

* রিপোর্টের ২৫-২৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন্-লাই-এর মতামত দেওয়া হইয়াছে।

* "There are writers on china who have spoken of the ruthlessness which might have marked the early phases of the new regime as a factor in the subsequent transformation from individual to cooperative cultivation. This may or may not be so, but we cannot comment on the suggestion from our own direct observations. But we should doubt if the effort and hard work which are now being put in by peasants could be attributed, to any appreciable extent to force, compulsion and the like.—"*Report* Page. 192. Section 11. 11 in—Published by Govt. of India, Ministry of Food and Agriculture.

এই দুই মিলিয়া সর্বোন্নত পারিবারিক জোত পাওয়া যাইবে এবং ভারতের পক্ষে ইহাই কল্যাণকর, আজকাল অনেকেই এইরূপ বলেন। হল্যাণ্ডে ও ডেনমার্কে ইহা সত্য হইতে পারে, কারণ জনসংখ্যার চাপ সেই সকল দেশে ভারতের ন্যায় এত বেশি নয়। শুধু তাহাই নহে, জমির গড় উৎপাদন ক্ষমতা আমাদের দেশে খুবই কম। উপরন্তু, সেবা-সমবায়ের সাহায্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা লাভ একান্তই স্বল্পকালীন সুবিধা—উহা দেশের স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হইতে পারে না। আর সেবা-সমবায়ের সুবিধা প্রধানতঃ বড় চাষীরাই পাইতে পারে।

অনেকে বলেন যে, ছোট জোতের ফলে প্রগাঢ়-চাষ সম্ভব হইবে এবং আবাদী জমির সহিত গরু, ঘোড়া বা মহিষের অনুপাত বেশি থাকায় (higher livestock ratio per unit of cultivated area) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ইহা সত্য নয়। ডাঃ অটো শিলার (Dr. Otto Schiller) দেখাইয়াছেন যে, জমি চাষের প্রগাঢ়তা (intensivity of exploiting land) ক্রমেই কমিয়া আসে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র জোতের ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশি সত্য।

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র জোতের অবস্থা আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, আধুনিক কালে ক্ষুদ্র জোত সম্পূর্ণ অচল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীতে ক্ষুদ্রজোতের মালিকগণ চাষের জীবজন্তু বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। ক্ষুদ্র জোতের নিয়মিত চাষ তাহারা ক্রমে বন্ধ করিয়া দিতেছে কারণ উহা হইতে পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় আয় হইতেছে না, কারখানায় কাজ খোঁজার উদ্দেশ্যে সহরে চলিয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া সুইডেন, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডেও এইরূপ ঘটিতেছে। ইহার কারণ দুইটি : (ক) সর্বোন্নত আয়তনের নীচে থাকায় ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধাও ইহারা পায় না, এবং (খ) সমগ্র পৃথিবীতে অন্যান্য সকল প্রকার জীবিকা হইতে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র জোত হইতে তত দ্রুত আয় বাড়ান যাইতেছে না। যদি উন্নত দেশগুলিতেই ক্ষুদ্র জোত হইতে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব না হয়, তবে অনাহারের স্তরে চাষ করে এইরূপ ভারতীয় চাষীকে ক্ষুদ্র জোতের চাষে আবদ্ধ রাখা উচিত, এই কথা কি করিয়া বলা হইতেছে তাহা বোঝা শক্ত।

বিদেশে ক্ষুদ্র জোতে এখনও যাহারা চাষ করে তাহারা প্রধানতঃ বেকার অথবা অন্যত্র কাজ করার অনুপযুক্ত। ফ্রান্স, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের অনুসন্ধান হইতে দেখা গিয়াছে যে, ক্ষুদ্র জোতই নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতার কারণ এবং ইহারই ফলে অপূর্ণ কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। জোত ক্ষুদ্র থাকার জন্যই নিম্ন-উৎপাদন ও নিম্ন-নিয়োগ পাশাপাশি চলে। প্রধানতঃ বৃদ্ধ এবং বিধবা মিলিয়াই ইউরোপের ক্ষুদ্র জোতগুলির চাষ হইতেছে। তাহাদের অর্ধেকের বেশিরভাগ রাষ্ট্র হইতে পেন্‌সন, বেকার ভাতা বা বার্ধক্য-সাহায্য পাইতেছে। অকৃষিগত কাজকর্ম হইতে আয়ই ক্ষুদ্র জোতের চাষীদের ক্ষেত্রে বেশি। জাপানে মোট ভূমি-পরিমাণের মাত্র ১৬% চাষ-যোগ্য, তাই ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা এত বেশি হইতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের একমাত্র উপায়ই হইল সমবায় চাষ এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বোন্নত সমবায়ী জোত (optimum cooperative farm) গঠন করা। একটি গ্রামকেই একটি ইউনিট ধরা ভাল, তবে গ্রামটি খুব বড় হইলে উহার মধ্যে দুই তিনটি সমবায় চাষ সমিতি থাকিতে পারে। সমবায়ী চাষের জোত কত বড় হইলে উহা সর্বোন্নত হইবে তাহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে; জমির গুণ, জলসেচ ব্যবস্থা, বাজারের দূরত্ব, কি শস্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং আরও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ। উহা তত বড় হওয়া দরকার, যাহাতে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি লাভ করিয়া উহাদের প্রতিটি বিষয়ের সর্বোন্নত স্তরে ফার্মটি থাকে। যেমন যন্ত্রজনিত, পরিচালনগত ও বাজারগত সর্বোন্নত স্তরে ফার্মটি যেন উন্নীত হয়। তাহাতেই সর্বাধিক দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার পাওয়া যাইতে পারে।

কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ (Mechanisation of Agriculture)

ভারতে কৃষি উৎপাদনে আধুনিক ধরণের যন্ত্র ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি প্রধানতঃ মূলধন-প্রগাঢ় নয়। প্রাচীন ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উৎপাদন হয় বলিয়া চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কম। আজকাল সকলেই জানেন যে, উন্নত ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ করিলেই উৎপাদন বাড়িতে পারে।

কৃষি পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ বলিলে বোঝা যায় পশুশক্তি বা মনুষ্যশক্তির পরিবর্তে কৃষিক্ষেত্রের শ্রমসাধ্য কাজগুলি যন্ত্রশক্তির সাহায্যে করা। কাঠের লাঙল ও গরু মহিষের বদলে ট্রাক্টরের (Tractor) ব্যবহার করা, বীজ বপন ও সার দেওয়ার কাজ একসঙ্গে করার জন্য কম্বাইন-ড্রিল (Combine-drill) ব্যবহার করা, ফসল কাটা ও ময়লা বা খোসা ছাড়াইবার জন্য হারভেষ্টার থ্রেসার (harvester-thresher) ব্যবহার করা, ফসল বিক্রয়ের জন্য গরুর গাড়ীর বদলে লরী ব্যবহার করা—ইহাই কৃষির যন্ত্রীকরণ। ফসল উৎপাদন ও বিক্রয়ের সকল কাজ প্রধানতঃ যন্ত্রের সাহায্যে করাকেই কৃষির যন্ত্রীকরণ বলে।

যন্ত্রীকরণ কাহাকে বলে

এই যন্ত্রীকরণের সুবিধা অনেক। উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পায়; মানুষের অপ্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে। অর্থনৈতিক দিক হইতে হইতে অপচয়মূলক বহু গরু মহিষ ভরণ পোষণ করার ব্যয় বাহুল্য বর্জন করা যায়। ফসলের রোগ বা কীট পতঙ্গ দেখা দিলে যন্ত্রের ব্যবহারে উহা রোধ করা সম্ভব হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের ও শ্রম বিভাগের ফলে বিশেষায়ণের উপকারিতা কৃষিতেও ভোগ করা যায়। একর-প্রতি মোট ব্যয় বাড়িলেও শস্যের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বা গড় ব্যয় হ্রাস পায়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে উহার প্রভাব সুদূর প্রসারী। কৃষির এইরূপ উন্নয়নের ফলে কৃষকের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, খাদ্যাভাব দূর হয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

যন্ত্রীকরণের সুপ্রভাব : কৃষির ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর

যন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন-প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে, ফলে বর্তমানের তুলনায় কম শ্রমিক দরকার হইবে এবং দেশে বেকারি বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি শ্রমিকের কৃষি ফার্মে নিযুক্ত থাকার দিনের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। যদি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এবং কৃষিজাত শস্যের চাহিদা উভয়ই বেশি থাকিত তবে কৃষির যন্ত্রীকরণে বেকারি দেখা দিত না। ভারতে চাষযোগ্য জমি আর বেশি নাই, ফসলের উৎপাদন বাড়িলে দাম দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই বর্তমান অবস্থায় যন্ত্রীকরণের প্রত্যক্ষ ফল হইবে গ্রামাঞ্চলে বেকারি। ইহাদের সকলকে শিল্পে নিয়োগ করার মত দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে না, আর তাহা ছাড়া

বর্তমান কাঠামো বজায় রাখিলে যন্ত্রীকরণের কুপ্রভাব: বেকারি বৃদ্ধি

ইহাদের শিল্পজ্ঞান, দক্ষতা ও যন্ত্র বিদ্যার স্তর খুব দ্রুত প্রসারমান বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়।

ইহা ছাড়া, যন্ত্রীকরণের কিছু কিছু বাস্তব অসুবিধার কথাও বলা হয়। ভারতে গড় জোতের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, যন্ত্রের ব্যবহার হইতে পারে বড় জোতে। ভারতের প্রচুর পরিমাণ গরু মহিষ উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িবে। বর্তমানে চাষীদের আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যেরূপ তাহাতে যন্ত্রীকরণের উপযুক্ত মূলধন নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, বর্তমানের জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাষ (Subsistence farming) ছাড়াইয়া বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম শস্যাদি উৎপাদন সুরু না হইলে যন্ত্রীকরণ করিয়া কি লাভ হইবে? আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা দরকার। ভারতে আবাদী জমির বেশির ভাগ এখন পর্যন্ত জলসিঞ্চিত হইয়া উঠে নাই, প্রকৃতির খেয়াল-খুসীর উপর যেখানে নির্ভরশীলতা এত বেশি, সেখানে এত প্রচুর বিনিয়োগ করিয়া যন্ত্র ব্যবহার করা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়ারই সামিল। উপরন্তু, এত ট্রাক্টর তৈয়ারি ও মেরামতির উপযুক্ত কারখানা ভারতে স্থাপিত নাই।

অন্যান্য অসুবিধা

ভারতের কৃষি অর্থনীতির অল্প একটু অংশে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে মজুর খাটাইয়া চাষ হয়। বিদেশী ও দেশী মালিক পরিচালিত বাগিচাগুলিও (plantations) অনেক সময় যন্ত্র ব্যবহার করে। রাষ্ট্র কিছু কিছু প্রদর্শনী ফার্ম খুলিয়াছে, সেখানেও যন্ত্রের ব্যবহার হয়। এই সকল বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এবং পতিত জমি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কিছু ট্রাক্টর ইত্যাদি বাহির হইতে আমদানি হইয়া আসিয়াছে। লোহার লাঙল, তৈল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ও কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত আরও বিভিন্নধরণের যন্ত্রপাতির পরিমাণ ভারতে কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সারা দেশের জমি ও চাষীর তুলনায় ইহা এত কম যে দেশের কৃষির গড় উৎপাদন ক্ষমতার কোনরূপ বৃদ্ধি তাহাতে হয় নাই।

খুবই সীমাবদ্ধক্ষেত্রে সামান্য যন্ত্রীকরণ ঘটিতেছে

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পতিত জমি উদ্ধার, জলসেচ, সার, বীজ, ঋণ, বিক্রয় প্রভৃতির উপর জোর দিয়া কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রধানতঃ এই সকল বিষয়েরই উপর প্রথম

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাস্তব অবস্থা তৈয়ারি ছিল না

পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে; যন্ত্রীকরণের কথা চিন্তা করা হয় নাই। বেকার সমস্যা দেখা দিবার ভয়ে এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নীতি সফল না হওয়ায় ঐ দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই, শ্রম প্রগাঢ় পদ্ধতিসমূহ অবলুপ্ত করার কথা বলা হয় নাই।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলা যায় যে সকল বাধা বিপত্তির কথা বলা হইতেছে তাহা ভারতবর্ষে কৃষি-কাঠামোকে নিশ্চল ধরিয়া লইলেই একমাত্র দেখা দিবে। স্থিতিশীল আলোচনা পদ্ধতির পরিবর্তে সামগ্রিক ক্রমবৃদ্ধির গতিশীল পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, যন্ত্রীকরণের সহিত কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানর প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া দিবে এইরূপ যন্ত্রীকরণ বর্তমান কৃষি-কাঠামোর মধ্যে কখনই সম্ভব নহে। ক্ষুদ্র জোত ও জীবনধারণের চাষ, কম মূলধনের প্রয়োগ ও আত্ম-ভোগকেন্দ্রিক কৃষি—এই ধরণের কৃষিকাঠামোকে উত্তরণ না করিলে যন্ত্রীকরণ কিছুতেই সম্ভব নহে। উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির পথে সামন্ততন্ত্রের এই পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারের অবসান ঘটান একান্তই প্রয়োজন।

বর্তমানে ভারত সরকারের কৃষি নীতি যে পথে চলিয়াছে তাহাতে যন্ত্রীকরণের সম্ভাবনা কতখানি তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান কৃষিসংস্কারের ধরণ অনুসারে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। জমিদার বা ধনী চাষীগণ বিভিন্ন নামে বা বেনামীতে প্রত্যেকে সেই সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত জমি রাখিতে পারিয়াছে, খুব অল্পই ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিলির জন্য রাষ্ট্র পাইয়াছে। এই সকল জমিদারগণ দীর্ঘকাল হইতেই মধ্যস্বত্বভোগী, গ্রামে অনুপস্থিত, নিজেরা কখনই চাষ করেন না, প্রজা বা মজুর দিয়া চাষ করান, শারীরিক পরিশ্রমের উর্ধে থাকিয়াই পদমর্যাদা অটুট রাখিতে চাহেন, কিন্তু ভূমিসংস্কারের আইনগুলিতে ইহাদেরই "চাষী" (cultivator) বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সকল বৃহৎ "চাষীরা" এবং গরীব ২ তিন একরের চাষীরা মিলিয়া সমবায় চাষ সমিতি গঠন করার কথা সরকার বলিতেছেন। এই সমবায় সমিতিতে বেশি জমির মালিকানা থাকায় বড় চাষীরাই বেশি লভ্যাংশ পাইবে, ফলে তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টাতে

বর্তমানে সেই বাস্তব অবস্থা তৈয়ারী হইতেছে ধনীদের হাতে প্রচুর জমি

সেই ধনীরাও আইনতঃ চাষী ও সমবায়ে যোগ-দানের অধিকারী

যন্ত্রীকরণ ঘটাইয়া লইবে। জমির মালিকানা যদি বাঁধিয়া দেয় তবে নির্দিষ্ট জমি হইতেই যথাসম্ভব অধিক আয় করিতে হইবে—উৎপাদনের এই মৌলিক নিয়মের কার্যকারিতা ভারতে শীঘ্রই সুরু হইয়া যাইবে। সমবায় চাষ সমিতির নামে তাই সমগ্র কৃষিকাঠামোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ মূলধনী কারবার গড়িয়া উঠিতেছে এবং এইরূপেই ধনতান্ত্রিক কৃষিকাঠামোর যন্ত্রীকরণের বাস্তব ভিত্তি রচিত হইতেছে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এই বাস্তব অবস্থার তাগিদে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইস্পাত লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় সস্তা ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের জন্য এই সকল বৃহৎ "চাষী"-রাই চাপ দিতে থাকিবে। সমাজতান্ত্রিক যৌথখামার স্থাপিত হইলে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কৃষি পরিকল্পনায় বেকারির সম্ভাবনা এড়াইয়া ধীরে ধীরে যন্ত্রীকরণ ঘটিত (যেমন, চীন); কিন্তু মুনাফা একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় বেসরকারীক্ষেত্রের কৃষিকার্যে অপরিকল্পিত যন্ত্রীকরণই ঘটিবে, কেবল বেকারি বৃদ্ধির সামাজিক ব্যয়ভার বাড়িবে আর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়-বৈষম্যের প্রশস্ত হইতে পরিধি থাকিবে।

সুতরাং ধনী চাষীর নেতৃত্বে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রীকরণ ঘটিবে

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চাষী ও মূলধন

Cultivator and Capital

চাষী ও ঋণ (Cultivator and credit)

কৃষির কলাকৌশলের কথা এবং ইহা যে এক বিশেষ ধাঁচের জীবনযাপন প্রণালী তাহা মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে প্রধানতঃ ইহা ব্যবসা,—উৎপাদন বিক্রয়, আয় বা মুনাফা লইয়াই ইহার ভিত্তি। সবল ব্যবসায়ের মত কৃষিকার্যেও মূলধনীদ্রব্য রক্ষা করা; অদলবদল করা ও উন্নত করা এবং চল্‌তি কাজকর্ম করার জন্য নগদ টাকা বা জিনিসপত্র, প্রভৃতি ঋণ করার প্রয়োজন আছে। জমিকে রক্ষা করা, উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় তৈয়ারী করা; ঘরবাড়ী নির্মাণ করা ও রক্ষা করা, জল, সার, বীজ, আইল ও বেড়ার বন্দোবস্ত করা, গরু ঘোড়া মহিষকে খাওয়ান, বাঁচান, আগাছা নিড়ান, অসুখ নিবারণ, চাষীর নিজের বা কর্মচারীদের ভরণপোষণ, উৎপন্ন শস্য মজুত করা, বিক্রীর ব্যবস্থা করা—সকল কাজই ছোট চাষীকে করিতে হয়[1] এবং তাহার জন্য প্রায়ই ঋণ করিতে হইতে পারে।

ঋণের দরকার

জীবনধারণের উপযোগী চাষের স্তর হইতে কৃষিকার্য ব্যবসার স্তরে যত উঠিতে থাকিবে, ততই দেশে এই কৃষিঋণের প্রয়োজন বাড়িতে থাকিবে। উহার প্রকৃতিও বদলাইতে থাকিবে, অনুৎপাদক ভোগোদ্দেশ্যী ঋণের পরিবর্তে উৎপাদক বিনিয়োগমুখী ঋণের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে।

পুরাণো একটি ফরাসী প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'ফাঁসির দড়ি যেমন আসামীকে, ঋণও তেমনি চাষীকে ঝুলাইয়া রাখে[2]। ভারতেও এইরূপ বলা হয় যে, সেই গ্রামই বাসের উপযুক্ত যেখানে প্রয়োজনে ঋণ পাইবার মত মহাজন, অসুখের সময় বৈদ্য, পূজা অর্চনার কাজে ব্রাহ্মণ এবং গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায় না এইরূপ একটি নদী আছে। কৃষিঋণ পাওয়া না গেলে সমস্যা তো বটেই, কিন্তু পাওয়া গেলেও উহা লইয়া সমস্যার শেষ নাই, কারণ অনেকক্ষেত্রে

চাষী ও ঋণের সম্পর্ক কি

---

১ অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ক্ষুদ্র চাষীদের দ্বারা জীবনধারণের স্তরোপযোগী চাষব্যবস্থা (subsistence farming) প্রচলিত থাকে. এবং ফলে কৃষিতে শ্রমবিভাগের প্রসার খুব কমই থাকে বলা চলে।

২ "Credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged."

এরূপভাবে ঋণ পাওয়া যায় যাহা উপকারের তুলনায় অপকারই বেশি করে। ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা দুইটি: প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কম এবং যে ভাবে ইহা পাওয়া যায় তাহা চাষীর পক্ষে বিপদজনক। স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটন তাই ঠিকই বলিয়াছেন, ভারতের উন্নয়নের প্রধান বাধাই হইল, শয়তানী টাকার শক্তি (power of evil finance)।

কারখানা শিল্পের সহিত কৃষিকার্যের পার্থক্য খুবই বেশি, তাই শিল্পঋণ-কাঠামো ও কৃষিঋণ কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ও কৃষিঋণের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব

এই পার্থক্যের মধ্যেই কৃষিঋণ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি নিহিত আছে। শিল্পসমূহ সহরে স্থাপিত এবং কেন্দ্রীভূত, কৃষিকার্য চলে গ্রামে এবং বিক্ষিপ্ত; কৃষিঋণ কাঠামোতে তাই সুসংগঠিত কোনরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উৎপাদনের ইউনিটই বড়, যৌথমূলধনী কারবারের রূপে গঠিত; ইহাদের মূলধনের প্রয়োজন হইলে শেয়ার বিক্রয় করিয়া বা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া পাওয়া সম্ভব। কৃষিকার্য অসংগঠিত ও ছোট ছোট, ব্যক্তির মালিকানাই প্রধান এবং বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তোলা সম্ভব নয়। বৃষ্টিপাত বা ভাল মরশুমের উপর ইহা অনেকাংশে নির্ভরশীল, তাই ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য পচনশীল, মজুত দ্রব্য হিসাবে উহাকে বন্ধকীর উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে না। কৃষি উৎপাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, সারা বৎসর ধরিয়া সমান তালে উৎপাদন হয় না। তাহা ছাড়া, কৃষক নিজে শস্যের দাম স্থির করিতে পারে না, দাম তাহার উপর চাপান হয়, তাহার আয় সীমাবদ্ধ, প্রায়ই লোকসান হয়। ইহাতে ঋণ দেওয়ার অসুবিধা[৩]। সর্বোপরি, জীবনধারণের স্তরোপযোগী কৃষিকার্য এমন ক্ষুদ্র চাষের ভিত্তিতে

---

৩. এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কৃষিঋণ যোগান দিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের টাকা শীঘ্র ফেরৎ চায় (quick turnover)। জমি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ দরকার, গরু বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যেও মাঝারিকালীন ঋণ প্রয়োজন—ইহারা সকলেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের বাহিরে। চাষীরা দুর্গম স্থানে এবং ছড়ান অবস্থায় থাকে; বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কর্মচারীরা তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখিতে পারে না।

চলে যে, ইহা কখনই বেশি পরিমাণ মূলধন আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং বেশির ভাগ ঋণই দরকার হয় চাষীর ভোগের উদ্দেশ্যে।

কৃষিঋণের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা দরকার। অর্থের অভাব এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা নয়, মূল কথা হইল, এই অর্থের দাম খুবই বেশি (ইহার সুদের হার এবং ইহার দরুণ মহাজনের নিকট চাষীর অন্যান্য ধরণের বশ্যতা)। অর্থের দাম (অর্থাৎ সুদের হার) অনেক কারণেই বেশি, উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঋণকারী চাষীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থান ও মর্যাদা। কৃষিঋণ-কাঠামো পরিকল্পনার সময়ে তাই চাষীর জীবনের সকল প্রয়োজনের পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করা দরকার, নিছক কৃষিকার্যে দরকারের হিসাব গ্রহণ করিলে চলে না। দীর্ঘকালীন সুদের হার খুব কমাইয়া কি লাভ হইতে পারে, যদি স্বল্পকালীন সুদের হার বেশি থাকে অথবা জমিদারের মহাজনের, দালালের বা ফড়িয়ার কাছে চাষী কম দামে ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়? গ্রামের মুদি দোকান হইতে যদি ১০০% বা তদূর্ধ হারে ঋণ করিয়া জিনিস কিনিতে হয়, তবে কৃষিকার্যে স্বল্পকালীন সুদের হার কম করিলেও উহার কতটুকু প্রভাব হইতে পারে? সুদের হার কম রাখিয়া প্রচুর ঋণ পাইবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল, কিন্তু ধর্মীয় ও গার্হস্থ্য জীবনের ব্যয় বহুল উৎসবের কি হইবে? কৃষিকার্যের খুঁটিনাটি বিচার করিলেই তাই কৃষকের জীবন ভরিয়া উঠে না, চাষের কাজের বাহিরেও তাহার সামাজিক পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের বন্ধকীর দোকান, গ্রাম্য বিধবাদের নিকট হইতে ঋণ, আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বহুবিধ সাহায্য, যাত্রা থিয়েটার, শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন বিবাহ, বর্ণভেদ প্রথা সকল কিছু মিলাইয়াই চাষীর জীবনের অর্থনৈতিক পরিবেশ—কৃষিঋণ পরিকল্পনার সময়ে তাই সামগ্রিক উন্নয়নের দিকটা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

কৃষিঋণের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ঋণকারী এবং কৃষি ঋনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of borrowers and credit)

অনেক সময় ঋণকারী চাষীকে জোতের আয়তন অনুযায়ী 'বড়', 'মাঝারি' ও 'ছোট' চাষী হিসাবে ভাগ করা হয়।[৪]

৪ যেমন *All India Rural credit survey Report* vol II P. 158.

কিন্তু ভূমিস্বত্ব অনুযায়ী চাষীর স্থান অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করাই ভাল, কারণ বন্ধক দিবার ক্ষমতা এবং ঋণ পাইবার ক্ষমতা (ও সুদের হার, ফেরৎ দিবার পদ্ধতি, ঋণকাল প্রভৃতি) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই দিক হইতে ঋণকারী চাষীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা দরকার: (১) মালিক-চাষী (owner-cultivator), (২) যে চাষীদের মালিকানা স্বত্ব নাই, কিন্তু কেনা বেচা, উত্তরাধিকারিতা ও বন্ধক দিবার উপযুক্ত চাষের স্বত্ব আছে, (৩) যে চাষীদের জমির উত্তরাধিকার সূত্রে চাষের স্বত্ব আছে, কিন্তু জীবদ্দশায় জমি বিক্রয়ের অধিকার নাই, (৪) যে চাষীরা বাৎসরিক বা স্বল্পকালীন সময়ের জন্য জমিতে চাষের অধিকার পায়, কিন্তু জমি বিক্রয়ের কোনরূপ অধিকার নাই, (৫) যে চাষী ভাগে চাষ করে, (৬) জমির মালিক কে কেহ জানে না অথচ যে চাষী তাহাতে চাষ করে, (৭) যৌথ জমির (Communal Land) চাষী। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সকল বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের চাষীদের ঋণযোগ্যতা (Credit-worthiness) পৃথক[৫]।

ঋণকারী চাষীদের শ্রেণীবিভাগ করার সময়ে ভূমিস্বত্ব বিচার দরকার

কৃষিঋণ কাঠামোর সংস্কারের সময় ভূমিস্বত্ব সংস্কারের কথা তাই মনে রাখা দরকার; এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর চাষীদের বিভিন্ন বন্ধক-যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের ঋণ কাঠামো গড়িয়া তোলা দরকার।

কৃষি-ঋণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, (ক) ঋণকাল অনুযায়ী (Period-wise), (খ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী (Purpose-wise), (গ) বন্ধক অনুযায়ী (Security-wise) এবং (ঘ) মহাজন অনুযায়ী (Creditor-wise)। ঋণকাল অনুযায়ী কৃষিঋণকে স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন—এই তিনভাগে বিভক্ত করা চলে[৬]।

ঋণের চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণকে আবার ভোগোদ্দেশী এবং উৎপাদনদ্দেশী বলা

---

৫ উপরের এই শ্রেণীবিভাগে ঋণযোগ্যতার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে অথবা ঝুঁকি ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

৬ All Indea Rural credit survey বলেন যে মাসের কম সময়ের জন্য হইলে উহা স্বল্পকালীন; ১৫ মাস হইতে ৫ বৎসর মধ্যকালীন এবং উহার উপরে হইলে দীর্ঘকালীন। *General Report* P. 158.

চলে। তাহা ছাড়া চাষীর নিজের ভোগের জন্য প্রয়োজন অথবা উৎসব পূজাপার্বনের জন্য প্রয়োজন—এই দুই-এর মধ্যে ভাগ করাও দরকার। সাধারণতঃ ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণকাল স্থির হয়। বন্ধক অনুযায়ী ঋণ সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, দীর্ঘকালীন ও মধ্যকালীন ঋণগুলি সাধারণতঃ বন্ধকীকৃত (secured), এবং স্বল্পকালীন ঋণ বন্ধকীকৃত নহে (unsecured)। মহাজন অনুযায়ী ঋণের শ্রেণীবিভাগ করিলে, ব্যক্তিগত ঋণদান এবং রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রাপ্ত সংগঠন কর্তৃক ঋণদান—এই দুই ধরণের উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগে মহাজন, দেশীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি; দ্বিতীয় বিভাগে সরকার নিজে, সমবায়ী সমিতিসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি।

কৃষিঋণ (Agricultural Indebtednes)—ভারতীয় কৃষকের আয় এত অল্প যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহাতে তাহার ব্যয় সংকুলান সম্ভব হয় না। সেইজন্য তাহাকে প্রধানতঃ মহাজনের নিকট ঋণ করিতে হয়। একবার ঋণগ্রস্ত হইলে তাহা পরিশোধের কোন উপায় না থাকায় ঋণের বোঝা কৃষককে আজীবন পঙ্গু করিয়া রাখে। সুদের হার খুব বেশি থাকায় এক পুরুষের ঋণের জের তিন পুরুষেও পরিশোধ করা দুরূহ হয়। মিঃ ডারলিংএর হিসাব মত ১৯২৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতি উহার পরিমাণ স্থির করেন ৯০০ কোটি টাকা, ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবমতে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮০০ কোটি টাকা। এক বাংলা দেশেই (যুক্তবঙ্গে) কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা (economic depression) ঘটে তাহাতে কৃষিপণ্যের মূল্য অন্যান্য পণ্যের তুলনায় অধিক হ্রাস পায়। সেই জন্য ঐ সময়ে ভারতে কৃষিঋণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ফসলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিঋণের বোঝা কিছুটা হাল্কা হইয়াছে। সাধারণ কৃষকেরা অবশ্য ঋণের আর্থিকভার বিশেষ কমাইতে পারে নাই, তবে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণের আসল ভার (Real burden) কিছুটা কমিয়া গিয়াছে।

পরিমাণ

কৃষিঋণের প্রধান কারণগুলি হইতেছে দারিদ্র; কৃষির প্রাধান্য; জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তজ্জন্য ভূমির উপরে অত্যধিক চাপ; যন্ত্র শিল্প ও অন্যান্য সহকারী কুটির শিল্প ও বৃত্তির অভাব; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিপ্রসূত চাষের

অনিশ্চয়তা, দুর্বল প্রতিরোধক্ষম দেহহেতু রোগের আক্রমণে কৃষকের স্বাস্থ্যহানি; বহুধা বিভক্ত ও খণ্ডিত খামার; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে কৃষির উপযোগী গো-মহিষাদির মৃত্যু; কৃষকের পূজাপার্বণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অযথা ও অপরিমিত ব্যয়বাহুল্য, সরকার কর্তৃক অসময়ে রাজস্ব আদায়;

কারণাবলী

আইনের জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, সূক্ষ্ম মারপ্যাচ, পৈত্রিক ঋণভার, কৃষকের ন্যায় স্বার্থের প্রতি ভূমি বিষয়ক আইনের বিমুখতা; শিক্ষার অভাব; মহাজনের শঠতা ও অসাধুতা; কৃষকের বার্ষিক মাত্র ছয় সপ্তাহ কর্মব্যস্ততা ও অবশিষ্ট সময়ে আয়হীন বেকার জীবন যাপন; অত্যুচ্চ সুদের হার; চাষী-মালিকের জমিতে সত্ত্ববান হওয়ায় ঋণপ্রাপ্তির সহজ সুবিধা। শেষ দুইটি কারণের উপর অর্থনীতিবিদ্‌গণ বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। তাঁহারা বলেন, কৃষিঋণের প্রধান কারণ হইতেছে "একদিকে উচ্চহারে সুদ, অন্যদিকে সহজবন্ধকযোগ্য মূল্যবান ভূমিসত্ত্ব।"

অবলম্বিত ব্যবস্থা সমূহ—একদিকে সুদের হার হ্রাস করা, অন্যদিকে মালিকানাস্বত্বে স্বত্ববান কৃষকের সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার অধিকার সংকুচিত করা—এই সম্বন্ধে সরকার বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

(ক) সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কৃষিকার্য ছাড়া অন্য প্রয়োজনে **ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সঙ্কোচ** করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯০১ সালে 'পাঞ্জাব ভূমি হস্তান্তরণ আইন' (Punjab Land Alienation Act) প্রণয়ন করেন। বুন্দেলখণ্ডেও ঐ মর্মে আইন প্রণীত হয়। লর্ড কার্জন ঐ আইনগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলে: "সাইলক কৃষকের নিকট হইতে (সুদের বাবদে) জমির আকারে আর অর্ধ পাউণ্ড মাংস লইতে সক্ষম হইবে না"। পূর্বোক্ত প্রকার আইন প্রণয়ণের ফলে পাঞ্জাবে ভূমি বিক্রয়, মামলা মোকদ্দমা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু ঐ আইনগুলির বিরুদ্ধে জনমত অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ উহা দ্বারা কৃষকের ভূমিতে পুরুষ-পরম্পরাগত স্বত্বের দাবি উপেক্ষিত হইয়াছিল।

অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা—(১) জমির উন্নতি, বীজ ও চাষের জন্য বলদ ক্রয় প্রভৃতি কারণে সরকার অল্পসুদে **'তাকাবি ঋণ'** দান করিয়া থাকে। কিন্তু এই ঋণগ্রহণের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ এবং ঋণ আদায়ের পদ্ধতি অতীব কঠোর হওয়ায় 'তাকাবি' ঋণ জনপ্রিয় হয় নাই।

১৮৮৩ সালের জমির উন্নতিবিষয়ক ঋণদান আইন (Land Improvement Loans Act), ১৮৮৪ সালের চাষীঋণ আইন (Agriculturists Loans Act) প্রণীত হইলেও কৃষকের কোন সুবিধা হয় নাই। একদিকে সরকারের আর্থিক অস্বাচ্ছল্য, অন্যদিকে সুপরিকল্পনার অভাব উক্ত আইন দুইটিকে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছিল। এইখানেই সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ঋণদানের উদ্যম পরিত্যক্ত হয়।

(২) কৃষিঋণ ব্যাপারে সরকারের দ্বিতীয় উদ্যম প্রকাশ পায় **'সমবায় ঋণ সমিতি'** আইন প্রণয়ন দ্বারা। সরকারের মতে,সমবায় সমিতি অমৃতফল প্রসব করিয়াছে। তথাপি এই বিশাল ভারতে ঋণদান সমস্যার ব্যাপকতা এত বিরাট যে, সমবায় ঋণদান সমিতি আজও জনসংখ্যার অতি অল্প অংশকেও প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৩) অবশেষে সরকার **ঋণদান সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ প্রথা** অবলম্বন করিয়াছে। প্রথমতঃ, দেওয়ানী আইনে কয়েকটি দফা সন্নিবেশ করা হইয়াছে যাহার ফলে কৃষকের যন্ত্রপাতি, বলদ-মহিষ প্রভৃতি দেনার দায়ে বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং আদালতকে উৎপীড়নমূলক সুদের হার অগ্রাহ্য করিয়া ন্যায্য সুদের হার স্থির করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আদালতের নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ফলপ্রদ না হওয়ায় সরকার আইন করিয়া **সুদের হার নিয়ন্ত্রণ** করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বিভিন্ন প্রদেশে **মহাজনী আইন** (Money-lenders Acts) পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ঋণের সুদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার ধার্য করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে মহাজন অধমর্ণের উপর অন্যায় অত্যাচার না করিতে পারে তাহার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনানুসারে মহাজনকে নিয়মিতভাবে হিসাব পত্র দেখাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইনের উদ্দেশ্য মহাজনের ধূর্তামীর জন্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

(৪) সরকার সুদ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হইয়া **"ঋণের মূল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণে"** বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জগদ্ব্যাপী আথিক বিপর্যয়ের (Economic Depression) সূত্রপাত হয় তাহার ফলে কৃষককুল সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য অত্যুচ্চ সুদে পুরুষানুক্রমে পুঞ্জীভূত ঋণভার হাল্কা করিবার জন্য আইন দ্বারা সরকার **'ঋণসালিসী বোর্ড'** স্থাপন করে। ওই সকল বোর্ডের উপর প্রতিকারকামী প্রত্যেক খাতকের ঋণের পরিমাণ পুনঃ-

ধার্য করিয়া দিবার ও দীর্ঘ কিস্তিতে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভার অর্পণ করা হয়। একমাত্র এই ব্যবস্থার ফলে ১৮০০ কোটি টাকা ঋণের অঙ্ক মাত্র ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ঋণের আসলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কৃষক বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে কিন্তু এই বিকল্প উপায় প্রতিষেধক মাত্র প্রতিরোধক নহে। ইহাতে অস্থায়ী উপকার হইয়াছে, কৃষিঋণের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা হয় নাই। ভারতে প্রায় সকল প্রদেশেই এইরূপ ঋণ সালিসী আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

চাষীর ঋণের উৎস (Sources of Rural Finance)

ভারতে চাষীদের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ঋণের পরিমাণ কত তাহা লইয়া অনেক হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হিসাব করিয়াছিল যে, স্বল্প ও মধ্যকালীন ঋণের প্রয়োজন হইল বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা। ১৯৫২ সালে খাদ্য বাড়াও অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছিল যে বাৎসরিক প্রয়োজনীয় মোট ঋণের পরিমাণ হইল ৮০০কোটি টাকা। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছে যে স্বল্প, মধ্যকালীনও দীর্ঘকালীন ঋণরূপে বৎসরে মোট ৭৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন।

ঋণ প্রয়োজনের পরিমাণ

সর্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটি ১৯৫৪ সালের রিপোর্টে মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চাষীরা কোন্ কোন্ সূত্র হইতে ঋণ পায়। নিম্নে উহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল [৭]।

	উৎস	মোট ঋণেরকত অংশ
১।	সরকার	৩.৩
২।	সমবায় সমিতি	৩.১
৩।	আত্মীয় স্বজন	১৪.২
৪।	জমিদার	১.৫
৫।	কৃষি-মহাজন	২৪.৯
৬।	পেশাদার-মহাজন	৪৪.৮
৭।	ব্যবসায়ী ও দালাল	৫.৫
৮।	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক	০.৯
৯।	অন্যান্য	১.৮
		১০০.০

৭ —All India Rural Credit Survey—*General Report* ch 14. P. 161.

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সরকার ও সমবায় সমিতিগুলি সম্মিলিতভাবে মোট কৃষিঋণের ৬'৪% সরবরাহ করিয়া থাকে, এবং অন্যান্য সকল বেসরকারী ও অসংগঠিত সূত্র হইতেই ৯০% ঋণ পাওয়া যায়। বেসরকারী সূত্রের মধ্যে কৃষিজীবি ও পেশাদার মহাজনেরাই ৭০% ঋণ সরবরাহ করে।

মহাজনেরা চাষীদের কাছাকাছি থাকে এবং প্রয়োজন হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চাষীদের নিকট ঋণ লইয়া হাজির হইতে পারে। তাহাদের সঙ্গে চাষীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং খুব সাদাসিদা ভাবেই তাহারা কাজ চালায়। চাষীর ঋণযোগ্যতা, তাহার জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ, ফসলের দাম সকল কিছু সম্পর্কেই তাহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, বিনা বন্ধকীতে বা খুব কম বন্ধকীতেই চাষী ঋণ পাইতে পারে। কিন্তু মহাজনের এই প্রতিপত্তি কখনই সুফলদায়ী নয়। সহজে ঋণ পায় বলিয়া চাষী অনেক সময় অনুৎপাদক কাজেও ঋণ করার জন্য প্রবুদ্ধ হয়। ইহারা অতিরিক্ত সুদ আদায় করে। গড়ে ২৫% হইতে ৫০% সুদের হার চাষীকে বহন করিতে হয়। অধিকাংশ মহাজনই অসৎ, তাই নিরক্ষর চাষীকে ঠকাইয়া ইহারা ধনসম্পদ ও আধিপত্য বৃদ্ধি করে। অনেক মহাজনই ব্যবসাদার বা দালাল, তাহারা অল্প মূল্যে ফসল কিনিয়া লওয়ার সুযোগ পায়।

কেন মহাজনই প্রধান ও উহার বিপদ কোথায়

ব্যবসায়ীরা ও তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ ফসল লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া চাষীকে অগ্রিম দাম বা দাদন দেয়। ইহাতে চাষীর সাময়িক সাহায্য হয়, এবং ফসলের দামের উঠানামার ঝুঁকি সে কিছুটা সীমাবদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবসায়ীরাই শক্তিশালী হয় এবং চাষীই উৎপন্নের দাম কম পাইয়া থাকে। এই দাদনের উপর অনেক ক্ষেত্রেই কোন সুদ লওয়া হয় না।

ব্যবসায়ী ঋণের প্রকৃতি

সরকারী ঋণ পরিমাণে কম, বণ্টনের দিক হইতে অন্যায্য এবং নিরাপত্তার দিক হইতে অনুপযুক্ত। ঋণ দেওয়া ও আদায়ের ব্যাপারে ইহা অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল। তদারকের দিক হইতে ইহা দায়িত্বহীন এবং খুবই অসংগঠিত।

সরকারী ঋণের ত্রুটি

ভারতের সমবায় আন্দোলন যে অনেকাংশে বিফল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল সমবায় সমিতিগুলি মোট ঋণের মাত্র ৬·১% সরবরাহ করিয়া থাকে। এই ঋণ বেশির ভাগই পায় বড় চাষীরা এবং তাহাও শেষ পর্যন্ত পরিশোধ হয় না।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা

অবস্থা উন্নতির উপায়ঃ সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ (How to improve the situation : Recommendation of All India Rural Credit Survey Report)

সর্বভারতীয় ঋণঅনুসন্ধান কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌছিযাছেন যে, ভারতের কৃষিঋণ ব্যবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিসমূহের পুনর্গঠনই প্রধান প্রয়োজন। এতদিনে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতার দরুণ উহার প্রসার হইতে পারে নাই। জমিদারী প্রথায় চাষীর পৃথক অস্তিত্ব বিশেষ থাকে না, প্রতি বৎসর চাষের অধিকার পাইবার জন্য জমিদারের বা জোতদারের নেতৃত্বে তাহাকে চলিতে হয়, তাহারই নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে চাষীরা বাধ্য থাকে। বিভিন্ন জমিদারের অধীনে চাষীরা বিভক্ত থাকিলে কিরূপে তাহারা সমবায়ে মিলিত হইবে? তাহা ছাড়া, বেসরকারী মহাজনী ব্যবসাদারেরাও ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। ভারতে সরকার সমবায় আন্দোলনকে গাছের মত দুই হাতে চাপিয়া মাটিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, কারণ ইহার শিকড় জমিতে প্রবেশ করিতে চাহে নাই[৮]। সমবায়ের শিকড়ের বদলে মহাজনের নখ ও দন্তই কৃষিসমাজের গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

কমিটি এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ কাঠামো (an Integrated Rural Credit Scheme) গড়িয়া তোলার কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রধান ভিত্তি দুইটি; (ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির ঋণ নীতি পরিবর্তন করা দরকার। যে কোন চাষী তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ফসলের দাম অনুযায়ী সেই ফসল জমা দিবার প্রতিশ্রুতিতেই সমবায় সমিতির সভ্য হইয়া ঋণ পাইতে পারিবে। (খ) সমবায় সমিতিগুলির কাজে

৮„A plant held in position with both hands by Government since its roots refused to enter the soil."

রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার দরকার যাহাতে (১) বড় চাষীর মত ছোট চাষীও সমবায় হইতে সাহায্য পায়, (২) সমিতিসমূহ বড় চাষীর কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে, (৩) ব্যবসায়ী ও মহাজনের কায়েমী স্বার্থ এমনভাবে সংকুচিত হয় যাহাতে সকল দিকেই সমবায়ী কাজকর্মের ক্রমপ্রসার হইতে পারে, (৪) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি উপরের সমিতিসমূহ হইতে প্রয়োজনমত প্রচুর অর্থ সাহায্য পায়, (৫) প্রতি জিলাতে কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থানের সূত্রগুলি (the central financing agencies in the district) যথাসাধ্য জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং শস্যঋণ ব্যবস্থা (crop-loan system) কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়।

কৃষিঋণের সুসম্বদ্ধ কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্যে কমিটির প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হইল (ক) **সমবায় বাজার-সমিতির সহিত সমবায় ঋণের সম্পর্ক স্থাপন করা।** মহাজনকে কৃষিঋণের বাজার হইতে অপসারণ করার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতির প্রসার করা দরকার। অতীতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে কারণ ইহা ছিল দুর্বল, ইহাকে সবল করার জন্য ইহার সকল স্তরের সমিতির সঙ্গেই রাষ্ট্রের অংশীদারী দরকার। ঋণ সমিতি ও বাজার সমিতিগুলি একত্রে কাজ করা দরকার, যাহাতে বাজার-সমিতির মারফৎ ভাল দামে ফসল বেচিয়া ঋণসমিতি ঋণ শোধ করিতে পারে। এই সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই ছোট ও মাঝারি চাষীর পক্ষে ফসল বা জমি বন্ধকের বিনিময়ে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

(২) **গুদাম পরিকল্পনা**—যখন শস্যের দাম বাড়িবে তখনই চাষী বিক্রয় করিবে—এই অবস্থা আনার জন্য দেশে প্রচুর সংখ্যক গুদাম স্থাপন করা দরকার। গুদাম স্থাপন করিলে সমবায় বিক্রয় সমিতিসমূহের কাজের অনেক সুবিধা হইবে। তাই, একটি "জাতীয় সমবায়ী উন্নয়নমূলক গুদাম নির্মাণ 'বোর্ড' " (National Cooperative Development and Warehousing Board) স্থাপন করার কথা কমিটি বলিয়াছেন। এই বোর্ডের হাতে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ফাণ্ড থাকিবে (National Cooperative Development Fund), ইহা হইতে রাজ্যসরকারসমূহকে দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা সমবায়ী বাজার ও অন্যান্য সমিতির মূলধন-ভাণ্ডারে অংশগ্রহণ করিতে পারে। রাজ্য গুদাম নির্মাণ কোম্পানী (State Warehousing Companies) এবং একটি সর্বভারতীয়

গুদাম নির্মাণ করপোরেশন (All India Warehousing Corporation) স্থাপনের কথাও কমিটি বলিয়াছেন। বেশী ঋণ পাওয়া, সহজে পাওয়া, বড় ও ভাল সমবায় সমিতি, কেবল ঋণ ছাড়াও অন্যান্য কাজ করে এমন সমিতি, সরকারী অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পুষ্ট সমবায় সমিতি, সরকারী গুদামনির্মাণ পরিকল্পনা—সকল মিলিয়া কমিটির মতে ভবিষ্যতে সমবায় আন্দোলন সাফল্যলাভ করিবে।

(গ) **রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন :** সারা দেশ জুড়িয়া ছোট ছোট সমবায় সমিতি ও গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে এবং উহাদের অর্থসংগ্রহ ও পরিচালনার সুবিধার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank) স্থাপন করা দরকার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়া গ্রামাঞ্চলে উহার শাখার সংখ্যা আরও বাড়ান হইবে যাহাতে সমবায় ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সমিতিগুলি আরও বেশি ও সস্তায় ঋণ পাইতে পারে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় (ব্যাঙ্কে আমানতের মাধ্যমে) একত্রে সংগৃহীত হইতে পারে।

(ঘ) **তিনটি ভাণ্ডার স্থাপন :** কমিটি তিনটি বিশেষ ধরণের ভাণ্ডার স্থাপনের কথা বলিয়াছেন—ইহার মধ্যে দুইটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে এবং একটি খাদ্য ও কৃষি দফ্তরের অধীনে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে যে দুইটি স্থাপিত হইবে উহার মধ্যে প্রথম হইল **জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) ভাণ্ডার** বা National Agricultural Credit (Long term Operations) Fund। প্রথমে ৫ কোটি টাকা লইয়া ইহা স্থাপিত হইবে এবং প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকা উহাতে জমা দেওয়া হইবে। রাজ্যসরকারের অংশীদারত্বে পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্ক, বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও ঋণসমিতিগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাণ্ডারের সাহায্যে ঋণ দিতে পারিবে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন (৫ বৎসরের অধিককালের জন্য) ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাণ্ডারকে ব্যবহার করিতে পারিবে। দ্বিতীয় ভাণ্ডারটির নাম হইল **'জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্ববিধানকারী) ভাণ্ডার** বা National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund। ইহাতে প্রতি বৎসর ১ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইবে। এই ভাণ্ডারের সাহায্যে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যকালীন ঋণ দেওয়া হইবে, যখন দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ তাহারা রিজার্ভব্যাঙ্কের স্বল্পকালীন ঋণ শোধ দিতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষিদফ্‌তরের অধীনে বাৎসরিক ১ কোটি টাকা জমা লইয়া স্থাপিত হইবে **জাতীয় কৃষিঋণ (রিলিফ ও গ্যারাণ্টি) ভাণ্ডার** বা National Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Fund। এই ভাণ্ডার হইতে রাজ্যসরকারের মারফৎ সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া হইবে। দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিব পরে অপরিশোধ্য বকেয়া ঋণ তামাদি করার উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডার ব্যবহৃত হইবে। এই তিনটি ভাণ্ডার মিলিয়া পুনর্গঠিত সমবায় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

(ঙ) এইরূপ নূতন সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত একদল কর্মী চাই। সমবায় দপ্তর, সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণ, বিক্রয় বা অন্যান্য সমিতির কর্মীদের দক্ষতার মান বাড়াইতে হইলে, তাহাদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অধিক অর্থ ব্যয় করা দরকার। গ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল একদল শিক্ষিত কর্মী অবশ্যই দরকার।

ভারত সরকার এই সকল ও আরও অন্যান্য সুপারিশ অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। (ক) ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াকে জাতীয়করণ করিয়া উহার নাম রাখা হইয়াছে **ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া**। প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৪০০টি নূতন ব্রাঞ্চ ইহাকে খুলিতে হইবে। (খ) রাষ্ট্র যাহাতে সমবায় সমিতিগুলিতে অংশীদারিত্ব পাইতে পারে তাহার সুবিধার জন্য ১৯৫৫ সালে ১০ কোটি টাকা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি **জাতীয় কৃষি ঋণ (দীর্ঘ কালীন) ভাণ্ডার** স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার জাতীয় সমবায়ী উন্নয়ন ভাণ্ডার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। (গ) সরকার একটি **কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন** স্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্য গুদাম নির্মাণ করপোরেশন স্থাপনের কথাও চিন্তা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গুদামনির্মাণ করপোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি জায়গায় গুদাম নির্মাণ করিবে। এই গুদামে মাল রাখা হইয়াছে এই রসিদের ভিত্তিতে সমবায় সমিতিসমূহ ঋণ দিবে। (ঘ) ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একত্রে **সমবায়ী শিক্ষার কেন্দ্রীয় কমিটি** গঠন করিয়াছেন। সমবায় দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিসারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুনাতে একটি সমবায় কলেজ স্থাপিত

হইয়াছে। মাঝারি কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য পুনা, রাঁচী, মীরাট, মাদ্রাজ, এবং ইন্দোরে পাঁচটি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই বিপুল কার্যসূচী গ্রহণ করা উচিত কি না সেই বিষয়ে স্যার ম্যালকম্ ডারলিং বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।৫ অতীতে সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারে নাই এবং বর্তমানেও ইহার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—এই কারণে দুর্বল ভিত্তির উপরে দ্বিতীয় পরিকল্পনার এত বৃহৎ কার্য সূচীর কাঠামো গড়িয়া তোলা অনুচিত হইবে, তিনি এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।৬ তিনি দেখাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠান বা প্রাথমিক ঋণ দান সমিতিগুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ দুর্বল অবস্থায় আছে। ইহাদের বকেয়া ঋণের ও সুদের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। নয়টি রাজ্যের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যের ২৫% সমিতি লোকসান দিতেছে। তাহা ছাড়া, এই আন্দোলন ভারতের সকল অঞ্চলে সমান ভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, বহু অনগ্রসর অঞ্চল রহিয়া গিয়াছে। এই পার্থক্য অস্বীকার করিয়া সকল অঞ্চলের জন্য সমান উন্নয়নের কর্মসূচী ও হার গ্রহণ করা উচিত নহে। রেইফেসন-ধরণের ছোট ছোট প্রাথমিক সমিতির বদলে বৃহৎ সমিতি গঠন করিলে পরস্পর নির্ভরশীলতা, ও সহযোগিতার মনোভাব ক্ষুণ্ণ হইবে, সীমাবদ্ধ দায়িত্বের ফলে গরীব চাষী যোগ দিবে না ও প্রধানত ধনী চাষীরাই অর্থ নিয়োগ করিবে। সর্বোপরি, সরকারী সাহায্য ও পরিচালনা সমবায় আন্দোলনকে নিজস্ব গতিবেগ ও ধরণ হইতে সরাইয়া আনিয়া নিছক সরকারী বিভাগে পরিণত করিবে, এইরূপ সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

পুরাতন পন্থী মিঃ ম্যালকম ডারলিং-এর সমালোচনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শিক্ষা প্রসারের ভিত্তি হিসাবে খাদ্যক্ষেত্র বা জীবন ধারণ ক্ষেত্রের বিপুল প্রসারের দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেকাংশে যে খাদ্য ঘাটতির বাধার সম্মুখীন হইয়াছে কৃষিসংস্কারের

৫ "Report on cortian aspects of cooserative movement in Indiu 1957—Sir *Malcolm Darling*.

৬ "It follows······that without strong primary units, effective organisations cannot be built. Yet it is proposed to add an imposing new storey······ to a structure...no where very strong and in some states deplorably weak".
—*Darling Report P.* 1.

অসম্পূর্ণতাই তাহার মূল কারণ। সুতরাং কৃষির উন্নতি করা প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটি ঠিক পথে অগ্রসর হইয়াছে কি না। আমাদের মনে হয় যে, কোন সঠিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হইয়া গিয়াছে। যে ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ছোট ছোট চাষীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডগুলিকে স্বাধীন ভাবে চাষ করিতে থাকিবে, তাহাদের নিকটে সহজে ও সস্তায় ঋণ পৌছাইয়া দেওয়াই আসল কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গী রিপোর্টের প্রতিটি বিশ্লেষণ ও সুপারিশের ভিত্তি। শুধু তাহাই নহে, ভূমিস্বত্ব সংস্কারের (অবশ্য যদি তাহারা সম্পূর্ণ হয়) ফলে গ্রামাঞ্চল যে নূতন রূপগ্রহণ করিবে সেই পশ্চাৎপটও অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে দরকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত চাষ-প্রথা বিলোপ করিয়া রাষ্ট্রের মালিকানায় কৃষিমজুরদের লইয়া যৌথ চাষ সমিতি (State Collective farms) এবং উহারাই পাশাপাশি স্বাধীন চাষীদের স্বেচ্ছাকৃত মিলনে সমবায় চাষ সমিতি (Co-operative farming Societies গড়িয়া তোলা। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সকল চাষীর কাজকর্ম রূপায়িত হইবে, এই সমবায় চাষ সমিতিরাই সমাজোন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়ন ঘটাইবে, ইহারাই উৎপাদন সংগঠন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বণ্টনের পুরোধা প্রতিষ্ঠানরূপে স্থান করিয়া লইবে। এই পরিবর্তনের সম্মুখে শুধু ঋণ দানের উদ্দেশ্যে "সুসম্বদ্ধ ঋণ কাঠামো" সুপারিশ করা কখনই ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না।

নব্য পন্থীদের সমালোচনা

কিছুদিন পূর্বে মিঃ নেহরু (১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে) বলিয়াছেন যে, সর্বভারতীয় ঋণ অনুসন্ধান কমিটির অনেক সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার ভুলই করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এতটা না থাকাই ভাল। কিন্তু তিনিও সমস্যাটিকে পুরাতন "স্বাধীন সমবায়" অথবা "রাষ্ট্রীয় সমবায়" এই স্তরে রাখিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভূমি বিপ্লবের পর যৌথ চাষ সমিতি ও সমবায় চাষ সমিতির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড় থাকিবে এবং কৃষিদপ্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্র সরাসরি সেই সমিতিগুলিকে ঋণ দিবে এবং ঋণ পরিশোধ পাইবার ব্যবস্থা করিবে। রাষ্ট্রের নেতৃত্বে স্থাপিতও পরিচালিত সমবায় সমিতিগুলির জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে ও প্রচুর সহরে কর্মচারী পরিশোভিত পৃথক ভাবে

মিঃ নেহরুর বক্তব্য

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বরং বলা যায়, ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে যে সকল বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান (Specialised · in institutions) গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহারা ক্রমেই অকেজো হইয়া পড়িবে, বহু অর্থব্যয় বিফল হইবে, ইহাদের নূতন অবস্থায় খাপ খাওয়ান যায় কি করিয়া—কিছুদিনের মধ্যে সেই সমস্যারই উদ্ভব হইবে।

সমবায় কাহাকে বলে (What is Co-operation)

কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘ বা সমিতি গড়িয়া তোলাকে সমবায় বলে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে উৎপাদকগণ প্রধানতঃ মুনাফার উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করেন, নিজেদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। সমবায় সমিতিতে উন্নততর কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সভ্যরা কাজ করে, পরস্পরকে সাহায্য করিয়া একযোগে সকলের সম্মিলিত অর্থনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটাইতে সভ্যরা চেষ্টা করে। সাধারণতঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ধনী ব্যক্তিগণ আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বিতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু গরীব ব্যক্তিগণ একে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিলে একার শক্তিতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন না।

সমবায় কাহাকে বলে

সমাজতন্ত্রের সহিত সমবায়ের পার্থক্য করা হইয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন, প্রধানতঃ ফড়িয়া বা মধ্যস্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা কাঁচামাল উৎপাদনকারী বা ভোগকারীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, উপায় বা মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘটান হয় না। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বদলে সকল উৎপাদনের উপায়, যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সামাজিক কর্তৃত্ব থাকে। তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গরীব চাষীর ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য সম্ভব হইতে পারে না; সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ কর্ম হইলেও আধুনিককালের উন্নততর যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার

সমাজতন্ত্র ও সমবায়

মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেই একমাত্র প্রকৃত সমবায়ী মনোভাব এবং বিজ্ঞানসম্মত উন্নতস্তরের কৃষিকার্য দেখা দিতে পারে।৭

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ; ইহা হইল উৎপাদনী সমবায় (Producers' Co-operation)। কয়েকজন ভোগকারী ক্রেতা একত্রে মিলিয়া পাইকারী দরে মালপত্র ক্রয় করিয়া দোকানদারের মুনাফা নিজেরাই লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারেন ; ইহা হইল ভোগকার্যের সমবায় (Consumer's Co-operation)। এইরূপে চাষীরা নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারেন ; কয়েকজন মিলিয়া একত্রে সভ্য হইয়া সমিতি গঠন ও পরিচালনা করিয়া খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলি একত্রে চাষ করিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। আমাদের দেশে কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময়ে ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ সমবায় স্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য উদ্দেশ্যে সমবায়ের প্রসার বিশেষ হয় নাই।

বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি

ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্থাপিত হইলেও সমবায়ের কয়েকটি মূলনীতি আছে। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে পরস্পর জানাশোনা থাকা আবশ্যক। কারণ, যাঁহারা মিলিত হইবেন তাঁহারা পরস্পরের প্রকৃতি, চরিত্র, আর্থিক অবস্থা ও কার্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ না জানিলে বিশ্বাস

৭ "Small peasants property excludes by its very nature the development of the social powers of production of labour, the social forms of labour, the social concentration of capital, cattle raising on a large scale, and progressive application of science. Usury and a system of taxation must impoverish it everywhere. The expenditure of capital in the price of the land withdraws this capital from cultivation. An infinite dissipation of means of production and an isolation of the producers themselves go with it. [Cooperativse i-e. associations of small peasants, while playing an unusually progressive bourgecis role, only weaken this tendency without eliminating it · one must not forget besides, that these cooperatives do much for the well-to-do peasants, and very little, almost nothirg, for the mass of the poor peasants, also that the associations themselves become exploiters of wage labour.] Also an enormous waste of human energy. A progressive deterioration of the conditions of production and a raising of the price of means of production is a necessary law of small peasants property". *Marx*—Capital (vol III)

উৎপন্ন হইবে না। সেইজন্য একটি গ্রামের, আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের লইয়া (যেমন কামার, কুমোর, চাষী, ছুতার প্রভৃতি) গঠিত হয়। একই বর্ণ বা জাতির (caste) লোক হইলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সমষ্টিগত দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার কাজ কর্মের সাফল্য নির্ভর করে নিবিড় ঐক্যবোধ ও বোঝাপড়ার উপর। প্রত্যেক সভ্যের মর্যাদা অন্যের সমান, বড় ছোট বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক সভ্যই স্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগ দেয়, কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই। সমবায় সমিতিতে অসাধু সভ্যের স্থান নাই; জুয়াচোর, মদ্যপ প্রভৃতি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। অতি অল্প খরচে সমিতি পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। সমিতির সভ্যদের অর্থ যাহাতে অপব্যয় না হইতে পারে সেই চেষ্টা সকল পরিচালকেরই থাকা দরকার। কাজ পরিচালনায় সকলের অধিকার সমান থাকা দরকার অর্থাৎ প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট থাকা উচিত।

সমবায়ের মূলনীতি

সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A short history of the Co-operative movement)

গত শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৯২ সালে মাদ্রাজ সরকার স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনকে মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সমগ্র রিপোর্টটিকে একটি কথায় সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইল "র‍্যাফিসিনকে অনুসরণ কর।" এই সময়ে যুক্ত প্রদেশে ডুপারনেক্স, পাঞ্জাবে এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান ও ক্যাপ্‌টেন ক্রস্‌থ্‌ওয়েট ঋণ দান সমিতি সংগঠিত করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য উপযুক্ত আইন ছিল না। ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনও গ্রাম্য ঋণদান সমিতি স্থাপনের কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হইল। এই আইনের লক্ষ্য হিসাবে বলা হইল "চাষীদের, কারিগরদের এবং অল্পবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমবায়ী মনোভাবে উৎসাহ দেওয়া।" এই আইনানুসারে সমবায় ঋণদান সমিতি 'গ্রাম' ও 'পৌর' এইভাগে ভাগ

পূর্বের ইতিহাস

করা হয়। 'গ্রাম' সমিতিগুলি র‍্যাফিসিন ধরণে এবং 'পৌর' সমিতিগুলি 'সুলজে ডেলিজ' ধরণে গঠিত হইবে ইহা স্থির করা হয়।

সমিতিগঠন সম্বন্ধে বলা হয় যে, দশ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া সমিতি গঠন করা যাইবে। প্রত্যেক সমিতির একটি কার্যকরী সভা ও সভাপতি থাকিবে। সভ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ, আমানত, ও ঋণ গ্রহণ দ্বারা সমিতির ধনভাণ্ডার গঠিত থাকিবে, সভ্যগণকে উহা হইতে ঋণদান করা চলিবে। পৌর সমিতির পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা চলিবে। গ্রাম্য সমিতিতে লভ্যাংশ বণ্টিত হইবে না, পৌর সমিতিতে লাভের তিন-চতুর্থাংশের অধিক বণ্টিত হইবে। গ্রাম্য সমিতির প্রত্যেক সভ্যের আর্থিক দায়িত্ব সীমাহীন (unlimited liability), পৌর সমিতির সভ্যের পক্ষে উহা সীমাবদ্ধ (Limited liability)। কোন সভ্য এক পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার বা এক হাজার টাকার বেশি মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না। যে প্রয়োজনে ঋণ গৃহীত হইবে সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যয় করিতে হইবে। ঋণ শোধের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে দুইজন করিয়া প্রতিভূ (security) দিতে হইবে। সুদের হার বাজার-হার হইতে খুব বেশি পরিমাণে কম হইবে না।

প্রাথমিক সমিতির গঠন পদ্ধতি

শীঘ্রই ১৯০৪ সালের আইনের কিছু দোষ ত্রুটি ও অসুবিধা দেখা দিল, যেমন (১) ইহা কেবল ঋণদান সমিতি প্রবর্তনের কথা বলিয়াছে, (২) পরিদর্শন ও মূলধন সরবরাহের জন্য কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সীর ব্যবস্থা ইহাতে নাই, এবং (৩) 'গ্রাম' ও 'পৌর' এইরূপ শ্রেণীবিভাগ অবৈজ্ঞানিক এবং অসুবিধাজনক। এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯১২ সালে একটি নূতন আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ঋণদান ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করার কথা বলা হইয়াছে। মূলধন সরবরাহ ও পরিদর্শনের জন্য, (ক) প্রাথমিক সমিতিগুলির যুক্ত সংগঠন (Unions of primary Societies), (খ) জিলা স্তরে কেন্দ্রীয় সমিতি এবং (গ) প্রাদেশিক স্তরে প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হইল, 'গ্রাম' ও 'পৌর'—এই শ্রেণীবিভাগ পরিবর্তন করিয়া 'সীমাহীন' ও 'সীমাবদ্ধ' দায়সম্পন্ন হিসাবে নূতন শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তিত হইল। সীমাহীন দায়িত্বপূর্ণ সমিতিতে কর্মনির্বাহকগণ মাহিনা

গ্রাম ও পৌর, সীমাহীন ও সীমাবদ্ধ

পাইবে না। সীমাবদ্ধ দায়িত্বপূর্ণ সমিতিগুলিতে সভাপতি ব্যতীত একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রতি বৎসর সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষকগণ হিসাব পরীক্ষা করিবেন। এই আইনের ফলে বহুপ্রকার সমবায় সমিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সরকার বুঝিতে পারেন, সমবায় আন্দোলনের প্রসার অপেক্ষা উহার সংহতি বিধান আশু প্রয়োজন। ১৯১৪ সালে নিযুক্ত ম্যাক্‌লেগান কমিটি এই বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন। ১৯১৯ সালে সমবায়বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়। প্রাদেশিক সরকারসমূহ প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক আইন বিধিবদ্ধ করে। পাঁচ বৎসরে সমিতির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায়।

কিন্তু সমবায় আন্দোলন নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি ছাপাইয়া চলিয়া যাওয়ায় দুর্বলতাসমূহ ক্রমশ পরিস্ফুট হইতে থাকে ৮। ১৯২৯-৩৫ সালের অর্থনৈতিক মন্দা বা সংকট সমবায় আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল।৯ ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষিঋণ বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরনীয় ঘটনা, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইল, পুরাণো দেনা কিছু কিছু পরিশোধ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল।

বর্তমান অবস্থা

আন্দোলনের পরিধি প্রশস্ত হইল, ঋণ ছাড়া অন্যান্য দিক লইয়া বহু সমিতি স্থাপিত হইতে সুরু হইল। কিন্তু বহু দোষ ত্রুটি ও অসুবিধার দরুণ আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিল না, ১৯৫৩

---

৮ "The important rule that "the progress of any organisation should be in proportion to the abilities of those who are going to administer it" had been ignored. The followers of Nicholson, anxious to spread the movement, had vigorously attempted to push Raiffeisenism into the countryside, without, as Nicholson had exhorted, endeavouring to find enough Raiffeisens first."—*Strickland*, **Cooperation in India.**

৯ "With the drying up of productive outlets, assets have become frozen, and with the repayments coming in sluggishly and overdues rapidly mounting up, many central financial institutions came near to virtual extinction." —*op. cit.*

সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটি দেখাইয়াছেন যে, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি চাষীদের ঋণ-প্রয়োজনের শতকরা মাত্র ৩·১% অংশ মিটাইয়া থাকে। এই আন্দোলনের প্রসারের জন্য কমিটি বহু উল্লেখ-যোগ্য সুপারিশ করিয়াছেন। সকল স্তরে রাষ্ট্রীয় অংশীদারত্ব এবং গুদামনির্মাণ ও কৃষিবিপনন ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইয়া বহুমুখী সমবায় সমিতির উপর জোর দিয়া সমবায় উন্নয়নের সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ শাখাগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। পাঁচবৎসরের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে ৪০০ নূতন শাখা খুলিবে স্থির হইয়াছে; ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২৪৪টি শাখা খোলা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের এক একটি শাখার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ব্যাপকভাবে গ্রাম্যঋণের প্রসার করিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় খাতে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ঋণদান সমিতি নহে, বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা বিভাগের (Community Development Work and National Extension Service) কার্যের সহিত সমবায় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। বলা হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য হইল ইহার সাহায্যে গ্রাম্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পুনর্গঠন এবং ইহার জন্য সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management) প্রবর্তন করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার স্থান

এই ব্যবস্থায় গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে বিভিন্ন কার্যের জন্য পৃথক সমিতি থাকিবে; কুটিরশিল্প, চাষ, ক্রয় বিক্রয়, সকল বিষয়ই সমবায় সমিতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, আরও ১০,৪০০ বৃহদাকার ঋণদান সমিতি, ১৮০০ প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমিতির ৩৫০টি গুদাম এবং বৃহদাকার বিক্রয় সমিতিগুলি কর্তৃক ৫৫০০টি গুদাম পরিচালনা।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৫ সালের রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন

সংশোধন করিয়া) ভারতে জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন কাজকর্ম) ভাণ্ডার [The National Agricultural Credit (long term operations) Fund] স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন ছিল প্রথমে ১০ কোটি টাকা ; উহার পরে প্রতিবৎসর (১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭ ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯) ৫ কোটি টাকা হিসাবে বাৎসরিক জমা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার ব্যবহৃত হইবে ; (ক) যাহাতে রাজ্য সরকারসমূহ সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারদের দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া ; (খ) মাঝারি পরিমাণ সময়ের জন্য কৃষিঋণ দেওয়া ; (গ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া ; এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চার ক্রয় করা।

কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ কতদূর কার্যকরী হইতেছে

১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্বসাধন কারী) ভাণ্ডার (The National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] প্রথমে ১ কোটি টাকা লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্তী দুই বৎসরে উহার মূলধন আরও ১ কোটি টাকা বাড়ান হইয়াছে। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা এইরূপ দুর্ঘটনার দরুণ রাজ্যসরকারসমূহ যদি স্বল্পকালীন ঋণকে মাঝারি পরিমাণ সময়ের জন্য বা দীর্ঘকালীন ঋণে রূপান্তরিত করিতে চায়, তখন এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের ধার দিবে।

১৯৫৬ সালে (১লা সেপ্টেম্বর) একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম নির্মাণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থ-সাহায্যপুষ্ট এই বোর্ডের কাজ হইল সাধারণ ভাবে সমবায় কাজকর্মের উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে কাঁচা মাল শোধন (Processing), গুদামনির্মাণ (Warehousing) এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা (Marketing)। একটি কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করর্পোরেশন (Central Ware housing Corporation) এবং ১১টি রাজ্য গুদাম নির্মাণ কর্পোরেশন (State Ware-housing Corporations) গঠিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়া যুক্তভাবে সমবায় শিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রীয় কমিটি (The Central Committee for Co-

operative Training) গঠন করিয়াছে, তাহা সকল স্তরের সমবায় কর্মচারীদের জন্য সমবায় শিক্ষার বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

সমবায় সংগঠনের কাঠামো (Structure of Co-operative Organisation)

সমবায় আন্দোলন বা সংগঠনের কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বহুসংখ্যক সমিতি লইয়া সমবায় আন্দোলন গঠিত। ইহা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত, কৃষিগত (agricultural) ও অকৃষিগত (Non-agricultural) সমিতি। এই উভয় প্রকার সমিতিই আবার দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, ঋণমূলক (Credit societies) ও অঋণমূলক (Noncredit societies)। এইরূপে আমরা নিম্নলিখিত কাঠামো দেখিতে পাই :

- সমবায় সমিতিসমূহ
  - কৃষিগত
    - ঋণমূলক (কৃষিজীবিদের লইয়া গঠিত)
      - স্বল্পকালীন ঋণদান সমিতি
      - দীর্ঘকালীন ঋণদান সমিতি (সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক)
    - অ-ঋণমূলক (বিক্রয়, চাষ, জলসেচ, প্রভৃতি)
  - অ-কৃষিগত
    - ঋণমূলক (কুটির শিল্পী, কারখানার মজুর প্রভৃতি)
    - অঋণমূলক (সমবায় দোকান, গৃহনির্মাণ, প্রভৃতি)

এইরূপে আমরা চারিপ্রকার প্রাথমিক সমিতি দেখিতে পাই : কৃষিঋণ সমিতি, কৃষি অ-ঋণ সমিতি, অকৃষিঋণ সমিতি ও অকৃষিঋণ সমিতি। এই সকল সমিতিসমূহ পরিদর্শনের জন্য কয়েকটি সমিতি মিলিয়া এক একটি সমবায় ইউনিয়ন গঠিত আছে।

প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থসরবরাহ করার জন্য প্রতি জিলায় বা তালুকে এক একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। সেণ্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সরবরাহ ও পরিদর্শনের জন্য প্রতি রাজ্যে

একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। ত্রিস্তর সমন্বিত (three-tiered) পিরামিডের আকারে গঠিত (Pyramidal), ইহাই সমবায় সংগঠনের রূপ।

১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দেখা গিয়াছে, ভারতের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা হইল ২৪৪৭৬৯টি এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা হইল ১৯৩৭৩৩৩৯ জন। ইহার মধ্যে প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ছিল ২৪০৬০৪টি। ভারতে গড়ে ৫ জন লইয়া একটি পরিবার গঠিত হয় এইরূপ হিসাব করিলে বলা যায় যে, ৯'০৯ কোটি বা জনসংখ্যার ২৫% লোক ১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে সমবায়ে সংযুক্ত হইয়াছে।[১০] নীচে বিভিন্নপ্রকার সমবায় সমিতি তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, ইহা হইতে বর্তমান অবস্থা বোঝা যাইবে:

কোন্ শ্রেণীর	সমিতিসংখ্যা	সভ্যসংখ্যা
কৃষিগত—		
ঋণ সমিতি	১৬১৫১০	৯১১৬৮৪৬
শস্যব্যাঙ্ক	৮:৯১	৭৬২২৫৯
অঋণমূলক সমিতি	৩১৯০৫	
প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক	৩২৬	
অ-কৃষিগত		
ঋণ সমিতি	১০১১০	৩২৩৮৭২৭
অঋণ সমিতি	২৮৫১৬	৩১৫৬১৫৩
বীমা সমিতি	৬	৭৮৬৬

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortage Banks)

সাধারণতঃ সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিশোধ করা যায়, এরূপ ঋণ দিয়া থাকে। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য ঋণও গ্রামাঞ্চলে

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রয়োজন পুরাণো ঋণ শোধ করা বা জমিতে স্থায়ী উন্নয়নের জন্য এইরূপ ঋণের দরকার হইয়া থাকে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি এই কার্যের উপযুক্ত নহে[১১]। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা

[১০] অবশ্য একজন লোক একাধিক সমিতির সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

[১১] "The Raiffeisen type of village bank is not intended to meet the requirements of the large landed proprietor who forms the money lenders easiest and readiest prey". *Jathar & Beri*—Indian Economics.

গ্রাম্য মহাজনেরা তাহাদের মূলধন দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখিতে চাহে না। এই উদ্দেশ্যে জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘকালীন ঋণ পাইবার সুবিধার জন্য ভারতে কয়েকটি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।১২

তিন ধরণের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়—সমবায়ী, বাণিজ্যিক এবং আধা-ব্যবসায়ী। বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া শেয়ার ক্রয় করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। অপরের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া বাণিজ্যিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়; বেশি সামর্থ থাকায় তাঁহারা বেশি জমির মালিকদেরও টাকা ঋণ দিতে পারে। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া শেয়ার ক্রয় করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে সমিতি গঠন করিয়া ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া আধা-সমবায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হয়।

শ্রেণীবিভাগ

লণ্ডনে ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ফরাসী ধরণে ১৮৬৩ সালে ("Credit Foncier Indien")। চা বাগিচাতে ভুল বিনিয়োগের দরুণ ২০ বৎসরের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায়। ভারতে প্রথম সমবায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাবে ১৯২০ সালে। উহার পরে ঐ প্রদেশে আরও কয়েকটি এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ক্রমে উহাদের প্রায় সব কয়টিই উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

১৯২৯ সালে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় এই আন্দোলন অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২৪-২৫ সালে) গঠিত প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কাজ কর্মে সামঞ্জস্য আনার উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১২৬টি। বোম্বাইতে ১৯৩৫ সালে এইরূপ কয়েকটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত

১২ '.Short-term loans are needed for the expenses of cultivation and domestic expenditure and should normally be repayable in full after harvest. The purchase of cattle and farming implements calls for intermediate term credit and the normal period for such loans is from one to three years or even five years. The cultivator also requires long term finance for purposes like the purchase of machinery and other costly equipment, purchase of land and redemption of prior debts. Since such loans are comparatively large and may run, as in some foreign countries for periods ranging even up to 175 years, they have necessarily to be secured against landed assets."—**Land Mortgage Banks** Published by the Agricultural credit Department of the *Reserve Bank of India*.

হয়। ঐ বৎসরই ইহাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে একটি বোম্বাই প্রদেশীয় সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটির মত এই ব্যাঙ্কও সরকারী অর্থসাহায্যে ও আনুকূল্যে ঋণদান যোগ্য অর্থ সংগ্রহ করে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই উভয় রাজ্যেই সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার পদাধিকার বলে এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার। ১৯৫০ সালে বোম্বাই-তে ১৯টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী সমিতি ছিল, মহীশূরে ৭৯টি এবং মধ্যপ্রদেশে ৪টি। অন্যান্য রাজ্যে রাজ্য সরকারগুলি সহযোগিতা না করায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি ততটা অগ্রসর হইতে পারে নাই। সারা ভারতের হিসাব একত্র করিলে ১৯৫৪ সালে ৩০৪টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং ১০টি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল এবং উহাদের মোট কার্যকরী মূলধন ছিল ২৪ কোটি টাকা।

ভারতের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ইতিহাস

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের সাফল্য নির্ভর করে বন্ধকের জন্য উপস্থাপিত জমির মূল্য সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে পারা, বাৎসরিক পরিশোধ যোগ্য ক্ষমতাও উপযুক্ত কিস্তির পরিমাণ স্থির করা এবং সময়মত তাহা আদায় করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি রিপোর্টে বলিতেছেন যে, ভারতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ঋণের বেশির ভাগ হইল পুরাণো কৃষিঋণ শোধের উদ্দেশ্যে, জমির স্থায়ী উন্নতির-উদ্দেশ্যে নয়। অর্থ তুলিবার এবং উহা পরিশোধের ব্যবস্থা করার মধ্যেও ত্রুটি আছে। সে সকল রাজ্যের সরকার ঋণের পিছনে গ্যারাণ্টি দিয়াছেন, একমাত্র সেই সকল রাজ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ তোলা সম্ভবপর হইয়াছে।

সীমাবদ্ধ অগ্রগতি

বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচনা করিয়া ইহাদের উন্নতির উপায় সম্পর্কে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সমবায়ী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের ত্রয়োবিংশ সম্মেলন বহু আলোচনা করিয়াছেন। এই অধিবেশনে বলা হইয়াছে, ইহাদের সম্বল পর্যাপ্ত নয়, ঋণ মঞ্জুরিতে দেরি হয়, সুদের বেশ বেশি, খাতকেরা সময়মত পরিশোধ করে না এবং জমির স্থায়ী উন্নতির জন্য ব্যবহার না করিয়া পুরাণো ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে এই ঋণ ব্যবহৃত হইতেছে। সম্মেলনে বলা হয় যে, ঋণের সাহায্যে কৃষি-উৎপাদন বাড়ানই প্রধান লক্ষ্য, কারণ তাহা হইলেই সঞ্চয় বাড়িতে পারিবে এবং সেই সঞ্চয় হইতে পুরাণো ঋণ শোধ করিতে

ত্রুটি বিচ্যুতি ও উন্নতির উপায়

পারিবে। সম্মেলনে ইহাও বলা হয় যে, বর্তমান ঋণদান ব্যবস্থাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋণের কোন সীমা নাই এবং অনুৎপাদক কাজে ২০ বৎসরের জন্য প্রথম ঋণের ন্যায় একই সুদে এই সকল ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে। এই ত্রুটি দূর করার জন্য (ক) দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋণের জন্য বেশি সুদের হার দাবি করা দরকার (খ) অল্প সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া উচিত। যাহাতে ঋণের ফলে বর্ধিত আয় ঋণ পরিশোধ ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে না পারে এবং, (গ) ঋণের উদ্দেশ্যের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য রাখা দরকার।

ঋণ অনুমোদন করিতে বর্তমানে যে দেরি হয় তাহার কারণ হইল; দরখাস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি, দরখাস্তগুলি সম্পর্কে দ্রুত উপযুক্ত অনুসন্ধানের উপযোগী শিক্ষিত কর্মচারীর অভাব, ঋণ পাইবার উপযুক্ত ধরণের মালিকানা-স্বত্বের দলিল না রাখা। এই সকল ত্রুটি দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির উচিত চাষীর নিকটে বিভিন্ন প্রকার রীতিনীতি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পৌছাইয়া দেওয়া এবং এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত কর্মীদল তৈয়ারী করা।

মনে রাখা দরকার, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কৃষিঋণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করিতে কিছুতেই পারে না। বর্তমানে এইরূপ সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে চাষীর সকল দেনা মাথায় তুলিয়া লওয়া মোটেই সম্ভব নয়। চাষীদের মোট দেনা কিস্তিবন্দীতে শোধ করার ভার গ্রহণ এবং সুদের হার কমান কিছুতেই ইহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কৃষিঋণ সমস্যা সমাধানে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত; কারণ ব্যক্তি-ভিত্তিক চাষ প্রথার পরিবর্তে সমবায়ী চাষ-প্রথা প্রবর্তনের নীতি ঘোষিত হইয়াছে। সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ-আবাদের প্রসার হইলে জমির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের দায়িত্ব থাকিবে সমবায় চাষ সমিতির উপর; এবং অবিলম্বে না হইলেও, অদূর ভবিষ্যতে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে বৃহৎ মাত্রায় চাষ সুরু হইবে। তখন জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের অবস্থা বদলাইয়া যাইবে এবং উহাকে বন্ধক রাখিয়া জমির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের রূপও যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সেই পরিবর্তিত ভূমি-স্বত্ব এবং কৃষি-সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জমি-

পরিবর্তিত অবস্থায় ইহার ভবিষ্যৎ

বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ভবিষ্যৎ কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসিবে, ইহা নিশ্চিত।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা ও উহার ভবিষ্যৎ (Failure and Prospects of the Cooperative movement in India)

সারা ভারত ঋণ অনুসন্ধান কমিটির বিবরণীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে ভারতে সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে নাই। "উন্নততর কৃষি, উন্নততর ব্যবসা, উন্নততর জীবনযাপন"—ইহারা সমবায় আন্দোলনের লক্ষ্য থাকিলেও অর্ধশতাব্দী পরে একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার অনেক কারণ আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু পর্যন্ত ভারতে ঋণ সমিতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যতদিন চাষের কাজকে মোটামুটি অর্থকরী অবস্থায় পরিণত না করা হয়, ঋণের সহিত বীজ ক্রয়, ফসল বিক্রয়, শস্য শোধন (Purchase, marketing and processing) প্রভৃতি কাজও সমবায়ের সাহায্যে না হয় ততদিন কেবলমাত্র সমবায় ঋণদান আন্দোলন সফল না হইবার সম্ভাবনা। প্রাথমিক সমিতিগুলির ছোট আয়তনের দরুণ উহার কাজকর্মের পরিধি বাড়িতে পারে নাই, দায়িত্ব সীমাহীন থাকায় অর্থবান ব্যক্তিরা ইহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহেন নাই। পরিচালনার উপযোগী শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীসংখ্যার অভাব ছিল। সমিতিগুলি রাজনৈতিক ও গ্রাম্য দলাদলির উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় প্রতিটি সমিতিতেই বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল খুব বেশি। অনুৎপাদক উদ্দেশ্যে প্রভূত পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইয়াছে। খাতায় পত্রে যে কোন উপায়ে হিসাব মিলাইয়া দেখান হইয়াছে (Window dressing)। অসাধু পরিচালকেরা অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, এমন উদাহরণও প্রচুর। বাহির হইতে অর্থ পাওয়ার উৎসের উপর নির্ভরশীলতা এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এই নির্ভরশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ ইহার ফলে সুদের হার বাড়াইয়া রাখিতে হয়।

আভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি

উপরের এই সকল আভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াও মৌলিক কয়েকটি

কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক শক্তি বিন্যাসের ধরণ। চাষীরা বিভিন্ন জমিদারের নিকট সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নিজের জমিদারের নিকটে উপস্থিত হইতে বাধ্য।

মৌলিক দুইটি কারণে সমবায় আন্দোলন বিফল হইতে বাধ্য

বিভিন্ন ধরণের মালিক-শ্রেণীর অবস্থানের দরুণ সমবায় আন্দোলনের প্রসার হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। জোতদার, মহাজন ও ব্যবসাদার একই ব্যক্তি, তাহার নিকট হইতে জমি লইয়া, কাজ পাইয়া তাহারই নিকট ফসল বিক্রয় করিয়া, ঋণ পাইয়া চাষীকে চলিতে হয়। কয়েকজন "স্বাধীন চাষী" মিলিয়া সমবায় গঠন করিতে পারে, কিন্তু গরীব চাষীর স্বাধীনতা কোথায়? তাহা ছাড়া, আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার আধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যে আত্মনির্ভরশীলতা, ব্যবসায় বুদ্ধি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, ও ব্যয় কুণ্ঠা সমবায় আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি, তাহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় জাগিয়া উঠিতে পারে না, নিজেদের তাগিদেই উহার সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বলা হইতেছে, সমবায় আন্দোলনই ভারতীয় চাষীর উন্নতির একমাত্র পথ। বহু পূর্বেই কৃষি কমিশন বলিয়াছিল, "সমবায় আন্দোলন যদি বিফল হয়, তবে গ্রাম্য ভারতের শ্রেষ্ঠ আশা ধূলিসাৎ হইবে।"[১৩]

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও বলিয়াছিলেন, "ব্যক্তিক্ষেত্রের মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমবায় ব্যবসায় সংগঠনকে আর গণ্য করা চলে না। ইহা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের অবশ্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্রবিশেষ।"[১৪]

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বলা হইয়াছে "যে সকল ক্ষেত্র সমবায় সংগঠন প্রয়োগ করার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী তাহা হইল কৃষি ঋণ, বিক্রয় ও শস্য

১৩ "If cooperation fails, there will fall the best hope of rural India."

১৪ "The cooperative form of organisation can no longer be treated as only a species within the private sector. It is an indispensable instrument of planned economic action in a democracy."

শোধন, গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের সকল দিক, ভোগকারীর সমবায় ভাণ্ডার কুটির শিল্পী ও শ্রমিকদের এবং নির্মাণ কার্যের সমবায়।"[১৫]

১৫ "......the fields which mark themselves out as being specially appropriate for the cooperative method of organisation are agricultural credit, marketing and processing, all aspects of production in rural areas, consumer's cooperative stores, cooperatives of artisans and labour and construction cooperatives."

"In areas which offer special opportunities for its development, the cooperative form of organisation had advantages which neither the system of private enterprise nor that of state ownership can match."—*Second Five Year Plan.*

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চাষী ও বাজার

Cultivator and the Market

কৃষিপণ্যের বাজার সংগঠন (Marketing organisation of Agricultural Commodities)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হইলে বেশীর ভাগ কৃষিজাত দ্রব্যকে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরাইয়া লইয়া আসা দরকার; সুতরাং কৃষিজাত পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থার উপর শিল্পোন্নয়নের গতি অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতে কৃষিকার্য বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State-trading in food grains) সংগঠন এখনও পর্যন্ত গড়িয়া ওঠে নাই। প্রধানতঃ ছোট ছোট চাষীরা সারা দেশে ছড়ান অবস্থায় উৎপাদন করে ও বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ বিক্রয়-সংগঠন একবারেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৃষি বাজার সংগঠনের ভূমিকা

বাজারে কি পরিমাণ শস্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইবে তাহা নির্ভর করে চাষীর হাতে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্তের উপর। ভারতে মোট খাদ্যোৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে।[২] বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত হইল মোট উৎপাদনের ৯০% হইতে ৯৫%। খাদ্যোৎপাদনের খুব কম অংশ বাজারে আসে বলিয়া এই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণে অল্প কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইলে অকৃষিগত ক্ষেত্রে (non-agricultural sector) খাদ্যের যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং দামে প্রচুর উঠানামা হইয়া থাকে।

বাজারযোগ্য কৃষিপণ্য ও উহার দাম

---

১ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে থাকে যৌথখামার সংগঠন, তাহা সরকারী খাদ্য ও শস্যভাণ্ডারে নিয়মিত খাদ্য ও শস্য জমা দিয়া থাকে। পূর্ণ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চাষ হয়, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ে এবং মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন সুরু হয়।

২ ধান উৎপাদনের ৩২%, গম ৩৫% এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য ২৫%।

খাদ্যের দাম বাড়িলে অল্প পরিমাণ খাদ্য বিক্রয় করিয়াই চাষী তাহার প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য কিনিতে পারে। চাষীরা বেশি ফসল হাতে রাখে (বা নিজেরা ভোগ করে) বলিয়া দামবৃদ্ধি প্রখরতর হয়। অপরপক্ষে, দাম হ্রাসের সময়ে, চাষী অন্যান্য দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বেশি ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, দাম-হ্রাস প্রখরতর হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও অকৃষিগত অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-সংখ্যার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাই চাষীকে বাজারযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইতে হয়, বা যাহাতে চাষী ইহা বাড়ায় সেইরূপ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হয়।

চাষীর বেশির ভাগ ফসলই গ্রামের মধ্যে বিক্রয় হয়। সারা ভারত ঋণ অনুসন্ধানী কমিটির রিপোর্টে[৩] জানা যায় যে, মোট ফসল বিক্রয়ের ৬৫% গ্রামেই ঘটে। বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই পরিমাণে কিছুটা তারতম্য দেখা দিতে পারে। গ্রামে বিক্রয়ের কারণের মধ্যে প্রধান হইল, খাজনা দিবার তাড়া বা চাপ; ঋণ ও উহার সংলগ্ন অন্যান্য দেনা, মহাজনের নিকট পূর্বের ঋণ পরিশোধ, কৃষিক্ষেত্রে বা গ্রামে মজুত রাখার অসুবিধা এবং পরিবহনের অসুবিধা। ঠিক ফসল উঠার সময়েই বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া জমিদার-মহাজন-বেপারী চক্র চাষীকে খুব কম দাম দিতে চায় এবং এই কারণে দামও এই সময় খুব কম থাকে।

বিক্রয়ের স্থান, কাল পাত্র—তিনটিই ত্রুটিপূর্ণ

কৃষিজাত পণ্যের বাজারের কাঠামো আলোচনা করিলে ভারতে আমরা প্রধানতঃ যে কয়েক ধরণের বাজার দেখিতে পাই, তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে, (ক) হাট ও মেলা, (খ) পাইকারী বাজার, ও (গ) খুচরা বাজার। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দুই বা তিন দিন হাট বসে, কিছু বেশি সময় অন্তর অন্তর বা নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে মেলা বসে। কৃষিজাত পণ্য বা জীবজন্তু বা উভয়ই এই ধরণের বাজারে লেনদেন হয়, ভারতের অভ্যন্তরে এইরূপ প্রায় ২২০০০ বাজার আছে। কখনও একটি গ্রাম লইয়া, কখনও বা ৬০।৭০ মাইল ব্যাসার্ধ লইয়া হাট বসে। ভারতে প্রায় ১৭০০ পাইকারী শস্যের বাজার আছে। এইরূপ বাজারের কোনটির ব্যাসার্ধ ১০ হইতে ৩০ মাইল, অনুন্নত অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে

বাজারের শ্রেণী বিভাগ

৩ *General Report* P. 101.

উহার পরিসীমা (perimeter) আরও বিস্তৃত। বিক্রয়ের পদ্ধতি সকল বাজারে সমান নয়, নিয়ন্ত্রিত বাজার ছাড়া (regulated market) নীলামে বা সর্বসাধারণের গোচরযোগ্য চুক্তি দ্বারা বিক্রয় বেশির ভাগ বাজারেই হয় না।

এইরূপ বাজারে বিক্রয়ের কাজের সহিত জড়িত বহু ধরণের লোকজন থাকে, যেমন কমিশন এজেন্ট, সাধারণ দালাল, এবং বিশেষ কোন বিক্রয়-কার্যের সঙ্গে জড়িত দালাল। কমিশন এজেন্টদের দুইধরণে ভাগ করা যায়, কাঁচা এজেন্ট ও পাকা এজেন্ট। কাঁচা এজেন্টদের কাজ হইল প্রধানতঃ পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা। অনেক সময় সে গ্রামের বণিক ও ব্যবসাদারদের টাকা অগ্রিম দেয় এই সর্তে যে পাইকারী বাজারে তাহার মারফৎ উহাদের জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে। সাধারণতঃ তরীতরকারী ও ফলের বাজারেই ইহাদের প্রধানতঃ দেখা যায়। পাকা এজেন্টরা দূরের ক্রেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিজের জন্য ফসল ক্রয় করে। পাকা এজেন্ট অনেক সময় কাঁচা এজেন্টকে অর্থ অগ্রিম দেয়। দালাল হইল অল্পসঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি, নিজেদের কোন ঘর বা প্রতিষ্ঠান নাই; তাহার কাজ হইল ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একত্রে মিলিত করা।

মধ্যবর্তী স্তরের লোক—জনের শ্রেণীবিভাগ

এইরূপ বাজার-সংগঠনের ফলে চাষী তাহার ফসলের উপযুক্ত দাম পায় না। রাস্তাঘাটের অভাব, দারিদ্র্য প্রভৃতির জন্য দূরের হাটে, বাজারে বা সহরে যাওয়া সম্ভব হয় না, গ্রামে বেপারী বা কাঁচা দালালের নিকট ফসল বিক্রয় করিয়া দেয়। ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত দামে, যে কোন বাজারে যে কোন ব্যক্তির নিকট ফসল বিক্রয়ের স্বাধীনতা হইতে চাষী বঞ্চিত থাকে। বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলেও সে উপযুক্ত দাম পায় না। দেশের অন্যান্য স্থানের দাম সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার জন্য, ওজন-সম্পর্কীয় বিভিন্নতা ও অসাধুতার জন্য এবং বাজারের বহুপ্রকার আদায়ের বা আবওয়াবের জন্য। বাজার-পরিচালনার সকল খরচ; শেষ ক্রেতার কাছে পৌছিবার মধ্যে ওজন হ্রাস এবং শস্যের কোন ত্রুটি—সকল কিছুর জন্য চাষীর নিকট হইতেই আদায়ের চেষ্টা করা হয়। বহুপ্রকার সামাজিক বর্ণ বৈষম্য, অর্থ-বৈষম্য, পরিচয়-সূত্র অনুযায়ী দাম স্থির হয় এবং গোপনে চুক্তিতে লেনদেন

বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি সমূহ

হয়। বেপারী, ফড়িয়া কাঁচা ও পাকা কমিশন এজেণ্ট, দালাল—চাষী ও শেষ ক্রেতার মধ্যে বহু স্তরের এইসকল মধ্যস্থানীয় ব্যক্তিরা চাষীর হাতে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা খাদ্যশস্যে ভেজাল দেয়, অস্বাভাবিক দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি করে এবং খাদ্যশস্য লইয়া ফাট্‌কাদারী করে।

উহার ফলাফল

ক্রেতার দামের কত অংশ উৎপাদক হাতে পায় বাজারে সেই মূল্য-ব্যবধানের (Price-Spread) দ্বারা এত প্রকার মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির অবস্থিতির অর্থনৈতিক ফলাফল প্রকাশ পায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভোগকারীর প্রতি ডলারে উৎপাদক পায়, ডিম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৬১ সেণ্ট, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৪৯%, তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৩৪% এবং ফল ও শাকসব্জীর ক্ষেত্রে ৩২%। ভারতে উৎপাদকেরাও মোটামুটি এই অংশ পায় বটে, কিন্তু দুই দেশে পার্থক্য অনেক। আমেরিকাতে মধ্যস্তরের ব্যক্তিরা প্রতিস্তরে দ্রব্যটিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ভোগ-যোগ্য করিতে থাকে; আর ভারতে তুলনামূলকভাবে পরিবহনের ব্যয় ও স্তরের সংখ্যা বেশি থাকায় উৎপাদক এত কম অংশ পায়। বিভিন্ন হিসাব হইতে সাধারণভাবে দেখা গিয়াছে উৎপাদকেরা ক্রেতার টাকার কি অংশ পায়[৪]:

	ধান		গম	
মূল্য-ব্যবধানের পরিমাণ	কটকের উৎপাদক, কটকের ক্রেতা	বোলপুরের উৎপাদক, দিল্লীর ক্রেতা	হাপুরের (u. p.) উৎপাদক, দিল্লীর ক্রেতা	সোগরের উৎপাদক, বোম্বাই-এর ক্রেতা
উৎপাদকের অংশ ...	৭৭·৮	৫৭·৮	৮৩·২	৬৩·১
পরিবহন ব্যয় ...	—	১৩·২	২·১	২১·৭
বিবিধ ব্যয় ... (গোছান, বাঁধাই, ওজন করান প্রভৃতি—ইহার মধ্যে পাইকারদের কিছু অংশ পাওনা থাকে)	১২·৯	২২·৮	৮·৯	১০·৬
পাইকারদের অংশ	২·৯	২·৫	১·০	০·৮
খুচরাদারদের অংশ	৬·৪	৩·৭	৪·৮	৩·৮
	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

৪ Article by *Poduval* on Prices, trade & Marketing in 'Studies in Indian Agricultural Economics'—P. 80.

দেখা যাইতেছে, উৎপাদন-কেন্দ্র ভোগ-কেন্দ্রের যত নিকটে, ক্রেতার টাকার তত বেশি অংশ উৎপাদক পাইয়া থাকে।

কৃষিপণ্যের বিক্রয় কাঠামো কত বেশি অসম্পূর্ণ তাহার আর একটি সূচক হইল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং একই অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ের বা মরসুমের মধ্যে দামের তীব্র পার্থক্য। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট* বলিতেছেন "ইহা হইতেই ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর চলনহীনতা ও অসংলগ্ন চরিত্র বোঝা যায়। সারা ভারতীয় গড় দাম স্তরের মধ্যে দামের আঞ্চলিক পার্থক্য ধরা পড়ে না, ১৯৫৭ সালের জুন মাসে পাটনায় চালের দাম ছিল প্রতি মণ ২৩ টাকা, কটকে ১৬·৭৫ টাকা, ইম্ফলে ৭·২৫ টাকা। সেই সময়ে গমের দাম ছিল বোম্বাই-এ ১৯·২৫ টাকা অথচ কাণপুরে ১২·৮১ টাকা। প্রকৃতপক্ষে গত পাঁচ বৎসরে দামে আঞ্চলিক ও মরসুমী এত বেশি পার্থক্য থাকাতেই অর্থনৈতিক কাঠামোকে এত কষ্ট ও চাপ সহ্য করিতে হইয়াছে।"

আঞ্চলিক ও মরসুমী পার্থক্য

বর্তমান বিক্রয় সংগঠন উন্নত করার উপায় ও কার্যসূচী (Methods & programmes of improving present marketing organisation)

ক্রেতার টাকার বেশি অংশ উৎপাদকের হাতে আসার অন্যতম প্রধান উপায় হইল বিক্রয় সংগঠন উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ, ১৯৩৭ সালের কৃষিউৎপন্ন (মান নির্ণয় ও নিরূপণ) আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের গুণগত মান নিরূপণ করার ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আরও অধিকসংখ্যক দ্রব্যকে গুণগত নিয়ন্ত্রণের (quality control) অধীনে লইয়া আসার জন্য নাগপুরে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আটটি গুণগত নিয়ন্ত্রণের গবেষণাগার (quality control laboratory) স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুসংগঠিত বাজার (regulated markets) গড়িয়া তোলার উপর অধিক পরিমাণে জোর দেওয়া সুরু হইয়াছে। এই সকল সুসংগঠিত বাজারে-বাজারী-আদায়ের (Market charges) পরিমাণ স্পষ্ট উল্লিখিত

১। গুণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

২। সুসংগঠিত বাজার স্থাপন

* Report of the Food grains Enquiry committee P. 14-15

থাকে এবং অতিরিক্ত কমিশন, বিভিন্ন প্রকার আদায়, কম ওজন প্রভৃতি থাকিতে পারে না। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৭০০টি বাজারের মধ্যে ১৯৫০—৫১ সালে ২৬৫টি ছিল সুসংগঠিত; প্রথম পরিকল্পনার শেষে এইরূপ বাজারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৪৫০টি এবং ১৯৫৭ সালে ৫২১টি। খাদ্যশস্যের বাজারে ফাট্‌কাদারি (speculation) বা ভবিষ্যৎ-বাজারের (Future markets) ফাট্‌কাদারি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫২ সালে ভারত সরকার অগ্রচুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন (Forward Contract Regulation Act) পাশ করিয়াছিলেন এবং এই চুক্তি কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য অগ্রবাজার কমিশন (Forward Markets Commission) ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়। দামের তীব্র উঠানামা বন্ধ করার জন্য এবং একচেটীয় ফাট্‌কাদারি রোধ করাব উদ্দেশ্যে এই কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বাজার স্থাপন করেন এবং উহাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩। সমবায় বিক্রয় সংগঠন

তৃতীয়তঃ, চাষীর জন্য, চাষীর দ্বারা এবং চাষীদের বিক্রয় সংগঠন অর্থাৎ সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কাজ ভারতে তত বেশি অগ্রসর হয় নাই। মোটমাট ভারতে ১৪টি রাজ্য বিক্রয় সমিতি (State Marketing Societies), প্রায় ২০০০ বিক্রয় ইউনিয়ন অথবা ফেডারেশন (Marketing unions or Federations) এবং প্রায় ১০০০০ প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি (Primary marketing Societies) আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সমবায় আন্দোলন প্রসারের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ গ্রাম্য ঋণ প্র ারের উদ্দেশ্যে, কৃষকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য, বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য, ফসল বিক্রয়ের সহিত কৃষিঋণের সংযোগ স্থাপন করার কথা বলা হইয়াছে। সারা ভারত গ্রাম্যঋণ অনুসন্ধান-এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া এই কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। এই কার্যসূচী অনুযায়ী রাজ্য, জিলা ও গ্রাম স্তরেও সমবায় সমিতির সহিত সরকারী অংশীদারিত্ব যুক্ত হইবে।

কৃষি পণ্যের দামে তীব্র উঠানামা বন্ধ করা; সকল প্রধান দ্রব্যের বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করা; শস্যের গুণগত মান নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নত করা; ঋণ, শস্যশোধন (Processing) ও বিক্রয় কার্যকে কেন্দ্রীভূত করা; মজুত ও গুদামজাত করার সুবিধা বাড়ান, সকল কিছুর উদ্দেশ্য হইল চাষীর আয়

বাড়ান এবং ক্রমশ বেশি পরিমাণে তাহাকে বাজার-মুখী (market-oriented) করিয়া তোলা। কৃষিকে বেসরকারী-ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং কোটি কোটি ক্ষুদ্র চাষীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপরই কৃষি উৎপাদন ও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করিতে হইলে কতদূর কৃষিক্ষেত্রকে বেসরকারী রাখা যায় সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্র বেসরকারী রাখিতেই হয়, তবে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়াইবার ও সংগ্রহের সুবিধার জন্যই স্বেচ্ছাকৃত সমবায় চাষ সমিতি ও সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দরকার। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে মুনাফা শিকারী সমবায় চাষ সমিতি ও সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া উঠিলেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ সফল হইতে পারে না। এই সকল সমিতি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত, ইহাদের গ্রামাঞ্চলিক যৌথ মূলধনী কারবার বলিলেও বিশেষ ভুল হয় না। সমবায় চাষ ও বিক্রয় সমিতিদের মিলিত সংগঠন যদি কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ায়, যোগান সংকুচিত রাখিয়া দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে কি অবস্থা সৃষ্টি হইবে? সেই দিক বিচার করিলে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য এবং উহার প্রসারই দেশের চাষী ও মজুর উভয় শ্রেণীকে একযোগে রক্ষা করিতে পারে।

সমবায় বিক্রয় কাঠামো অথবা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য?

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষি মজুর : আয়, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ

Agricultural Labourers : their income, employment and future

কৃষিমজুর শ্রেণীর উদ্ভব (Growth of Agricultural labourers)

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে চাষী ও কুটিরশিল্পীরা পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া বসবাস করিত। কৃষি ও কুটির শিল্পের এই ভারসাম্যের মধ্যে ভূমিহীন বা শিল্পহীন একদল গ্রাম্য সর্বহারা (rural proletariat) বা কৃষি মজুর শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই। উপরে ভাঙন ধরিলেও সুদূর গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র অটুট থাকায় চাষীরা জমির সহিত সংলগ্ন অবস্থাতেই ছিল[১]। ভাড়া করা মজুরের সাহায্যে চাষের কাজ হইত না।

সামন্ততন্ত্রে "স্বাধীন" কৃষি মজুর থাকে না

ইংরাজ শাসনের ফলে দ্রুত এই প্রকার গ্রামসমাজ ভাঙিয়া যাইতে সুরু করিয়াছিল এবং সেই ভাঙনের প্রকাশ হইল একদল ভূমিহীন কৃষি মজুর শ্রেণীর উদ্ভব। ১৮৬৫ সালে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ কমিশন এই শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিতেছেন। "আমাদের সকল বাণিজ্য এবং প্রচেষ্টা, আমাদের সুবৃহৎ কাজকর্ম এবং উন্নত ধরনের ব্যবস্থা কেবল এমন একদল মজুর শ্রেণী সৃষ্টি করে বা উহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দেয় যাহারা মজুরীর উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত এবং সম্পদের বৃদ্ধির ফলে ধনীরা এই মজুর দল পোষে, ইহারা আর দাসও নয়, ভূমিদাসও নয়[২]।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে দেশের মোট

ব্রিটিশ আমলে উহার উদ্ভব

১...... "in 1842, Sir Thomas Munro as Census Commissioner reported that there were no landless peasants in India, an undoubtedly incorrect picture, but indicating that the numbers were not considered to require statistical measurement."—*R. P. Dutt*, India Today, P. 198.

২ *Report of the Orrissa Famine Commission* (1865) : quoted by Leland Hamilton Jenks in "The Migration of British capital to 1875," P. 228.

কৃষি জনসংখ্যার কম অংশই কৃষি মজুর ছিল বলিয়া মনে করা চলে। ১৮৭১—৭২ সালে ইহা ছিল ১৮%, ১৮৮১ সালে ১৫% এবং ১৮৯১ সালে ১৩%।[৩]

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৮৯৬—৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ এবং সেই ক্ষতি কাটাইয়া উঠিবার পূর্বেই ১৮৯৯—১৯০০ সালের দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ। বিংশশতাব্দী সুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে' পাঁচবৎসরের এই দুর্ভিক্ষগুলি তথাকথিত কৃষি সমৃদ্ধির যুগ শেষ করিয়া দিল এবং ভূমিহীন নিরন্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিল। গরীব চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক সর্বাধিক কষ্ট ও দুর্দশার মধ্য দিয়া পার হইল[৪]।

এবং কৃষি-অর্থনীতির ভাঙনে ইহার বৃদ্ধি

১৯০১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় কৃষি মজুরের সংখ্যা হইয়াছে ২৫%, অর্থাৎ দশ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সাময়িকভাবে দুর্ভিক্ষরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে ইহা দাঁড়াইল ২২%, ১৯২১ সালে ইহা হইল ২৬·২% এবং যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ১৯৩১ সালের আদমসুমারি কমিশনার বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন "অনুপাতে এত বেশি পরিবর্তন কিছুটা আশ্চর্যজনক[৫]।"

১৯৩১ সালের আদম সুমারিতে কৃষিমজুরের সংখ্যা ধরা হইয়াছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এক লেখক ইহাদের নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়াছিলেন[৬]:

(ক) ভূমিসংলগ্ন মজুর (Bonded Labourers) ৩০ লক্ষ

---

৩ *Surendra J. Patel*: Agricultural Labourers in India & Pakistan P. 12.

৪ *P. N. Benerjee*, A study of India Economics (5th Edn) P. 263

৫ "In any case, the change in ratio is somewhat remarkable, even when adopting the lowest ratio which can be compared with that of 1921. Possibly the explanation is that a large increase has taken place in the agricultural population without a corresponding increase in actual holders of land, whether as tenants or owners, though it is likely that a concentration of land in the hands of non-cultivating owners is also taking place."—*Census of India* (1931) I, Part I, 288—89

৬ *Surendra* J. *Patel*: Agricultural Labourers in Modern India & Pakistan P. 148

(খ) অপূর্ণ নিযুক্ত মজুর (Under-employed Labourers) ৩ কোটি ৫০ লক্ষ।

(গ) সারাবৎসরের "স্বাধীন" মজুর (Full-time "Free" wage Labourers) ৪০ লক্ষ।

কৃষিমজুরদের বর্তমান অবস্থা : কৃষিমজুর অনুসন্ধান কমিটির বিবরণী

(Present position of Agricultural Labourers : Report of the Agricultural Labour Enquiry, 1950--51)

১৯৫০—৫১ সালে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর সারা দেশের কৃষিমজুরদের কাজকর্ম ও জীবনযাপন সম্পর্কে একটি ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানের 'পরিবার'-কে অর্থ-নৈতিক ইউনিট ধরা হইয়াছিল। কৃষিমজুর পরিবার বলিলে বোঝা যায় এমন পরিবার যাহার কর্তা বা অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিমজুর। অপরপক্ষে, কৃষিমজুর হইল সেই ব্যক্তি যে মোট কর্মে নিযুক্ত দিনের অর্ধেকের বেশি অপরের কৃষিকার্যে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করে। এইরূপে যাহাদের অল্প কিছু জমি আছে কিন্তু প্রধানতঃ মজুরির সাহায্যে জীবনধারণ করে, তাহাদেরও মজুর হিসাবে ধরা হইয়াছিল।

কৃষিমজুর কাহাকে বলে

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, (ক) মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০·৪টি পরিবারই কৃষিমজুর পরিবার। এই ১ কোটি ৭৬ লক্ষ কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে অর্ধেকের অল্প কিছু জমি আছে, বাকি অর্ধেকের কোন জমি নাই। যাহাদের জমি আছে, তাহাদের গড় মালিকানার পরিমাণ ২·৯ একর।

পরিমাণ

(খ) সংলগ্ন (Attatched) ও অসংলগ্ন (Casual) দুই শ্রেণীতে কৃষি-মজুরদের ভাগ করা হইয়াছে। সংলগ্ন মজুরদের·মোটামুটি নিয়মিত কাজ থাকে এবং কাজের সময় মালিকের সঙ্গে কোন না কোন ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। এই সংলগ্ন শ্রমিকেরা প্রকৃতপক্ষে দাসশ্রেণীর, বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের সহিত বিভিন্ন ধরণের "চুক্তি" থাকে। যেমন, বিহারে কোন না কোন সময়ে অভাবের তাড়নায় ইহারা ঋণ লয় এবং সেই ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত দাস হিসাবে কাজ চালাইয়া যায়, মালিককে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। পশ্চিমবাংলার ভাগ চাষীরাও প্রকৃত পক্ষে এইরূপ সংলগ্ন কৃষিমজুর। কেরালাতে "সংলগ্ন" মজুরেরা গৃহভৃত্যের কাজও করিতে রাজি থাকিলে তবে তাহার থাকার জায়গা

দুই প্রকার—সংলগ্ন ও স্বাধীন

ও খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে চুক্তির কথা উঠে। অসংলগ্ন মজুররাই "স্বাধীন", তবে সারা বৎসরে কতদিন কাজ থাকিবে তাহার কোন নির্দিষ্টতা নাই। "অসংলগ্ন" শ্রমিকদের অবস্থা তাই অর্থনৈতিক দিক হইতে আরও শোচনীয়। অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, "অসংলগ্ন" কৃষিমজুরের সংখ্যা ভারতে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মোট কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে ৮৫.২%, অর্থাৎ ১২ কোটি কৃষিমজুর পরিবারই অসংলগ্ন, অবশিষ্ট সংলগ্ন।

(গ) অনুসন্ধানের বিবরণী হইতে কৃষি মজুরদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে জানা যায় বৎসরে "সংলগ্ন" পুরুষ শ্রমিকেরা ৩১২ দিন এবং "অসংলগ্ন" পুরুষ মজুরেরা ২০৭ দিন কর্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট সময়ে ইহারা মোটামুটি বেকার থাকে বলা চলে [৭]।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মসংস্থান ও বেকারির পরিমাণে বহু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ এই পার্থক্য দেখা যায় বহু কারণে, যেমন জলসেচ ও দুই-ফসল উৎপাদন, উর্বরতা, ফসল উৎপাদনের ধরণ (cropping Pattern), জমিতে জনসংখ্যার চাপ, আঞ্চলিক ভূমিস্বত্ব, শিল্পের নৈকট্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের বিভিন্নতার জন্য।

ইহাদের বেকারির পরিমাপ

কৃষি মজুরদের বেকারির প্রধান কারণ হইল কাজের অভাব, মোট বেকার দিনের মধ্যে ৭৪.৪% দিনই কাজের অভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। অন্যান্য দিন অসুস্থতা, ঝড়বাদল প্রভৃতির জন্য বেকার কাটে।

(ঘ) কৃষি মজুরদের আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, বৎসরে গড়ে পরিবার-প্রতি আয়ের পরিমাণ হইল ৪৮৭ টাকা। মাথাপিছু গড় আয়ের পরিমাণ ১০৪ টাকা। যখন ভারতের সকল অধিবাসীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৬৫ টাকা, (১৯৫০-৫১ সালে), তখন গ্রামাঞ্চলের এত পরিমাণ লোকের আয় মাসে ৯ টাকারও কম, ইহা মনে রাখা দরকার।

ইহাদের আয়

---

৭ নীচের তালিকা হইতে কর্মসংস্থান ও বেকারির পরিমাণ বোঝা যাইবে। মোট কৃষি মজুরের মধ্যে ৫৫ পুরুষ°/。 শ্রমিক, বাকী অংশ স্ত্রীলোক।

কোন ধরণের কৃষি মজুর পরিবার	কৃষি কার্য	অকৃষি কার্য	মোট কর্মসংস্থান দিনের হিসাবে	মোট বেকারি দিনের হিসাবে
অসংলগ্ন কৃষি শ্রমিক	১৭৬	৩১	২০৭	১৫৮
সংলগ্ন কৃষি শ্রমিক	২৯৯	১৩	৩১২	৫৩
সকল কৃষি মজুরের গড় কর্মসংস্থান	১৮৯	২৯	২১৮	১৩৭
স্ত্রী মজুর (প্রধানতঃ অসংলগ্ন)	১২০	১৪	১৩৪	২৩১

গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় কৃষি মজুরদের অবস্থা অনেক খারাপ। মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ অন্যান্য সকল পরিবারের তুলনায় অনেক কম। সারা দেশের গ্রাম্য পরিবারের বৎসরে গড় ব্যয় হইল ২০৪ টাকা, কৃষি-মজুরদের হইল ১০৭ টাকা। অন্যান্য গ্রাম্য পরিবার খাদ্যের পিছনে আয়ের ৭৪% ব্যয় করে, কৃষিমজুর পরিবার ব্যয় করে ৮৫%। বস্ত্রের উপর অন্যান্য পরিবার ব্যয় করে ১৩'৪%, কিন্তু কৃষি মজুর পরিবার ব্যয় করে ৬৪%।

ইহাদের ব্যয়

ভারতের মোট কৃষি মজুর পরিবারের আয় ৭১০ কোটি টাকা ধরা যাইতে পারে; সেই সময়ের জাতীয় আয়ের (৯৫৩০ কোটি টাকা) তুলনায় হিসাব করিলে দেখা যায় ভারতের মোট পরিবার-সংখ্যায় ২২'৭% ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ৮'৩% পাইয়া থাকে।

জাতীয় আয়ের তুলনায় ইহাদের আয়

বর্তমান অবস্থার গতি (Trend of the Present Situation)

১৯৫০-৫১ সালের অনুসন্ধানের পরে প্রায় দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কৃষিমজুর শ্রেণীর অবস্থা এই কয় বৎসরে বর্তমানে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা আলোচনা করা দরকার। ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থার সংস্কারের চাপে ভারতের জমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা এবং "অসংলগ্ন" মজুরের সংখ্যা অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভাগচাষী, নিম্ন প্রজাগণ এবং জমিদারেরা অনেক ক্ষেত্রে চাষের স্বত্ব আছে এমন চাষীদেরও উচ্ছেদ করিতেছে। কি করিয়া জমিদারেরা ভূমি সংস্কার আইনের সাহায্যে উচ্ছেদ করিতেছে তাহা পুনরালোচনা করা দরকার।

পরিমাণ বাড়িতেছে

পরিকল্পনা কমিশনের নীতি হইল ব্যক্তির হাতে জমির পরিমাণ বাঁধিয়া বাকীটা চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা (মনে রাখা দরকার যে ইহার জন্য চাষীদের দাম দিতে হইবে, বিনামূল্যে পাইবে না)। কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের আইনে ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সর্বোচ্চ পরিমাণের সীমা খুবই উঁচুতে ধরা হইয়াছে এবং নিজ-চাষের জন্য সেই পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে বলা হইয়াছে। "নিজ-চাষ" ব্যাখ্যা করা হইয়াছে নিজের জন্য চাষ হিসাবে, নিজের দ্বারা চাষ নয়। ফলে মজুর লাগাইয়া, ভৃত্য খাটাইয়া, ভাগ চাষী নিয়োগ করিয়া বা নগদ খাজনার

কেন ও কিরূপে

বিনিময়ে ইচ্ছা-চাষীর দ্বারা সেই সকল জমি চাষ করান চলে—ইহা আইনেই স্বীকৃত হইয়াছে। এই ধরণের আইনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছে যাহাতে জমিতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিতে না পারে সেই জন্য তাহাদের উচ্ছেদ[৮] এবং মজুর হিসাবে সেই জমিতেই পুনর্নিয়োগ। তাহা ছাড়া, আরও অনেক কারণে উচ্ছেদ সম্ভব হইবে, যেমন আইনে বলা হইয়াছে, ঠিক সময়মত খাজনা না দেওয়া, গ্রামের অন্যান্য জমির সমান পরিমাণ উৎপাদন না করা প্রভৃতি। আইন ছাড়াও বেআইনী ভাবে, কাগজপত্র পাল্টাইয়া এবং সরাসরি জোর করিয়া উচ্ছেদের পরিমাণও ভারতে এমন্ কিছু কম ঘটিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে চাষীদের সাদা কাগজে টিপ সহি দেওয়াইয়া লিখিয়া নেওয়া হইতেছে যে, তাহারা ভাগচাষী নয়, মজুর। এই রূপ মজুর-কবুলিয়তকে সরকার স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির মর্যাদা দিতেছেন। এইরূপে ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রত্যক্ষ ফলই হইল জমিহীন অসংলগ্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি। আইনের চক্ষে বর্তমানে তাঁহারা স্বাধীন মজুর, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি এখনও ঘটে নাই, ইহাই বাস্তব চিত্র।

সুতরাং বর্তমানের সরকারী নীতি ভূমিহীন চাষীর কোন উপকার করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। বলা হইতেছে, যে পরিমাণ জমি (অনুন্নত, পতিত বা চাষের অযোগ্য) জমিদারেরা ছাড়িয়া দিবে বা ভূদান যজ্ঞে পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। যুক্তপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় বলা যায় বহু মাঝারি চাষীও জমি কিনিবার মত টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, ভারতে কোথাও পারিবে না। পরিকল্পনা কমিশন পর্যন্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন, জমি বিক্রয় হইবে। ভূমিহীন কৃষি মজুর যাহার মাথাপিছু মাসে ৯ টাকার কম আয়—সে কি এই জমি কিনিয়া লইবে? ইহা কেহই আশা করেন না। তবে এই জমি কে কিনিবে? নিশ্চয়ই তাহারা যাহাদের নিজস্ব নামে, বেনামে চাকর বাকরের নামে, দেবতার পূজার নামে জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমার কম আছে।

এইরূপে যখন জমি বণ্টন শেষ হইবে তখন জমিসম্পন্ন এই সকল বৃহৎ জমিদারদের লইয়া—ইহারা এখন আইনের চক্ষে "চাষীতে" পরিণত হইয়াছে

---

[৮] "The landlords, therefore retain the right to eject all or any tenant on the ground of personal cultivation."—*H. D. Malaviya.* Land Reforms P. 451

—সমবায় চাষ সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে। এই সকল তথাকথিত "চাষী" নিজেরা চাষ করে না, তাই এই সকল সমবায় চাষ সমিতি প্রকৃতপক্ষে যৌথ মূলধনী কারবারে পরিণত হইবে এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজুর খাটাইয়া চাষের কাজ সুরু হইবে। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে এই দিকেই ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছে।

ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ

সেই নূতন কৃষি অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষি মজুরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। ধনতন্ত্রের বিকাশে শ্রমিকের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যত বেশি সংখ্যক ভূমি সম্পন্ন ও "সংলগ্ন" কৃষি মজুর ভূমিহীন ও "অসংলগ্ন" কৃষি মজুরে পরিণত হয়, মজুরির হার ও কার্যের সর্ত ততই "সমবায়ী চাষীদের" উদ্বৃত্ত সৃষ্টির সাহায্য করিবে। ভারতে ধনতান্ত্রিক পুঁজির বিকাশ ঘটিতে সাহায্য করাই ক্রমবর্ধমান কৃষি মজুর শ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য।

সেই কাঠামোতে কৃষি মজুরের স্থান

দুঃখের কথা এই যে, ভারতে শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুত নয়, ফলে কৃষিজ দ্রব্যের বাজার আরও দ্রুত বাড়িতেছে না এবং কৃষির পূর্ণ যন্ত্রীকরণ সম্ভব হইতেছে না, তাই কৃষিতে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক বিকাশে দেরি হইতেছে। তাহা ছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত থাকায় কৃষি মজুরের সংখ্যা কম নাই। শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিই ধনতান্ত্রিক চাষে এখনও কম ব্যয়শীল, ততদিন কৃষি মজুর শ্রেণীকে প্রায় ভূমিদাস থাকিতে হইবে।

মন-টন, একর-বিঘা ও লক্ষ-কোটির অন্তরালে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির কাঠামোতে ও শ্রেণী বিন্যাসে এই পট-পরিবর্তন ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অবস্থা উন্নতির জন্য সরকারী নীতি (Government measures for improvment)

কৃষিমজুরদের অবস্থা উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা ১৯৫০ সালে কংগ্রেসের কৃষি সংস্কার কমিটিও (Congress Agrarian Reforms Committee) স্বীকার করিয়াছেন[৯]।

১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজুরী আইন বিধিবদ্ধ করার সময়ে উহার

[৯] "to leave out the problem of agricultural labour in any scheme of agrarian reforms as has been done so far—is to leave unattended a weeping wound in the agrarian system of the country."

এক্তিয়ারের মধ্যে কৃষি মজুরদের ধরা হইয়াছে। সেই আইন অনুসারে তিন বৎসরের মধ্যে কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরি রাজ্য সরকারগুলি স্থির করিবে এইরূপ কথা ছিল। কয়েকটি রাজ্যসরকার এইরূপ আইন পাশ করিয়াছে—কিন্তু উহাদের কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব হইতেছে না। কোনরূপ সংঘে অসংগঠিত এবং অশিক্ষিত কৃষি মজুররা আইন-নির্ধারিত মজুরি আদায় করিতে পারিতেছে না। সর্বত্র যেরূপ হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে, নিম্নতম মজুরির হার ঊর্ধতম মজুরির সীমাতে পরিণত হইয়াছে।

নিম্নতম মজুরী আইন

প্রথম পরিকল্পনা এই বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছিল ; (ক) ভূমিদান আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া সেই জমি ইহাদের দিতে হইবে, (খ) পতিত জমি উদ্ধার করিয়া ইহাদের সমবায় সমিতির হাতে দিতে হইবে। ইহাদের সমবায় পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ করিয়া স্থানীয় জলসেচ বা খনন কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। (ঘ) ইহাদের সমবায় সমিতিকে গৃহ নির্মাণ, চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা জীবজন্তু কেনার জন্য ঋণ দিতে হইবে। (ঙ) শিক্ষার জন্য সাহায্য করিতে হইবে। এই সকল কার্যের জন্য ১২ কোটি টাকা এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনার কার্যসূচী

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ইহাদের উন্নতির কথা বলা হইয়াছে। (ক) মিশ্র চাষ অর্থাৎ পশুপালন প্রভৃতি বাড়াইতে হইবে, (খ) ক্ষুদ্র ও গ্রাম শিল্পের প্রসার ঘটাইতে হইবে, (গ) ইহাদের সামাজিক পদমর্যাদা, দক্ষতা, উৎসাহ ও যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য ইহাদের জমি দিতে হইবে ও শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইবে। (ঘ) গ্রামোন্নয়ন ও সমাজোন্নয়ন কার্যসূচীর মধ্য দিয়া ইহাদের উন্নতি ত্বরান্বিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০০০০০ একর জমিতে ২০০০০ পরিবারের বসতি করাইবার জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য ৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করাও হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী

বিংশ পরিচ্ছেদ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা

Community Development Projects

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে গেলে যে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন দরকার তাহার জন্য প্রথমে কৃষির উন্নতি কিছুটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিনিয়োগযোগ্য প্রাথমিক উপকরণসমূহ প্রধানতঃ কৃষি হইতেই আসিতে পারে। প্রথমতঃ অকৃষিগত কাজকর্ম করার মত শ্রমিক, দ্বিতীয়তঃ, শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মত খাদ্য ও কাঁচামাল, তৃতীয়তঃ, কৃষিতে ও শিল্পে নিযুক্ত হইবার মত বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত এবং চতুর্থতঃ, কৃষিজাতপণ্য রপ্তানি করিয়া দরকারী বৈদেশিক মুদ্রা—এই সকল পাইতে হইলে কৃষিপদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন (Rationalisation) করা খুবই দরকার। কৃষি উৎপাদনপদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পুনর্গঠনের ফল হইল কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি, একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং সেই উদ্বৃত্ত সংগ্রহ, উৎপাদনের কিছু অংশ রপ্তানি করা সবই গ্রাম্য অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পরস্পর-নির্ভরশীল দিক (Complimentary aspects of rural eonomic growth)। গ্রাম্য অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো উপযুক্তভাবে গঠিত আছে কি না বা গঠিত হইতেছে কি না তাহা বিচারের মাপকাঠিই হইল উপরের চারি উপায়ে সেই গ্রামীণ কাঠামো সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেছে কি না।

গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর উপযুক্ততা বিচারের মাপকাঠি

ধনতান্ত্রিক পূর্ণোন্নত দেশসমূহে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা, সামন্ততান্ত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা, সব কিছু দূর করিয়া কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল; ধনতন্ত্র নিজেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে সুস্পষ্টভাবে বাজার-মুখী (Market-oriented) করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের বিস্তারের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছিল, পূর্ণ সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় যৌথখামার গড়িয়া

তুলিয়া উহাদেরই হাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো গড়িয়া তোলার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিল। চীনে সারা দেশ ব্যাপিয়া যে কম্যুন গড়ার আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপযোগী কৃষি ও গ্রামকাঠামো গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী গ্রামীণ কাঠামো গড়িয়া তোলার প্রয়াস[১]।

ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নিজেই সেই কাঠামো গড়িয়া লয়

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects)

মোটামুটি সমস্বার্থ ও সমদৃষ্টিভঙ্গীবিশিষ্ট একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জনসমষ্টির যন্ত্রজ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী; অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ ও কাজকর্ম; এবং সামাজিক অশিক্ষা কুসংস্কার মনোবৃত্তি সকল দিক হইতে একযোগে উন্নতি করিতে না পারিলে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর নয়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও তাই। নির্দিষ্ট এলাকায় একযোগে সকল দিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা ঘনীভূত করিলে দ্রুত ও অধিক উন্নতি হওয়া সম্ভবপর; বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন স্তরের উন্নতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অগ্রসর হইতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত এক একটি জনসমষ্টিতে এক একটি বহুমুখী সংগঠন থাকিবে এবং এই অঞ্চলের প্রতিটি গৃহে সেই সংগঠন তাহার উন্নয়ন-প্রচেষ্টা প্রসার করিবে। জনসাধারণ নিজেরাই নিজ অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করায় অংশ গ্রহণ করিবে; উপর হইতে উন্নতি না চাপাইয়া তাহাদের নিজেদের মনের মধ্যে সামগ্রিক ও সমষ্টিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আবেগ সৃষ্টি করিবে। গ্রামাঞ্চলে স্বতঃসঞ্জাত উৎসাহ ও দৃঢ় মনোভঙ্গী আনিয়াই সমাজোন্নয়ন মেটাইতে হইবে—এই পরিকল্পনার ইহাই মূলনীতি।

ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি

সাধারণতঃ, দুই ধরণের সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতে স্থাপিত হইয়াছে মূল প্রজেক্ট ও মিশ্র প্রজেক্ট (Basic Project and composite Projects)। মূল প্রজেক্টে প্রধানতঃ কৃষি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; মিশ্র প্রজেক্টে

মূল ও মিশ্র প্রচেষ্টা

[১] জার্মানীতে একটি প্রবাদ আছে যে, ভাঁড়ারে মাংস থাকিবে কি না তাহা কখনও রান্নাঘরে স্থির হয় না, দ্রুত মূলধন-প্রধান শিল্পোন্নয়নের যুগে কৃষি অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ কখনও কৃষিক্ষেত্রে বা নিছক গ্রামের স্বার্থে গড়িয়া উঠে না।

ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধাসহর-আধাগ্রাম জাতীয় ছোট ছোট নগরাঞ্চল গড়িয়া তোলার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

সংগঠন

প্রত্যেকটি প্রজেক্ট এলাকা গঠিত হইবে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া, ৩০০ গ্রাম লইয়া, ১২ লক্ষ একর কর্ষিত ভূমি ব্যাপিয়া এবং ২ লক্ষ অধিবাসী লইয়া। এইরূপ এক একটি প্রজেক্ট এলাকাকে আবার ৩টি করিয়া উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে; প্রত্যেকটি উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে ১০০ গ্রাম জুড়িয়া এবং আনুমানিক ৭০০০০ অধিবাসী লইয়া। প্রত্যেকটি উন্নয়নব্লককে বিভক্ত করা হইবে ৫টি গ্রাম লইয়া এক একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলে। এক একটি এইরূপ ক্ষুদ্রাঞ্চলে গ্রাম্যস্তরের এক একজন কর্মী উন্নয়নমূলক কার্যাদি চালাইয়া যাইবে।

পরিচালনা

প্রত্যেকটি প্রজেক্টে এক একজন প্রজেক্ট অফিসার থাকিবেন এবং প্রত্যেকটি ব্লকে একে একজন ব্লক উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন। ইহাদের সহিত ১২ জন বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ অফিসার থাকিবেন। প্রজেক্ট অফিসারকে সাহায্য করার জন্য এক একটি প্রজেক্ট উপদেষ্টা কমিটি (Project Advisory Committee) থাকিবে, ইহা গঠিত হইবে রাজনৈতিক নেতা, জনকল্যাণকর্মী, প্রতিনিধিস্থানীয় চাষী, সংসদ ও আইনসভার স্থানীয় সদস্যগণ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান সরকারী কর্মচারীগণ প্রভৃতি লইয়া।

প্রত্যেক জেলাতে জেলা উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন, জেলা উন্নয়ন বোর্ড তাহাকে সাহায্য করিবে। রাজ্যের সকল কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একজন রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার থাকিবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রীদের লইয়া একটি রাজ্য উন্নয়ন কমিটি থাকিবে। পরিকল্পনা কমিশন হইতে সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে।

প্রধান কাজকর্ম

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের প্রধান কাজ হইল কৃষি উন্নয়ন, পথঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার, সেই এলাকার অধিবাসীদের কর্মসংস্থান বাড়ান, জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিক্ষাদান এবং জন কল্যাণ বৃদ্ধি করা। কৃষি উন্নয়নের কার্যসূচীর মধ্যে আছে পতিত জমির উদ্ধার, ছোটখাট জলসেচের ব্যবস্থা করা, উন্নত ধরণের বীজ, সার ও চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রভৃতি। পথঘাট উন্নয়নের কাজ যাহাতে জনসাধারণের স্বেচ্ছাদত্ত শ্রমে হয় সেই প্রচেষ্টা

করা দরকার এবং লক্ষ্য হইল প্রজেক্ট এলাকার প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রধান রাস্তা গড়িয়া তোলা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, হাতের কাজ ও যন্ত্রবিদ্যার প্রসার, প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে প্রাথমিক ইউনিট, দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসা ইউনিট—ইহাদের সহিত প্রজেক্ট পরিচালনা কেন্দ্রে হাসপাতাল, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র ও ঔষধালয় প্রভৃতি স্থাপন করা, ইহার কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি প্রজেক্ট এলাকাতে ৩ বছরে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে হিসাব করা হইয়াছিল এবং প্রথম পরিকল্পনাতে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা পরিকল্পনার জন্য মোট ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মোট ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। ভারত-মার্কিন টেক্‌নিকাল সহযোগিতা স্কীম (Indo-U. S. Technical Co-operation Scheme) অনুযায়ী এই ব্যয়ের প্রায় ১১% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রকৌশলগত উপদেশের আকারে প্রধানতঃ এই সাহায্য আসে।

অর্থ সংগ্রহ ও বরাদ্দ

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service)

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য প্রথমে ভারত সরকার আরও-খাদ্য-বাড়াও কমিটির (Grow more food Committee) সুপারিশে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। গ্রাম জীবনের সকল দিকে সুসংহত উন্নয়ন আনিয়া সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করাই জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যের লক্ষ্য। প্রথম পরিকল্পনায় এইরূপ ১২০০ ব্লক স্থাপন করা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সারা ভারতের সকল গ্রামকে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা পরিকল্পিত হইয়াছে। আমেরিকাতে এইরূপ প্রসার কার্য (extension) বা উপদেশমূলক কার্য দেখিতে পাওয়া যায়—উহার অনুরূপ এই কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় সম্প্রসারণ বা সেবা এমন ধরণের এক সংগঠন যাহার মাধ্যমে প্রতিটি চাষীর গৃহে তাহার নিকটে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সচেতনতা পৌঁছাইবার চেষ্টা করা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। গণচেতনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করাই ইহার প্রধান নীতি।

সমাজোন্নয়নের তুলনায় কম ব্যাপক ও কম ব্যয়শীল

এক একটি মহল্লায় ১০০ হইতে ১২০টি গ্রাম লইয়া উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে এবং এই এলাকা একজন উন্নয়ন অফিসার বা সম্প্রসারণ অফিসার থাকিবে। তাহাকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ অন্যান্য অফিসার থাকিবে; প্রতি গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া এই কার্যে শিক্ষিত গ্রামসেবক থাকিবে।

গঠন

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বলবন্ত্রী মেহতা কমিটির অনুসন্ধান (Progess of Community Development Projects and findings of Balawantri Mehta Committee)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির রিপোর্ট হইতে সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানা যায়। দেখা যায়, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যক্রম ১৪০০০০ গ্রাম ব্যাপিয়া, ৯৮৮ উন্নয়ন ব্লকে ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ লোককে জুড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলে উন্নত ধরণের বীজ (১৭৬৬৬৬ টন), রাসায়নিক সার (৩৩৫২৮৫ টন) যোগান দেওয়া হইয়াছে। ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা হইতে প্রায় ২০ লক্ষ একর অতিরিক্ত এলাকা জলসিঞ্চিত হইয়াছে, পশুপালন কার্যসূচীর মাধ্যমে ২৫৬৩ গ্রামকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সমবায় সমিতির সংখ্যা ও উহার সভ্যসংখ্যাও বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রসার

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার দিকে সর্বদা নজর দিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি কার্যসূচী মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation organisation) নিয়োগ করিয়াছেন, উহা প্রতি বৎসর রিপোর্ট দিয়া আসিতেছে। উহার চতুর্থ রিপোর্টে' দেখা যায় যে, কার্যসূচীর তুলনায় প্রকৃত কাজ কম হইয়াছে; জলসেচ, জমি উদ্ধার, ভূমিক্ষয় রোধ ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতি সাধন প্রভৃতি কাজ কমই হইয়াছে। কুটিরশিল্পের প্রসার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (স্কুল সমবায় প্রভৃতি) গড়িয়া তোলার কাজ ততটা অগ্রসর হয় নাই। জন সাধারণের মনে উৎসাহ ও আত্মনির্ভরশীলতা ততটা জাগে নাই। সকল ব্লক সমান সুবিধা পায় নাই, ব্লকের মধ্যে গ্রামগুলিতে অসমান বণ্টন হইয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকল

কার্যসূচী মূল্যায়ন সংগঠনের রিপোর্ট'

শ্রেণী ইহার সুবিধা সমান ভোগ করে নাই, বর্ণগত ও অর্থগত কুলীন শ্রেণীর ব্যক্তিরাই নীচু ও গরীব শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে [২]।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদ উহার সদস্য শ্রীবলবন্ত্রী মেহতার সভাপতিত্বে একটি ষ্টাডি টীম (Study Team) নিযুক্ত করেন। এই টীমের প্রধান সুপারিশ হইল "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের" (Democratic Decentralisation) জন্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জিলা স্তরে জিলা পরিষদ স্থাপন করা। গ্রাম সেবককে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পাদক করা উচিত। একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি (Multipurpose Co-operative Society) স্থাপিত হইয়া স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা উচিত। কল্যাণমূলক কাজের ঝোঁক একটু কমাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া উচিত। বর্তমানের তিন স্তরের কার্যক্রম বাদ দিয়া অবিচ্ছিন্ন ছয় বৎসরের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা যে কার্যসূচীতে সম্মতি দিয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মতি পাইবার জন্য পাঠাইবার রীতি বাদ দেওয়া উচিত।

সংসদের ষ্টাডি টীমের রিপোর্ট

বলবন্ত্রী মেহতা কমিটির এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংশোধিত কার্যসূচী কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করে। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, প্রগাঢ় সমাজোন্নয়ন, এবং প্রগাঢ়োত্তর সমাজোন্নয়ন—এইরূপ বর্তমানের ত্রিস্তর ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া উহার স্থলে ৫ বৎসরের দুইটি স্তর রাখা হইল। এখন হইতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইল। যাহাতে সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে এই উদ্দেশ্যে ব্লক স্তরের কর্মীদের একটি কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। পঞ্চায়েতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আরোপ করা হইল, এবং ব্লক উন্নয়ন কার্যসূচীর বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ গৃহীত হইল। সমগ্র দেশকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার সীমারেখা ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে সরাইয়া ১৯৬২ সালেব অক্টোবর ধার্য করা হইল।

সংশোধিত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা

২ বিশ্বভারতী কৃষি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রের অনুসন্ধান রিপোর্টেও দেখা যায়, যে অঞ্চলে বর্ণগত বা অর্থগত সমতা বেশি, সেই অঞ্চলে এই পরিকল্পনা কিছুটা সফল হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাতে উচ্চ শ্রেণী বা ধনী শ্রেণী অধিকতর সুবিধা লাভ করিয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

খাদ্য

প্রসারণশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোতে খাদ্যের গুরুত্ব

(Importance of food in an Expanding economy)

খাদ্য উৎপাদনের গতিবেগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্যভোগের পরিমাণে বৃদ্ধি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ বিশেষ। বস্তুতঃ, অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি পরিমাপ করার জন্য অনেক ধনবিজ্ঞানী দেশের খাদ্য-ভারসাম্যের পরিবর্তনকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন।

শুধু তাহাই নহে। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার সর্তস্বরূপ; যে গতিতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তত দ্রুত বাড়িতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে শিল্প প্রসার সুরু হয়, তখন শিল্পে ও সহরাঞ্চলে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে। খাদ্যের উৎপাদন যত বাড়িতে থাকিবে, গ্রামাঞ্চলে ভোগবৃদ্ধি কম হইলে, উহা ততই শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের কাজে সাহায্য করিবে, শিল্পপ্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ দ্রুততর হইবে। তাহা ছাড়া, খাদ্যশস্যই অনুন্নত দেশে প্রধান কৃষিজ দ্রব্য, ইহার উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়িলে চাষীর আয় বৃদ্ধি হয়, শিল্পপ্রসারের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইতে পারে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়িলে তাই আয়, সঞ্চয় বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ করিলে চাষীর ও মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, খাদ্যোৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে লোক সরাইয়া মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োগ করা চলে। খাদ্যের রপ্তানি করিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা শিল্পদ্রব্য আনিতে পারা যায়, খাদ্য রপ্তানি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর নীচু থাকাও উন্নয়নকে সাহায্য করে, কারণ মজুরি কম দিতে হয়, ব্যবসায়ী ও

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগ ব্যয় কম হয়, উদ্বৃত্ত ও মূলধন-গঠনের হার বেশি হইতে পারে। অপূর্ণোন্নত দেশে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের পারস্পরিক দামের কাঠামোর ভর-কেন্দ্র হইল খাদ্যের দামস্তর, প্রধানতঃ ইহাই ভোগদ্রব্যের দামস্তরের উঠানামার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে খাদ্যের ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ন্যায় দেশে এই গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যাহাই হউক না কেন, বাৎসরিক মোট জনবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই বেশি। ভারতীয়দের ভোগ-কাঠামোতে খাদ্যশস্যের অনুপাত বেশি থাকায় এই গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতীয়গণ মোট যে ক্যালোরি গ্রহণ করেন, তাহার ৭৫ ভাগই খাদ্যশস্যের ভোগ হইতে সৃষ্টি হয়, অন্যান্য স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্য ও অধিক ক্যালোরি-প্রদানকারী খাদ্যের অভাব আছে। যে উন্নত জীবনযাত্রার মানে জনবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, সেই স্তরে পৌঁছাইতে হইলে খাদ্যোৎপাদন আরও বাড়ান দরকার। সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হয় শ্রমিকের উৎপাদনীশক্তি ক্রমাগত বাড়াইয়া এবং ইহারই জন্য অধিক খাদ্য ও উন্নততর খাদ্য দরকার কমখাদ্য ব্যবহারের দরুণ বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না, ভবিষ্যতের জনশক্তি তেমন কম দেহশক্তি ও বুদ্ধি-ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর কম খাদ্য গ্রহণ ও শরীরের অপরিপুষ্টি ভবিষ্যতের সুস্থ সবল তেজী শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার প্রধান অন্তরায়, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অধিক হওয়ার মূল প্রতিবন্ধক, এই কথাও মনে রাখা দরকার। সত্যকথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষ এইরূপ ক্রমক্ষীয়মাণ মানবিক মূলধনের উপরই ভবিষ্যতের শিল্প কাঠামো গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে।

ভারতের খাদ্যসমস্যা (Indian Food Problem)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের বাণিজ্যিক শস্যের রপ্তানি কমিয়া যাওয়ায় উহাদের দাম হঠাৎ হ্রাস পায়; এদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় চাউলের দাম খুব বাড়িতে থাকে। দেশের যুদ্ধকালীন নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেও খাদ্যের ঘাটতি দেখা যায়। স্বল্পকালীন সমস্যা মিটাইবার জন্য দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হইল, দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য অধিক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে সমস্যার বৃদ্ধি

খাদ্য ফলাও আন্দোলন সুরু হইল। যুদ্ধকালীন আভ্যন্তরীণ শিল্প বিস্তার হওয়ায় অন্যান্য কাঁচামালের দাম ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং ফলে কোন কোন কাঁচামালের দামের উর্ধ-সীমা নির্দিষ্ট করিতে হইয়াছিল। কিন্তু খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ বা কণ্ট্রোল পূর্ণ সফল হইল না।

প্রথম পরিকল্পনা সুরুর সময়ে খাদ্যের উৎপাদন দেশের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে প্রচুর ছিল না। জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ১৯৫৩ সালে খাদ্যের ঘাটতি ছিল ৩০ লক্ষ টন, তাই দেশে খাদ্যের ঘাটতি ছিল খুব বেশি এবং খাদ্যের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সরকারী মজুত হইতে বাজারে খাদ্য ছাড়িয়া দেওয়া, ভাল মরসুমের সম্ভাবনা এবং কঠিনতর(tight) আর্থিক নীতির ফলে উহার পরবর্তী দুইবৎসরে দামস্তর অনেকখানি হ্রাস পায়। অবশ্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে ২১৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিয়াছিল। এই সময়ে ভারত সরকার খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার একটি নূতন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, উহাতে বলা হয় যে, সঙ্কটকাল ব্যতীত ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চের পর হইতে আর খাদ্য আমদানি করা হইবে না। প্রথম পরিকল্পনায় ১৪% বা ৭৬ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য ধার্য করা হইল।১

এই পরিকল্পনার কার্যসূচীর সঙ্গে ১৯৫২ সালের অধিক-খাদ্য-ফলাও অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ যোগ করা হইল। স্থির করা হইল যে, (ক) ১৯৫১ সালের পর খাদ্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করার নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারসমূহ খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের (Grain procurement) নীতি গ্রহণ করিবে; (খ) সারাবৎসর জল পায় এইরূপ জমিতে প্রগাঢ়-চাষের সাহায্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। (গ) ট্রাক্টরের সাহায্য ৮ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করিতে হইবে; (ঘ) টিউবওয়েল বসাইতে হইবে; (ঙ) জলসিঞ্চিত ধান্যোৎপাদনের এলাকার জন্য বিশেষ ধরণের সার আমদানি করিতে হইবে, এবং (চ) উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্যের চাষ হইতে কিছু জমি খাদ্যশস্যোৎপাদনে অপসারণ করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় নির্দিষ্ট জলসিঞ্চিত ও ভাল মাটির এলাকায় প্রগাঢ়-চাষ নীতির ফলে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যোৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হইল। আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইল, ১৯৫৩ সালে মাত্র ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করিয়া ভারতবর্ষ ৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাইতে সক্ষম হইল।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য শস্যের দাম এত কমিয়া যায় যে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। ১৯৫৪ সালের সারা বৎসর ধরিয়া খাদ্যশস্যের দাম খুব কম চলিতে থাকে, পরবর্তী বৎসরে দামের এই হ্রাস আরও বিস্তৃত হইতে থাকে। ১৯৫৭ সালের খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে দাম-হ্রাসে এত বিস্তৃতির কারণ হইল উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণে বৃদ্ধি। দাম-হ্রাস রোধ করার জন্য ভারত সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন; উহার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হইল কিছু পরিমাণে রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া এবং সীমাবদ্ধ ভাবে দাম-ঠেকা দেওয়ার নীতি (Price support policies) গ্রহণ করা। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে যবের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় উহার দাম একটু বাড়িবার ঝোঁক সুরু হইলে সমগ্র ধারার পরিবর্তন দেখা যায়। সমগ্র ১৯৫৬ সাল ধরিয়া খাদ্যশস্যের দাম বাড়িতে থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও দাম-বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে, বিভিন্ন দ্রব্যের দামে বিভিন্ন অঞ্চলে ও সময়ে বিভিন্ন হারে এই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে (১৯৫৭) চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়াতেই বর্তমানের এইরূপ দাম-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারী ও বেসরকারী খাতে, ঘাটতি ব্যয় ও ঋণ প্রসারের সাহায্যে বিপুল বিনিয়োগ ব্যয় করা হইয়াছে; এই অর্থ জনসাধারণের হাতে আয় হিসাবে পৌঁছিয়াছে, অথচ খাদ্যোৎপাদন বাড়িতেছে না। খাদ্যের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, আয়বৃদ্ধির ফলে খাদ্যভোগের পরিমাণে ও ধরণে পরিবর্তন হইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে খাদ্যের দাম বাড়িবে এই আশায় বহু ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুত করিয়াছে, কেবল ব্যবসায়ীরা নয়, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরাও এই অবস্থায় খাদ্য গোলাজাত করিতে পারিয়াছে।

খাদ্যশস্যের যোগানের দিক হইতেও দামবৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে যবের উৎপাদন (৩০ লক্ষ টন) কম হওয়ায় দামবৃদ্ধি সুরু হইয়াছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেই দামবৃদ্ধি না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, চাল ও গমের উপর চাহিদার চাপ এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। উৎপাদনের সহিত দামের যোগ অপুর্ণোন্নত দেশে কম, দামের যোগ হইল সেই উৎপাদন হইতে বিক্রয়যোগ্য যোগানের সহিত। দাম বাড়িয়া যাওয়ায়

চাষীরা কম বিক্রয় সুরু করিয়াছিল ও উন্নত জীবনযাত্রার মানে পৌঁছান-র জন্য ভোগের পরিমাণ কিছুটা বাড়াইয়া দিয়াছিল, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরা মজুত ও ফাট্‌কাদারী সুরু করিয়াছিল।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ধারা ও কর্মপন্থা (Prospects for the Future : Direction & Programmes)

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে ভবিষ্যৎ চাহিদা, যোগান, দামে পরিবর্তনের পরিমাণ ও গতি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বলা খুবই অসুবিধাজনক, আরও বিশেষতঃ, যখন দেশে বিদেশে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ এত বেশি গতিশীল। খাদ্যদ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করিবে (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুণ আয়বৃদ্ধির পরিমাণ, (গ) জনসাধারণের ভোগ-প্রবণতায়, ও (ঘ) মজুত-প্রবণতায় পরিবর্তন প্রভৃতির উপর। কমিটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে খাদ্যশস্যের চাহিদা ১০% বাড়িবে। আয়বৃদ্ধির দরুণ অতিরিক্ত ৪% হইতে ৪.৫% চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। উভয় হিসাব মিলিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১৪.৫% হইতে ১৫% খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য দরকার হইবে।

যোগানের দিকে হিসাব করিয়া কমিটি দেখাইতেছেন যে, ১৯৬১ সালে মোট খাদ্যশস্যের যোগান ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টন হইবে অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় ১৫ লক্ষ টন কম হইবে। বিদেশ হইতে খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা আলোচনা করিয়া কমিটি বলিয়াছেন যে, বর্তমানের হিসাবে মোট ১০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা যাইতে পারিবে।

কি কি অবস্থা অবলম্বন করা দরকার

কমিটির মতে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাদ্যের দাম অস্থির থাকার সম্ভাবনাই বেশি, সুতরাং মোটামুটি যুক্তি সঙ্গত সীমার মধ্যে রাখিতে হইলে রাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় অবাধ ব্যবসার বহু ত্রুটি দেখা গিয়াছে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেরও বহু আর্থিক ও শাসননৈতিক (adminstrative) অসুবিধা আছে। তাই মধ্যপন্থার সুবর্ণরেখা অবলম্বন করা দরকার। বর্তমানে সরকারের উচিত, (ক) নিয়মিতভাবে খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের কেনাবেচা সুরু করা, (খ) পাইকারী ব্যবসার কিছুটা

অংশ রাষ্ট্রীয়ত্ত করা, (গ) অপর অংশে বেসরকারী ব্যবসাদারদের উপর লাইসেন্স প্রভৃতির মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা, (ঘ) গম ও চালের উপযুক্ত পরিমাণ মজুত হাতে রাখা, এবং (ঙ) নিয়মিত আমদানির ব্যবস্থা করা (চ) এই সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি উপযুক্ত ধরণের শুল্কসম্পর্কীয়, আর্থিক ও ঋণনীতি গড়িয়া তোলা দরকার। (ছ) প্রয়োজন হইলে কোন বিশেষ দ্রব্য বা শস্যের ক্ষেত্রে কিছুটা কন্ট্রোল ব্যবস্থা আরোপ করা দরকার।

কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, সকল নীতি তৈয়ারী করা ও কার্যকরী করার কাজ সুসংহত করার জন্য একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। দামসম্পর্কীয় নীতি ও উহার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি দাম-স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড (Price stabilisation Board) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত একটি খাদ্যশস্যের স্থিরতাসাধনকারী সংগঠন (Food grains stabilisation Organisation) থাকিবে যে, বেচাকেনার কাজ চালাইয়া যাইবে। দাম কমিবার ঝোঁক দেখা দিলে একসঙ্গে প্রচুর ক্রয়; দাম বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিলে একসঙ্গে প্রচুর বিক্রয়—এইভাবেই দামে উঠানামা বন্ধ রাখা সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যদপ্তর ও দাম স্থিরতা সাধনকারী বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য, (ক) বেসরকারী কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিল (Central food Advisory council) এবং, (খ) প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি দাম অনুসন্ধানী বোর্ড স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। দাম স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড (P. S. B.) এই দুইটির—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিল ও দামঅনুসন্ধানী বোর্ডের সহায়তায় শুধু খাদ্য নয় সকল দ্রব্যের দামের উপরই নজর রাখিবে এবং প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধতি সুপারিশ করিবে।

কি কি সংগঠন গড়িয়া তোলা দরকার

এই সকল ব্যবস্থা ছাড়াও খাদ্যশস্যের বণ্টন ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েকটি স্বল্পকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ কমিটি করিয়াছেন। ইহার মতে খাদ্য বণ্টন হওয়া উচিত প্রধানতঃ ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair Price Shop) সমবায় সমিতি বা মালিক সমিতির মাধ্যমে। বড় সহরের চাহিদা গ্রামাঞ্চলে অধিক চাপ সৃষ্টি করিতে থাকিলে সহরকে ঘেরাটোপে রাখার বা কর্ডন করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে "অঞ্চল' বা "এলাকা" (Zone) এমনভাবে ভাগ করিতে হইবে যে, ঘাটতি অঞ্চল ও বাড়তি অঞ্চলে সামঞ্জস্য থাকে, যাহাতে সরকারী মজুতের উপর বিশেষ চাপ

না পড়ে এবং একই অঞ্চলের মধ্য দিয়া একাধিক অঞ্চলের জন্য খাদ্যশস্যের চলাচল (cross movement of food grains) না ঘটে। ভূমি সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়া উহা প্রকৃতভাবে কার্যকরী করিয়া তোলাও প্রয়োজন। সর্বশেষে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও জনসংখ্যা হ্রাসের প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে চালাইয়া যাওয়ার কথা কমিটি বলিয়াছেন।

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading in Food Grains):

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হইলে কৃষি-উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষককে ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হয়। বর্ধিত দাম পাইয়া চাষী যে উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহার সবটা বা বেশীর ভাগ চাষীর হাত হইতে লইয়া আসিয়া ক্রমবর্ধমান শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট সস্তা দামে পৌঁছাইতে হয়। খাদ্যের উপযুক্ত দামের উপর তাই শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার এবং শিল্পক্ষেত্রে মজুরি ও কাঁচামালের খাতে উৎপাদন-ব্যয় নির্ভর করে। চাষীর নিকট হইতে ফসল কিনিয়া ক্রেতাদের নিকটে বিক্রয়ের এই কাজ এতদিন বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে চাষী উপযুক্ত দাম পায় নাই, এই বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীরা অনেক সময় মজুত করিয়া কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করিয়াছে, ফলে সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশী দাম দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে। ফসলের দামে তীব্র উঠানামা এবং আঞ্চলিক ও মরসুমী দামের পার্থক্য রোধ করার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যের বাণিজ্য ক্ষেত্রকে মুনাফামুখী বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অবাধ বাজারের ঘাত প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তাই সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের বাজারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের (State Trading corporation) মাধ্যমে তাহারা খাদ্যশস্য ক্রয় ও বিক্রয় কার্য সুরু করিবেন।

কেন ইহার প্রয়োজনীয় দেখা দিয়াছে

ভারত সরকার বলিতেছেন যে, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল ভোগকারী ও উৎপাদক উভয়ের পক্ষে ন্যায্য দামস্তর রক্ষা করা এবং উৎপাদক যে দাম পায় ও ক্রেতা যে দাম দেয় এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য যথাসম্ভব হ্রাস করা।

প্রাথমিক লক্ষ্য

প্রথম হইতেই পূর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সুরু করার বহু অসুবিধা সম্পর্কে ভারত সরকার সচেতন আছেন। যেমন, উপযুক্ত শাসন-নৈতিক সংগঠনের অভাব, মজুত করিয়া রাখার মত গুদামের অভাব এবং পরিমাণমত প্রাথমিক মজুতের অভাব। তাই এই পরিকল্পনাটিকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (১) চূড়ান্ত ধরণ (ultimate pattern) এবং (২) মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (interim scheme) যাহা পূর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সুরু করা পর্যন্ত গড়িয়া উঠিবে।

চূড়ান্ত ধরণ ও মধ্যবর্তী-কালীন পরিকল্পনা

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের চূড়ান্ত ধরণে এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে রাষ্ট্র সেবাসমবায়ের (Service Co-operatives) মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত তুলিয়া আনিয়া উহাকে বিক্রয় সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া খুচরা বিক্রেতা বা ভোগকারীর সমবায় সমিতির সাহায্যে ক্রেতাদের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে। ভোগকারীর সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চূড়ান্ত ধরণে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা যত দ্রুত সফল হয় ততই ভাল এবং মধ্যবর্তীকালীন কার্যসূচীর মধ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসাকে সমবায় সমিতিরা নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতে থাকিবে।

চূড়ান্ত ধরণ ও উহাতে পৌঁছিবার পথ

মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনাতে রাষ্ট্র প্রথম হইতেই চাষীর বিক্রয় যোগ্য উদ্বৃত্তের সমস্তটা লইয়া ব্যবসা সুরু করিবে না, কারণ তাহা হইলে এখনই রাষ্ট্রের উপর শিল্পাঞ্চলের ও আধা-শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যসংস্থানের পূর্ণ দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। তাই বর্তমানের পাইকারী ব্যবসাদারদের সম্পূর্ণ সরাইয়া দেওয়া হইবে না। তাহাদের সরকার লাইসেন্স দিবে এবং সরকার-নির্দিষ্ট দামে চাষীদের নিকট হইতে তাহারা খাদ্যশস্য ক্রয় করিবে। খুচরা বিক্রেতাদের নিকট অল্প কিছু বেশি দামে তাহারা বিক্রয় করিবে। এই দুই দামের পার্থক্য সরকার স্থির করিয়া দিবে এমনভাবে, যাহাতে লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীর নিযুক্ত মূলধন হইতে ন্যায্য লাভ, মালচলাচলের দরুণ তাহার বিভিন্ন প্রকার ব্যয় সবটা পোষাইয়া যায়। নিয়মিত দামে কোন লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীর সকল মজুত দরকার মনে করিলে রাষ্ট্র কিনিয়া লইতে পারে। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ও মজুতের সকল হিসাব রাখিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উহা দাখিল করিতে হইবে।

মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনার রূপ

সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (ক) প্রাথমিক স্তরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কেবল মাত্র দুইটি শস্যে, ধান ও গমের ক্ষেত্রেই সুরু হইবে। উৎপাদকেরা যাহাতে ন্যায্য দাম পায় এই উদ্দেশ্যে সরকার নিজে একটি ক্রয় করার এজেন্সী স্থাপন করিবেন এবং যাহারা সরাসরি সরকারের নিকট তাহাদের উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিতে চায় তাহারা সেই সরকারী ক্রয় এজেন্সীর কাছে ফসল বিক্রয় করিবে। (খ) সামগ্রিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় কার্য চলিবে এমনভাবে যাহাতে কোন ক্ষতি বা লাভ কিছুই না হইতে পারে। (গ) একটি রাজ্যের জন্য বা একটি অঞ্চলের জন্য সমান ক্রয়-দাম স্থির করা হইবে। কোন কোন রাজ্যে এমন অনেক অনুন্নত অঞ্চল আছে, যেখানে রেলের দ্বারা পৌঁছান যায় না। পাইকারী বাজার এবং ধানকল গুলি প্রায়ই রেলষ্টেশনের কাছাকাছি থাকে বলিয়া অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ দাম এই রেলষ্টেশনের দামের দ্বারাই মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন দাম নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাহা ছাড়া, দেশে এমনিতেই কতকগুলি এমন ঘাটতি অঞ্চল আছে যেখানে দাম বাড়তি অঞ্চলের তুলনায় সর্বদাই বেশি থাকে। এই সকল অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ক্রয়মূল্য স্থির করা যাইতে পারে। ঠিক সেইরূপ একটি রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লাইসেন্সধারী পাইকারী ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রিত দামেও পার্থক্য থাকিতে পারিবে। (ঘ) খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণ করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া ও ক্রেতা ভোগকারীর সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া খুচরা দামের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হইবে। কোন রাজ্য সরকার রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলের জন্য খুচরা দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে, তবে সেইরূপ অবস্থায় তাহাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, যোগান-ধারায় হঠাৎ কোন বিপর্যয় না আসিয়া এইরূপ নিয়ন্ত্রিত দাম কার্যকরী রাখা ইহার পক্ষে সম্ভবপর।

পরীক্ষামূলক ভাবে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের খাদ্যশস্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণই রাষ্ট্র কিনিয়া লইবে কি না তাহা রাজ্য সরকারের সহিত আলোচনার দ্বারা স্থির হইবে। এইরূপ কোন অঞ্চলের সকল উদ্বৃত্ত ক্রয় করিয়া লইলে সেই অঞ্চলের বা অন্য যে অঞ্চলের ক্রেতারা এই খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করিত—সকলকে খাদ্য যোগান দিবার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়ে। এইরূপ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয়

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাহা বোঝা যাইবে এবং এই সকল অসুবিধা দূর করিতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহাও জানা যাইবে।

নীতিগত দিক হইতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতি বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য, কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে খাদ্যের যোগান ব্যক্তিক্ষেত্রের হাতে কিছুতেই রাখা চলে না।[১] তাহা ছাড়া, চাষী উপযুক্ত দাম পাইবে, শিল্পাঞ্চলের ক্রেতা উপযুক্ত দামে খাদ্য পাইবে, মধ্যস্তরের অনুৎপাদক শ্রেণীর ব্যক্তিদের লাভ অবলুপ্ত হইবে। দামে উঠানামার ব্যপ্তি ও তীব্রতা কমিয়া আসিবে, কৃষক তাহার নিজস্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা ও রাষ্ট্র বা ব্যবসায়ীরা তাহাদের নিজস্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা—সবই সঠিক ভাবে করিতে পারিবে, মধ্যপথে উহারা বানচাল হইয়া যাইবে না। দালাল, ফড়িয়া পাইকার অধ্যুষিত অসংগঠিত কৃষি-বাজার সুসংগঠিত হইয়া উঠিবে, এবং কৃষিবিক্রয় সংগঠনের অন্যতম শূন্যস্থান (lacunnae) পূরণ হইবে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি বেশি দূর কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের ন্যায় দেশে সম্পূর্ণ নিখুঁত কোন ভাল পরিকল্পনাও কার্যকরী হওয়ার সময়ে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিভংগীর অভাবে এবং গ্রামাঞ্চলের ধনীচাষীদের বিরোধিতায় বা অত্যন্ত অধিক "সহযোগিতায়" সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যায় —এইরূপ আমরা বহু দেখিয়াছি। সব পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনার মধ্যেও এমন ফাঁক, রাখা হইয়াছে, যাহাতে অবস্থা কিছুমাত্র উন্নত না হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। পাইকার শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াই রাষ্ট্রের নিজস্ব বাণিজ্য সংগঠন গড়িয়া তোলা দরকার ছিল। পুরাণো পাইকার শ্রেণীকেই লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, এবং সরকার উহাদের উপরেই খাদ্যশস্য সংগ্রহের ভার দিয়াছেন। ইহাতে চাষীদের ক্রোধের হাত হইতে ইহাদের রক্ষা করা হইতেছে এবং ইহাদের নিকট শস্য বেচিতে চাষীদের আইনতঃ বাধ্য করা হইতেছে। মনে রাখা দরকার গ্রামাঞ্চলে জমিদার, জোতদার ও ধনী চাষীরাই খাদ্যশস্যের পাইকার। উহারা চাষীকে পূর্বে দাদন দিয়া সরকার-নির্দিষ্ট দাম অপেক্ষা কম দামই দিবে। ইহাদের নিযুক্ত দালাল ও

---

১ কথা হইল যে খাদ্যের উৎপাদনও ব্যক্তিগত চাষীর হাতে রাখা চলে না, কিন্তু এখানে সেই প্রশ্ন অবান্তর। নীতি হিসাবে ইহা যে অভিনন্দনযোগ্য তাহা আরও বোঝা যায়, যখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলন ইহাকে unreal ও hasty বলেন।

ফড়িয়ারা চাষীর নিকট হইতে কম দামেই ক্রয় করিবে—তাহা রোধ করার কোন ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, খুচরা বিক্রেতারা কি দামে ক্রেতাদের নিকটে বিক্রয় করিবে তাহা কোনরূপ বাঁধা হইবে না, পরিকল্পনায় ইহা বলা হইয়াছে। এই পাইকাররাই স্বনামে বা বেনামে খুচরা বিক্রেতা সাজিয়া বসিবে, বর্তমানের খুচরা বিক্রেতাদের মাল না দিয়া নিজেদের খুচরা বিক্রয় সংগঠনকেই মাল যোগান দিবে এবং বেশি দাম না পাইলে খাদ্যশস্যের বিক্রয় করিবে না, অর্থাৎ খাদ্যশস্যের কালোবাজার সৃষ্টি হইবে। চাষীর নিকট হইতে কম দামে চাল কিনিয়া উহার খুব অল্পাংশ রাষ্ট্রের হাতে বিক্রয় করিবে এবং অধিকাংশই নিজেদের নূতন "খুচরা" বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠাইবে। বর্তমানের বা পুরাতন খুচরা বিক্রেতারা মারা পড়িবে, ক্রেতাদের বেশি দামই দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, এখন গ্রামাঞ্চলে বহু ছোটখাট পাইকার কাজ করিতেছে, অনেক গরীব চাষী বা কৃষিমজুরও খুব অল্পমূলধনে চাষীদের নিকট হইতে ধান কিনিয়া সহরে আসিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহারা লাইসেন্স পাইবে বলিয়া মনে হয় না, ফলে ইহাদের আয়ের পথ লুপ্ত হইবে, অথবা ইহারা পাইকারের দালালে পরিণত হওয়ায় আয় সংকুচিত হইবে। বাজারে অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী থাকিবে না, কিছুটা রাষ্ট্র-স্বীকৃত ও আধা-নিয়ন্ত্রিত অলিগোপলীয় বাজার গড়িয়া উঠিবে। সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, কেবল খাদ্যশস্যের উপর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়াতে সমস্যার অর্ধেকের দিকে নজর-পাত হইয়াছে, বাকী অর্ধেক বাকি থাকিয়াই গিয়াছে। খাদ্যশস্য ও শিল্পদ্রব্য উভয়ের দামের অনুপাত সমান বা নির্দিষ্ট না রাখিয়া সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সফল হয় না—কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। শিল্পাঞ্চলে উচিত মূল্যে খাদ্য দেওয়ার নীতি নিশ্চয় ঠিক, কিন্তু উহার সঙ্গে একই বাণিজ্যনীতি ও কাঠামোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে উচিত মূল্যে শিল্পদ্রব্য যোগানের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনী

1. Discuss the importance of agriculture in a developing economy like India.

2. "The central problem in planning and development of India's economy is the reconstitution of agriculture." Discuss.

3. Give an idea of the rural economic structure of India.

4. Give an account of the various types of irrigation works in India and indicate their economic importance.

5. What principles should guide the levy of irrigation taxes in India?

6. Discuss the different proposals which have been made to solve the problems of the sub-division and fragmentation of holdings in India.

7. Discuss the concept of economic holding with reference to India.

8. What is co-operative farming? Are they suitable in Indian conditions?

9. Discuss the need, possibilities and obstacles to the adoption of co-operative farming in India.

10. Under the present circumstances of India do you think co-operative farming will succeed?

11. How far, in the present context of India the mechanisation of agriculture is possible or desirable?

12. Describe the different systems of land tenure still prevalent in India and examine their merits and demerits.

13. Why reform of existing Indian land tenure systems is a precondition to developmental planning?

14. Discuss the trend of recent tenancy legislation passed in the States of India with the possible consequences on the agricultural economy.

15. Critically examine the progress of land reforms in India.

16. Describe the causes of rural indebtedness in India. What steps have been taken up by the government to solve the problem of agricultural debt?

17. What are the different sources from which the cultivators receive finance? How far those agencies are adequate?

18. Give a brief summary of the recommendations of All India Rural Credit Survey Report. How far those recommendations have been accepted?

19. Critically examine the recommendations of the All India Rural Credit Survey Report. How far those proposals can solve the problem of rural finance?

20. Trace the growth of the Co-operative movement in India.

21. Describe the major features and the different forms of Co-Operative societies in India.

22. Discuss the need and functions of Land Mortgage Banks in India.

23. "Co-operation is dead, long live Co-operation." Discuss with reference to present Indian situation.

24. Account for the present unsatisfactory state of the Co-Operative movement. What is its future?

25. Describe the present system of marketing of agricultural produce. Point out the defects of this system and show how they can be overcome or mitigated.

26. What measures are being taken by the Government to improve agricultural marketing in India?

27. Discuss the present position of Agricultural labourers in India on the basis of the Report of the Agricultural labour Enquiry.

28. How do you propose to improve the conditions of Agricultural labourers in India and what measures are being taken by the Government in this respect?

29. Discuss the main features of the Community Development projects.

30. What are the main features of the Community Development projects launched in the country? Examine their usefulness as an instrument of rural reconstruction.

31. Discuss the Importance of increasing Food production in India.

32. Discuss the nature of Food problem in India at present. What improvements can be made in the food front, and what is being done by our Government in this respect?

33. "Dynamics of the level of Food consumption and its composition forms a part of the overall dynamics of ecnomic growth and development." —Elucidate.

34. Critically examine the need, possibility and the proposal of State-trading in Food grains in India.